লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা :
ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত

পুস্তক বিপণি
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্র : অন্নদা মুন্সী
প্রচ্ছদলিপি : অমিয় ভট্টাচার্য রেখাচিত্রণ : প্রণব শিকদার

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক :
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
'রেণুকা বিলাস'
১১ বি. টি. রোড
কলকাতা-৭০০০৫৬

মুদ্রক :
শ্রীশক্তিপদ আড়ু
নিউ মা-কালী প্রিণ্টার্স
১২/১, রামচাঁদ ঘোষ লেন,
কলকাতা ৭০০০০৬

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

বিষয়সূচী ঃ

॥ পূর্বকথা ॥

সমাজ-ইতিহাসের "প্রথম যুগের উদয়-দিগঙ্গনে" মানুষ ধীরে-ধীরে বিবর্তিত হয়েছিল পশু থেকে, ক্রমপদ্ধতির ধীর অথচ সুনিশ্চিত পরিবর্তনের পথ বেয়ে। তার সেই আদিমতম স্তর থেকে বহু সহস্র বছরের পথ হেঁটে সে আজকের সুসভ্য আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে। সেই দীর্ঘ চলার পথের বিভিন্ন সব পর্যায়ে, সে কি করত, কি ভাবত তা জানার কৌতূহল নিরন্তরভাবেই এ-কালে বেড়ে চলেছে। সেই-কৌতূহল গবেষকদের চালিত করেছে অতীতের মানুষকে তার পূর্ণায়ত পরিচয়ে খুঁজে বার করতে। এই খুঁজে বার করার পদ্ধতিতে গবেষক ও তাঁর গবেষণার অম্বিষ্ট আদিম পিতৃপুরুষের মধ্যে বহুকাল ধরে ছিল অপরিচয়ের এক বিরাট ফাঁক। ফ্রেমে-বাঁধানো নিষ্প্রাণ ছবির মতোই এতদিন যেন অতীতের মানুষ-সম্পর্কে ধারণাগুলি জ্ঞানকুঠুরী দেওয়ালে ঝুলছিল।

কিন্তু আজকের গবেষণায় নতুন-নতুন পথের হদিশ মিলছে প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহেরা কেমনভাবে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সজীব হয়ে কতখানি মিশে আছে, সেই যোগসূত্র রচনার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা—এই সমস্ত জ্ঞানবৃত্তের পাশাপাশি পুরাণবৃত্ত-চর্যাও সেই সন্ধানের এক অনিবার্য উপকরণ হয়ে উঠেছে এখন। লোকপুরাণ বা মিথোলজির ঐ-চর্চা আজকের মানুষকে তার পূর্ণায়ত ঐতিহ্যে চিহ্নিত করছে। সেই অতীতের কথা না-বুঝলে, মানুষের সংস্কৃতি হয়ে পড়বে ছিন্নমূল।

... ...

হয়ত সেই ভাবনারই তাগিদে এই বইয়ের উপস্থিতি, বাংলাভাষায় মিথের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিশেবে সর্বপ্রথম। এর নিবন্ধ ও কাহিনীগুলি 'অরিত্র' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৮৮ থেকে বৈশাখ, ১৩৮৯-এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল : এখন একত্রে গ্রন্থিত হল।

কিছু মুদ্রণ ও সম্পাদন-প্রমাদ থেকে গেল, যাদের মধ্যে প্রধানগুলি 'সম্পাদকীয়'তে শুধরে দেওয়া হয়েছে। এই ত্রুটির দায়িত্ব অবশ্যই সম্পাদকের। এই সঙ্কলনের সমস্ত লেখক, অনুবাদক ও শিল্পীরা যে ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাতে তাঁদেরকে নিছক ধন্যবাদ দিয়ে শুধু প্রথারক্ষা করতে চাইনে! রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও আকাদেমী ফোকলোরের সহকর্মীদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ড. রবীন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ আর শ্রী অনুপকুমার মাহিন্দার সম্বন্ধেও অন্য কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা আপাতত!—জুন পনের, উনিশ শো বিরাশি॥

লোকপুরাণ ঃ মুখবন্ধ

—পল্লব সেনগুপ্ত

স্বয়ং স্যার আইজ্যাক নিউটন একবার মাধ্যাকর্ষণের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে একটি উপমা ব্যবহার করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আকাশের চাঁদও যেন একটি শূন্যে ছুঁড়ে-দেওয়া আপেল ছাড়া আর কিছুই নয়! পরবর্তী সময়ে এই মন্তব্য একটি স্নিগ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিহাস বলে গণ্য হলেও, সমাজবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কাছে এই কথার একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। নিউটনের মতো মহামনস্বী বৈজ্ঞানিকই যদি চাঁদ এবং আপেলের অভিন্নতার কথা পরিহাসের ছলেও ভাবতে পারেন, তাহলে বহু শতাব্দী আগের সেইসব আদিম পিতামহদের সংস্কারে এবং বিশ্বাসে অজস্র প্রাকৃতিক সংঘটনের এবং অসংখ্য পার্থিব বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসেবে যা প্রতীত হত, তাকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিই কেমন করে?

এই ব্যাখ্যানগুলিই হল আদি-লোকপুরাণ বা মিথ। নিজেদের প্রাত্যহিক পরিবেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বুদ্ধির আয়ত্তাতীত ঘটনা, বস্তু এবং বিষয়গুলির কারণ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন আদি কালের পূর্ব-পুরুষেরা এবং স্বভাবতই সহজাত সংস্কারে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, দৈব-নির্ভরতা ইত্যাদির সঙ্গে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এগুলিকে তাই বলা হয়েছে 'প্রকৃত বিজ্ঞানবোধ সৃষ্টি হবার আগে উৎসারিত হওয়া বিজ্ঞান-মুখিনতা'। প্রতি সকালে সূর্য ওঠে কেমন করে? না, বিশাল এবং অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন হাঁস রোজ সকালে একটি করে ডিম পাড়ে—সেই হল সূর্য। সারাদিন ধরে আকাশের 'মাঠে' সে গড়াতে থাকে, তারপর রাত্রির দেবতা সেটিকে ফাটিয়ে দেন, আকাশময় তার কুচি-কুচি খোলা ছড়িয়ে থাকে—তাই হল নক্ষত্রের দল, আর ডিমের হলুদ অংশটিই হল চাঁদ! এই ব্যাখ্যা যে গল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল—সেই গল্পই হচ্ছে মিথ।

পৃথিবীর কেমন করে সৃষ্টি হল? মানুষের জন্ম হল কেমন করে? বৃষ্টি হয় কেন? গ্রহণ হয় কেন? শিশু জন্মায় কেমন করে? মরে গেলে মানুষ কোথায় যায়? সাপের জিভ চেরা কেন? বাঘের গায়ে ডোরা কেন? আগুন এল কোথা থেকে?

বাজ পড়ে কেন? স্বপ্ন দেখি কেন?......এই রকম লক্ষ-লক্ষ অনিরসিত সব প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে লক্ষ লক্ষ লোকপুরাণ-বৃত্তের, সারা পৃথিবী জুড়ে। সভ্যতার বিবর্তন একটি সুনির্দিষ্ট স্তর-পরম্পরায় সর্বত্রই ঘটেছে বলে প্রথমে লুই হেনরী মর্গ্যান, তারপরে ফ্রীডরিশ্ এঙ্গেল্স এবং অবশেষে ভি. গর্ডন-চাইল্ড প্রমাণ করেছেন যেভাবে, তাতে মানুষের চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্তনও অনুরূপ একটি পরম্পরাকেই অবলম্বন করে ঘটে চলেছে, এমনটিই মেনে নিতে হয়। সভ্যতার বিবর্তন সর্বত্রই সমানভাবে হয় নি কিন্তু বিবর্তনের ছকটি সর্বত্রই এক : ক. নিম্নস্তরের বন্য পর্যায় (ভাষার উদ্ভব, ফলমূল-সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা); খ. মধ্য-স্তরের বন্য পর্যায় (আগুনের ব্যবহার আয়ত্তে আনা এবং মাছ ধরা); গ. উচ্চ-স্তরের বন্য পর্যায় (তীর-ধনুকের ব্যবহার); ঘ. নিম্ন-স্তরের বর্বর পর্যায় (মাটির বাসন-কোসন তৈরী); ঙ. মধ্য-স্তরের বর্বর পর্যায় (পশুপালন ও কৃষির পত্তন); চ. উচ্চ-স্তরের বর্বর পর্যায় (ধাতুর ব্যবহার শুরু) এবং ছ. সভ্য পর্যায় (ধ্বনিনির্ভর হরফ এবং লেখার সূত্রপাত)।

মানুষের সভ্যতা ও তার ব্যবহারিক সংস্কৃতির ক্রম-পরম্পরার এই যে ছক মর্গ্যান তাঁর 'এনসেন্ট সোসাইটি' গ্রন্থে বিন্যাস করেছেন, তারই উৎপাদন এবং জীবিকা-নির্বাহ-কেন্দ্রিক ভিত্তির উপরে এঙ্গেলসের পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উদ্ভবের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ভিত্তি এবং তত্ত্বকে গর্ডন চাইল্ড অবলম্বন করেছেন তাঁর সামাজিক বিবর্তনের মতবাদে। তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের সংস্কৃতির ব্যবহারিক বিবর্তনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফিরেছে আগুনের অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে; দ্বিতীয় মোড় হল কৃষির আবিষ্কার এবং তৃতীয় মোড় নগর-সভ্যতার পত্তন। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির এই সুনির্দিষ্ট গতিপথের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই মিথ বা লোকপুরাণ এবং তার থেকে লিজেণ্ড তথা কিংবদন্তী এবং ধ্রুপদী পুরাণ গড়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥

একই রকমের সামাজিক বিবর্তন সব সমাজেই কোনো-না-কোনো সময়ে অনিবার্য হয়েছে যেহেতু, তাই পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজেই মিথের অন্তর্লীন চরিত্র এবং বাহিরঙ্গিক প্রকাশও বহু সময়েই এক। তাছাড়া সভ্যতা যত অগ্রসর হয়েছে, ততই এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও ঘটেছে বাণিজ্য, যুদ্ধ-মৈত্রী এবং বিবাহের সূত্রে। এর ফলে অন্যান্য অনেক

কিছুর মতো একের মিথও অন্যের ঐতিহ্যে মিশেছে। মানসিক স্তরেও অবচেতন ভাবে অনুরূপ কাহিনীকে গ্রহণ করার সুপ্ত প্রবণতা সেই মিশ্রণকে আরো সহজসাধ্য করেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই এখানে কোন্ মানসিকতা থেকে লোকপুরাণ গড়ে ওঠে সেটি একটু বিচার করে নেওয়া দরকার। একালের আমেরিকান পণ্ডিতদের অনেকেই অবশ্য মার্ক্সবাদী বীক্ষণের পরিপন্থী হওয়ায় মর্গ্যানের তত্ত্বকে অস্বীকার করতে চান, যেহেতু মূলত মর্গ্যানের গবেষণাকে অবলম্বন করেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে! পক্ষান্তরে কোনো সমাজে সাংস্কৃতিক একটি মানস সুসংহতভাবে গড়ে-ওঠার পথে তাঁরা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো পথের হদিশও দিতে পারেন না; অন্তত এখনো অবধি পারেন নি। এর পরিণতিতে ফ্রান্ৎস বোয়াস, রুথ বেনেডিক্ট এবং তাঁদের পূর্ববর্তী ব্রনিস্লউ ম্যালিনোভস্কি প্রমুখ বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে গবেষণা ক'রে যে সব তথ্য পেয়েছেন, সেগুলির মাধ্যমে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক (কাজে-কাজেই সাংস্কৃতিকও) বিবর্তনের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের অসুবিধা হলেও, মর্গ্যান-এঙ্গেল্স-গর্ডন চাইল্ড-নির্দেশিত পদ্ধতি অসার বলে প্রতিপন্ন হয় না। এঁরা যে-সব তথ্যের সংকলন করেছেন, সেগুলি যদি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ কোনো গবেষক বিশ্লেষণ করেন, তাহলেই কট্টর মার্কিন পণ্ডিতদের বক্তব্যের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ হতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে মিথের অন্তর্লীন দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি যদি এঁরা ধরতে পারতেন, তাহলে তার বিকাশের স্বরূপটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত এঁদের কাছে। প্রতিটি মিথের মধ্যেই উপাদান কিংবা ঘটনা কিংবা চরিত্রের দিক থেকে কোনো-না-কোনো ভাবে দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেক্টিক্যাল পরিবেশ রয়েছে। কখনো সেটা প্রত্যক্ষ, কখনো কিছুটা পরোক্ষ বা রূপকাশ্রয়ী, কখনো আবার পুরোপুরিই পরোক্ষ অর্থাৎ প্রতীকাশ্রয়ী। যে-সামাজিক মানসিকতা বাস্তব পরিবেশকে যতখানি মানিয়ে নিতে পেরেছে, তার মিথ ততটাই পরোক্ষ, যতটা কম পেরেছে, প্রত্যক্ষ ততখানি। ধর্মীয় এবং অন্যান্য অনুশাসন যত বেড়েছে, মিথের চরিত্রও ততই বদলে গেছে।

কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলাই সঙ্গত: আগুনকে মানুষ আয়ত্তে আনতে পারল যখন থেকে, তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কেরও চরিত্র বদল হল, সুতরাং আগুন আয়ত্তে আনার আগের পর্যায়ের মানসিকতার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসিকতারও পার্থক্য ঘটল। বলতে পারি প্রকৃতির ওপর মানুষের জয়যাত্রার সেই

হল শুরু। আগের পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির কাছে নিজেকে যতখানি অসহায় মনে করে তার ওপরে দৈবীসত্তা আরোপ করে সমস্ত ব্যাপারটা মানিয়ে নিত, এখন থেকে ততটা অসহায় যে সে নয়—সেটুকু বুঝতে শিখল। শিকারের অস্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ এবং প্রয়োগের স্তরে পৌঁছনোর পর থেকে তার অসহায়ত্ব আরো কমল। পশুপালন এবং কৃষির পর্যায়ে আসার পর থেকে তার ভরসা, আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তা আরো বেড়েছে।

লোকাচার এবং লোকবিশ্বাসকে অবলম্বন করে মিথের যে ক্রমরূপান্তরণ ঘটে এসেছে বহু হাজার বছর ধরে, তারও চেহারার হেরফের ঘটেছে ইতিহাসের ঐ বিশিষ্ট কটি মোড় থেকেই। প্রাথমিক পর্যায়ের মিথে তাই অপরিসীম দৈবনির্ভরতা; আগুন এবং অস্ত্র নির্মাণ স্তরের মিথে প্রকৃতি এবং দৈবী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা, কৃষি পশু পালন স্তরে তার আত্মবিশ্বাস গভীরতর। নাগরিক সভ্যতা থেকেই প্রাগৈতিহাসের পালা শেষ, প্রকৃত অর্থে লোকপুরাণ তখন আর নতুন করে গড়ে উঠতে পারে না; অন্তত পেরেছে, প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য তার অর্থ এমন নয় যে, ইতিহাসের পর্বে এসে দৈবশক্তিতে আস্থা, যাদুশক্তিকে বিশ্বাস এবং বস্তু বা প্রাণীর অন্তর্লীন ক্ষমতায় প্রত্যয় (আদিম ধর্মচেতনার যে তিনটি ছিল প্রধান সূত্র)-ইত্যাদি প্রবণতা মানুষের মন থেকে নির্মূলিত হয়ে গেল। একমাত্র দৈবী শক্তির উপকরণটিই কাহিনী গড়ার ক্ষেত্রে যে-সব জায়গায় ব্যাপকতর হল—সেখানে তৈরী হল লিজেণ্ড। যাদুশক্তি এবং বস্তুর অন্তর্গত সত্তা পশু ও মানুষের মধ্যে সমধর্মিতার কল্পনা-প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তৈরী হতে শুরু করল রূপকথা, উপকথা, নীতিকথা, ফেয়ারী টেল প্রভৃতি কাহিনী-প্রকরণ।

মিথ আসলে মূলত প্রাগৈতিহাসিক দেবকল্পনা-কেন্দ্রিক, লিজেণ্ড সচরাচর ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত বা বিবেচিত চরিত্রের অন্তর্লীন অলৌকিক কিংবা অতি-মানবীয় ক্ষমতার প্রত্যয়-ভিত্তিক। ও দুয়ের মধ্যেই ধর্মীয় অনুষঙ্গ বজায় থাকায়, সাধারণভাবে সহসা পার্থক্য নির্ণয় করা বেশ দুরূহই হয়ে পড়ে অনেক সময়ে। অবশ্য রবিন হুড-ধরণের এক রকমের লিজেণ্ডও আছে, তাতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

মিথ গড়ে ওঠে কেমন করে? ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুগামীরা বলেন যে মানুষের ব্যক্তিগত চৈতন্যের অন্তর্গত নির্জ্ঞান-স্তর থেকে বিভিন্ন বাসনা স্বপ্নের মধ্যে যে-ভাবে

প্রতীকান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, ঠিক সেই একইভাবে বহিরাঙ্গিক পরিবেশের অনুশাসনে বদ্ধ নির্জ্ঞান মনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে লোক-পুরাণগুলির কাহিনীবিন্যাসে। গোষ্ঠীগতভাবে এই প্রকাশই একটা ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। ঐ সামগ্রিক গোষ্ঠী-চৈতন্য যে নির্জ্ঞান-স্তর থেকে সঞ্জাত, ফ্রয়েড-শিষ্য য়ুং তার নাম দিয়েছেন 'কলেকটিভ আনকনসাস' (সামূহিক নির্জ্ঞান, যৌথ অবচেতনাও বলা চলে)। পরম্পরা-ক্রমে যে ঐতিহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠে, গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনে তার প্রতিভাস কোনো না-কোনো ভাবে প্রতীকায়িত হয়। কলেকটিভ আনকনসাস হল সেগুলিরই সমন্বিত ভাবনা। ফ্রয়েড যেখানে প্রতীক মাত্রকেই যৌনতা-সম্পৃক্ত বলে মনে করেছেন, কলেক্‌টিভ অ্যানকনসাসের ক্ষেত্রে সেখানে সামগ্রিক গোষ্ঠীমনের মুক্তির নিশ্চিন্তিই বড় বলে প্রতীত। ফ্রয়েডের শিষ্য হলেও য়ুং সেখানে অনেকটাই ভিন্নপথের পথিক।

গোষ্ঠীগতভাবে ঐ নির্জ্ঞান-সঞ্জাত অনুভাবনা ঐতিহ্য সৃষ্টি করে বলেই, লোকপুরাণ থেকে ধ্রুপদী পুরাণ গড়ে ওঠে। এই কারণে কোনো একটি বিশেষ সংস্কৃতির উত্তর-সূরীদের মধ্যে সামাজিক ও আর্থনীতিকভাবে শ্রেণীবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পৌরাণিক চিন্তায় একটা অনিবার্য ঐক্য থাকে। বস্তুতপক্ষে লোকায়ত মনের সাহিত্য এবং পরিশীলিত স্বচ্ছলতর শ্রেণীমানসের সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মিথই। অর্থাৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে ভাবরূপগত ঐক্য যেমন মিথের (এবং অন্যান্য লোকায়ত কাহিনীর) মাধ্যমে পরিস্ফুট-হয়ে ওঠে, তেমনি একটি বিশেষ সংস্কৃতির মূল মেলবন্ধনও মিথই ঘটায়। সমাজতত্ত্বই বলুন, আর সংস্কৃতিতত্ত্বই বলুন—উভয় ক্ষেত্রেই তাই মিথ চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

যদি প্রশ্ন করেন কেউ যে, মিথ যদি এমন সাযুজ্য-সমন্বয়েরই দ্যোতক হয় তাহলে তার দ্বান্দ্বিকভাবে বিকাশের যে কথা ওপরে বলা হয়েছে, সেটির তাৎপর্য র'ল কই? প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই সঙ্গত। তবে, এর উত্তরও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই দিতে হবে।⋯ মনে রাখতে হবে, মানুষের মানবিক আত্মবিকাশের প্রাথমিক স্তর থেকে আজ এই সমুন্নত পর্যায় অবধি একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাকেই অবলম্বন করে যে ব্যক্তিমন (সজ্ঞান, অজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান) এবং যে গোষ্ঠীভাবনা (এবং সামূহিক নির্জ্ঞান) বিবর্তিত হয়ে আসছে, তার প্রতি স্তরেই কোনো-না-কোনো ভাবে এক বা একাধিক শক্তির দ্বন্দ্বের লব্ধফলরূপে সংস্কৃতির গড়নটা একটা-কিছু চেহারা ধারণ করেছে। দ্বন্দ্বের পাত্র বা বিষয়ভেদ হতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বটা নিজে তো চিরন্তন, ফলে ঐ

দ্বন্দ্বজাত সব কাহিনীর মধ্যেই ভাবগত অন্তর্কাঠামোতে (ইনফ্রা-স্ট্রাক্‌চার) এক ধরণের সমমিতা থাকেই, থাকতে বাধ্য ; বলতে পারা যায় সেটাই হল সমস্ত দ্বন্দ্বের সমন্বিত-গতি বা সিনথিসিস। নিছক ব্যাখ্যামূলক মিথ যেগুলি, তাদের মধ্যে এটা অস্পষ্ট। সেগুলিই আদিমতম উপকরণ মোটামুটি অক্ষুন্ন রেখেছে। একটু পরের পর্যায়ের মিথেই দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। সাপের জিভ চেরা কেন, না, মানুষকে ঠকিয়ে অমরত্বের মহাজ্ঞান নেবার শাস্তি হিশেবে দেবতার অভিশাপে এমন হয়েছে— এই মিথে মানুষ এবং প্রকৃতির (যার প্রতীকী প্রতিনিধি এ গল্পে সাপ) সংঘাত অস্পষ্টভাবেই সূচিত হয়েছে। আগুন আয়ত্তে আনার স্তরের কাহিনীতেই সংঘাত অনেক বেশি সুপরিস্ফুট : দেবভোগ্য অগ্নিকে টাইটান প্রমেথিউস (এখানে শ্রমজীবী 'সাধারণ' মানুষের প্রতীকী প্রতিনিধি) হরণ করে নিয়ে আসার জন্য দেবরাজ জিউস (ক্ষমতাবান্ শ্রেণীর প্রতিনিধি) দশ (মতান্তরে, ত্রিশ) হাজার বছর ব্যাপী নির্মম শাস্তির এক ব্যবস্থা করলেন। প্রথম গল্পে মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বে, দেবতার ওপর 'নির্ভরশীল' হওয়ায় মানুষ তার শত্রু সাপকে লাঞ্ছিত হতে দেখল, দ্বিতীয় গল্পে মানুষ এবং দেবতাই দেখা যাচ্ছে পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। অর্থাৎ দ্বন্দ্বের চেতনাটা সামূহিক নির্জ্ঞানে থেকেই যাচ্ছে, শুধু বদলে যাচ্ছে দ্বন্দ্বের উপলক্ষ এবং পাত্র। সমাজ-বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই এটা ঘটেছে।

আরও পরবর্তী স্তরের দুয়েকটি মিথের কথা এখানে বললে ব্যাপারটা হয়ত আরো সুপ্রতিষ্ঠ হবে। কৃষি এবং পশুপালনের স্তরে যে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব কৃষক এবং পশুপালকের মধ্যে সঞ্জাত হয়েছে, সমকালীন লোকপুরাণকেও প্রভাবিত করেছে সেটি। তাই আদম ও ইভের কৃষিজীবী পুত্র কেইন হত্যা করছে তার পশুপালক ভাই আবেলকে, কৃষির দেবতা ওসাইরিসকে তার ভাই সেট, (যে-কিনা আবার পশুচারণাজীবী) হত্যা করলে তার বদলা নেয় নিহত দেবতার পুত্র হোরাস; কৃষিসভ্যতার প্রতীক সীতাকে হরণ করেও পরিণামে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রতিভূ রাবণ পরাভূত হয় ; শস্যদেবতা তম্মুজের বন্যবরাহের দাঁতে মৃত্যু ঘটলেও, তার প্রেমিকা ইস্তার তাকে ফের ফিরিয়ে আনে পৃথিবীর বুকে। বাংলা ব্রতকথায় দেখি, কৃষিকাজ শিখে বিনন্দ অন্য রাখালদের হটিয়ে দিচ্ছে জমি থেকে। অর্থাৎ, সর্বত্রই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিজয়ই প্রতীকায়িত হয়েছে পরিণতিতে।

শ্রেণীবৈষম্য যখন সমাজে আরো প্রবল, তখনকারে মিথেও সেটা স্পষ্টতর : চুক্তিভঙ্গ করে বাসুকীর-বিষে-জর্জর দানবদেরকে প্রতারণা করল দেবতারা, নিয়ে

পালাল অমৃতের সম্ভার। কৃষির পরবর্তী স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী-সমাজ গড়ে ওঠার চিত্র এখানে নিঃসংশয়িত; দেহশ্রমের বিষ বৃহৎ একটি দলকে যখন জর্জর করে, অপহৃত অমৃতের আস্বাদ তখন পায় পরশ্রমজীবীরা। মিথ এই সত্যকে অস্বীকার করে না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

কিন্তু এতটা বস্তুধর্মিতা থাকা সত্ত্বেও মিথের মৌলিক চরিত্রে যে দেব-সম্পর্ক অটুট তার ফলেই এর তাৎপর্যও সীমাবদ্ধ। একালে আর মিথ গড়ে-ওঠা সম্ভব নয় হয়ত সেই কারণেই। তবু, যাঁরা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দিয়ে অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, প্রচাব করতে চান ইতিহাসের ঘড়িকে থামিয়ে রাখতে চান, পিছনে ঘোবাতে চান তার কাঁটাকে, তাঁরা আজও মিথ গড়বার চেষ্টায় অক্লান্ত। তা না-হলে 'দেবতারা' গ্রহান্তর থেকে এসে পৃথিবীর আদি মানবীর গর্ভে উন্নততব সভ্য মানবের আগমন সূচিত করে গেছে অতীতকালে এই দানিকেনীয় 'নব্য'-মিথ এত জনপ্রিয় হয় কেমন করে! শ্রেণীশাসিত সমাজের অধিকাংশ মানুষের মনের মধ্যেই বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সঙ্গে 'অলৌকিকতা' এবং 'দৈবশক্তিকে' মিশিয়ে ফেলার যে প্রবণতা টিঁকিয়ে রাখা হয়—সেটাকে ভাঙিয়েই এমনটি প্রচার করা সম্ভব। নিউটনের মুখে যা ছিল অর্ধ-পরিহাস, এই 'নব্য'—মিথ স্রষ্টারা তাকেই পুরো বিজ্ঞান বলছেন। আদিম কিংবা প্রাচীন মিথ কিন্তু এমন ছলনা করেনি।

লোকপুরাণ সংস্কৃতির লোকায়ত এবং ধ্রুপদী দুটি পবস্পরসাপেক্ষ ঐতিহ্যের মধ্যে মেলবন্ধন করে। সমাজের কলেকটিভ আনকনসাস ঐ বন্ধনের অলক্ষ্য ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে। পুরাণ বলতে ভারতে অবশ্য যে বিশেষ ধরণের সাহিত্য বোঝায়, তার সঙ্গে স্মার্তবিধিশাসিত সমাজব্যবস্থার একটা সুনিবিড় যোগাযোগ ছিল বলে, লোকপুরাণ আমাদের দেশে এক সুদীর্ঘস্থায়ী অবহেলাব শিকার হয়েছে। বলতে গেলে লোকপুরাণের অস্তিত্বই আমাদের শ্রেণীভিত্তিক সমাজে প্রায় বিস্মৃত হয়ে থেকেছে। চীনা লোকপুরাণ বা গ্রীক কি টিউটনীয় মিথোলজির ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়নি: মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় পুরাণও সে দুরবস্থার হাত থেকে বেঁচেছে। এর মূল কারণ, সামাজিক শ্রেণী বিভাজনের পরিচালিকা শক্তি স্বরূপ স্মার্ত ধর্মবিধি সেগুলিকে ব্যাখ্যা করেনি। এর ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের বর্তমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে প্রাচীন পুরাণবৃত্তগুলি বিচ্ছিন্ন থাকলেও, পণ্ডিতবর্গের চর্যা-চর্চায় তাদের একটা মূল্যবান্ ভূমিকা থেকে গেছে। ফলে আমাদের দেশে পুরাণচর্চার পরিণতি

হিসেবে লোকপুরাণের প্রতি যে উপেক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রগুলিতে তা হয়নি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই মিথের বিশ্লেষণ হয়েছে। আমাদের মিথ-চর্চায় সেই অভাব থাকায়, যথা অর্থে ধ্রুপদী পুরাণের ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা অনায়ত্ত থেকে গেছে। পুরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের চেতনাকে জড়তাগ্রস্ত করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তার বস্তুধর্মী বিচার তাই এখন অতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই সংকলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সেটাই।

মিথ ও লোকাচার

—দীনেন্দ্রকুমার সরকার

ঘরে ফিরবেন বেদ-ঋষির শিষ্য উতঙ্ক। গেলেন গুরুর কাছে। বিদায়বেলায় দেবেন গুরুদক্ষিণা। গুরুর ইচ্ছা, ব্যাপারটা স্থগিত থাক। কিন্তু উতঙ্কের নির্ব-ন্ধাতিশয্যে গুরু তাকে পাঠিয়ে দিলেন নিজের স্ত্রীর কাছে, যে ঋষিপত্নী স্বামীর অবর্তমানে এই উতঙ্ককেই ঋতুরক্ষার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ঋষিপত্নীর যে কোন আকাঙ্খা পূরণই হবে গুরুদক্ষিণা। আদেশ হলো—রাজা পৌষ্যের ক্ষত্রিয়া পত্নীর কাছ থেকে দুটি কুণ্ডল চেয়ে আনতে হবে। কারণ তা-ই পরে তিনি 'পুণ্যক'-ব্রতে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে চান।

উতঙ্ক চলেছেন পৌষ্যরাজের পুরীর উদ্দেশ্যে, পথ আটকে দাঁড়ালেন এক বিরাটকায় বৃষারূঢ় পুরুষ। আদেশ করলেন, তাঁর বাহনের পুরীষ ভক্ষণ করতে। তাতে ঈপ্সিত ফল লাভ হবে। অস্বীকার করলেন উতঙ্ক। পুরুষটি বললেন, 'তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে একাজ করেছিলেন'। গুরু যদি ভক্ষণ করে থাকেন, আর এতে যদি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, ক্ষতি কি? বৃষমল এবং মূত্রপান এবং আচমন করে রাজবাড়ীতে গেলেন তিনি। সামান্য বাধার পর কৃতকার্য হলেন উতঙ্ক।

কাহিনীটি মহাভারতের। এর দুটি দিক। প্রথমটি— পথে দৈবানুগ্রহ। দ্বিতীয়— অনুগ্রহটি মূত্রপুরীষ পানের আচার তথা লোকাচার।

রামায়ণ বা মহাভারত সাধারণ পরিভাষায় ইতিহাস-পুরাণ। রামায়ণে সমাজ-ইতিহাসের যে পরিচয় আছে, তার চেয়ে মহাভারতে আছে অনেক বেশি। রামায়ণে চিত্রিত সমাজ-ইতিহাস পাঠককে কৌতূহলী করে তুলতে পারে না; তার অন্যতম প্রধান কারণ নায়ক রামচন্দ্রের অবতারত্ব, সীতা-চরিত্রের বিরহ, সহনশীলতা এবং বিষাদান্তক করুণ পরিণতি। ইতিহাস পাঠের যুক্তিবাদী মনকে ভারতীয় (ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় 'ইরাণীয়' প্রভাবে) ভক্তিবাদ আচ্ছন্ন করে রাখে। অন্যদিকে মহাভারতের পাঠক এই ভক্তিবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন হবার সুযোগ পান না (ভীষ্ম-পর্বের ১৮টি অধ্যায়কে কেটে নিয়ে যে 'গীতা' সৃষ্ট হয়েছে,

তা-ই স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে অভাব পূর্ণ করে। 'গীতা'র যুক্তিবাদী পাঠকের তুলনায় ভক্ত-পাঠকের সংখ্যা অনেক— অনেক বেশী।) বলেই, ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে ইতিহাসের দিকে, যুক্তিবাদের (বকরূপী ধর্মের যধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে কথোপকথন স্মরণীয়— এই প্রসঙ্গে) দিকে দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয় (মহাভারতের রচনাকারীর উদ্দেশ্যেও হয়তো এ-ই ছিল)। তাই, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ হয়েও, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিচারে ইতিহাস। তবে, সে ইতিহাস মূলত সমকালীন লোক-জীবনের ইতিহাস। তাই, এরা মূলত লোক-পুরাণ।

পুরাণ কী? এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা ঋষি দেবতা দৈত্য প্রভৃতির বংশ-বিবরণ এবং বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা ও মন্বন্তর— এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ।' অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তির বংশ-বিবরণ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ এই ক'টির দিকে পুরাণের রচনাকালে লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

যেহেতু, আলোচ্য উল্লিখিত-কাহিনীতে ঋষি রাজা এবং দেবতার কথা আছে এবং যেহেতু এরা সকলেই বিশিষ্ট লৌকিক এবং অলৌকিক ব্যক্তি তাই পুরাণের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। মুনি-ঋষি-রাজা এরা লোক জীবনের কল্পিত (?)— ঐতিহাসিক চরিত্র, তাই লোক বা ইতিহাস-পুরাণের পর্যায়ভুক্ত, অন্যদিকে, বিরাটকায়, বৃষারূঢ় পুরুষ, যেহেতু, বেদ-মুনির ভাষায়, ঐরাবত বাহন ইন্দ্র এবং পৃথ্বীভক্ষণ করিলেই ঈপ্সিত ফললাভ করাতে পারেন, তাই তিনি অতিলৌকিক বা দেবতা-পর্যায়ভুক্ত।

ই রাজীতে পুরাণ, ইতিহাস-পুরাণ, বা লোক-পুরাণ—এদের কোন সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হবে? এ-ভাষাতে এই জাতীয় ২টি শব্দ মূলত পাওয়া যায়—Myth এবং Legend। এর মধ্যে Legend শব্দটির প্রসঙ্গে আছে—Originally something to be read at religious service or at meals usally a saint s or martyr s life.. Legend has since come to be used for a narrative supposedly based on fact, with an inter-mixture of traditional materials told about a person, place or incident.

এই সংজ্ঞা অনুসারে legend-এ কোন অলৌকিকতা বা অতিলৌকিকতা নেই। Saint দের কথায় কোথাও কোথাও সে ব্যাপার ঘটলেও মুখ্য বক্তব্য মানুষেরজীবন-কথা। তাই এরে লোক-পুরাণ বা ইতিহাস-পুরাণ বলাই অধিকতর

যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। অন্যদিকে Myth-এর কথা বলতে গিয়ে ঐএকই অভিধান বলছেন : A story, presented as having actually occured in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of a people or their gods, heros, cultural traits religious beliefs etc.

এই দৃষ্টিতে myth-এর আলোচ্য বিষয় ভারতীয় পুরাণের মতই। সৃষ্টিতত্ত্ব অতিলৌকিক বিশ্বাস —এরাই myth-এর বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় পুরাণে ইউরোপায় myth এবং legend এর দুয়ের এই সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব দেব বা দেবায়ত-চারিত্রবৈশিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাই এগুলিকে কেবল পুরাণ না বলে দেব পুরাণ বা ধর্ম পুরাণ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

তাই বর্তমান প্রবন্ধে mythology বা myth কে দেব পুরাণ বা ধর্ম পুরাণ এবং legend কে লোক পুরাণ বা ইতিহাস পুরাণ বলে চিহ্নিত করা হবে। কারণ এর বিভাগের সাহায্যেই কেবল myth এবং legend—এর দুয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা সম্ভব।

তবু মনে রাখা দরকার—যেহেতু এগুলি মানুষেরই সৃষ্টি, এবং বিভিন্ন জন গোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ফসল তাই একের প্রভাব অন্যের উপর পড়েছে এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বা দুটিরই রূপান্তর ঘটেছে। তাই একই কাহিনীর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে লোক-পুরাণ এবং দেব-পুরাণ মিশে আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আলোচ্য উপাখ্যানে ইন্দ্রের অলৌকিক নির্দেশের সঙ্গে মিশে গেছে ঋষির কুণ্ডলপ্রাপ্তি-বিষয়ক লৌকিক ঘটনা।

Myth বা দেব-পুরাণ সম্পর্কে যে কথা বলা হয় তা হলো —এটা একটা গল্প (Story), যা প্রকৃতই অতীতে ঘটেছিল (এ সংজ্ঞা আগেই উল্লিখিত হয়েছে)। অর্থাৎ গল্পগুলিকে ধর্মীয় বা দেববাদের চিন্তার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্থ হয়েছে মানুষ। কিন্তু, না দেখতে পায় দেবতাদের না তেমন কোন ঘটনা আজ আর বাস্তবে ঘটে। যা আজ আর বাস্তবে ঘটে না, তাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করা মুস্কিল। দেব পুরাণ বা ধর্ম-পুরাণকে কাল্পনিক আখ্যা দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তাই oxford অভিধান সোজাসুজি বলেন : (১) A Purely fictitious

narrative usually involving supernatural persons, actions or events and embodying some popular idea concerning natural or historical phenomena. (২) A fictitious imaginary person or object.

দুটি সংজ্ঞাতেই **fictitious, supernatural** এবং **imaginary** বিশেষণগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। **Myth** হচ্ছে মিথ্যা, অতিলৌকিক এবং কাল্পনিক। —অন্তত অক্সফোর্ড অভিধানের মতে। যাচাই করে দেখা যাক এই বিশেষণগুলিকে।

ড. নীহার রঞ্জন রায় কিন্তু **myth**-কে মিথ্যা বলতে রাজি নন। তিনি বলেন: "মিথ কি মিথ্যা? তা নয়, যত ক্ষুদ্র হোক প্রতি কিংবদন্তী ও পুরাকাহিনীর মূলেই একটি সত্য থাকে। সেই সত্য জাতির জীবনে পবিত্র, তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শরূপে থাকে।"৩ আমরা সেই সত্যকে খুঁজে পাচ্ছিনা বলে myth-কে বলছি fictitious.

অতিলৌকিক বা **supernatural** বলার পেছনে যে যুক্তি, তা হলো বিভিন্ন মিথ-এ বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়ার উল্লেখ থাকে; সেই প্রক্রিয়ায় দেবতা, দেবায়ত মানব, মুনি ঋষি তথা saint-রা এমন সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে কাহিনীতে উল্লেখ আছে, যা বাস্তবে আমরা প্রয়োগ করতে পারিনা, বা করেও কোন ফল পাই না। যেমন, ধরা যাক উল্লিখিত উতঙ্ক-কাহিনীর গো-পুরীষ-মূত্র ভক্ষণ-পানের কথা। ইন্দ্রাদেশে বৃষ-মল-মূত্র পান করে অতি সহজেই সে ঈপ্সিত 'কুণ্ডল' লাভ করেছে। কিন্তু আমরা তো জানি ওগুলি পান ভক্ষণ এ যুগে আর প্রার্থিত বস্তু-প্রাপ্তির পথ সুগম করে না। তাই সেই প্রক্রিয়া আজ supernatural আখ্যায় ভূষিত। কিন্তু **myth**-এ তার আপাতত সদ্ভব নেই বলে একে বলি অতিলৌকিক বা **supernatural**। কেমন করে এলো? এই সমস্যা সমাধানের আগে অন্য বিশেষণটি দেখে নিতে চাই।

তৃতীয় বিশেষণ—কাল্পনিক বা **imaginary**। প্রশ্ন জাগে-মানুষের কল্পনা কি জাগতিক-উৎসবহির্ভূত? বর্ষণসিক্ত আকাশে ধনুকের আকৃতিবিশিষ্ট যে বর্ণালী-বিচ্ছুরণ দেখা যায় ভারতীয় লোক-চিন্তা তাকে জানে 'রামধনু' বলে। রামধনু বললেই ভক্তিবাদী ভারতীয় মন কল্পনা করে রামচন্দ্রের হাতের ধনুকের কথা—যে ধনুক (হরধনু) ভেঙ্গে তিনি সীতালাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন (ইতিপূর্বে কোন রথী-মহারথী ভাঙ্গা তো দূরের কথা, তুলতেই পারেনি। পূর্ণ-

ব্রহ্ম রাম তা পেরেছেন ; তাই বিশাল সেই ধনু স্ব-মহিমায় মাঝে মাঝে দেখা দেয় মানুষকে রাম-মাহাত্ম্য দেখানোর জন্য)। ভক্তিবাদ যুক্তি মানতে চায়না। তাইতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় ৺ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন রামের অবতারত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তখন যেভাবে তাঁকে আক্রমন করা হলো, তা সম্ভবত যুক্তিবিহীন ভক্তিবাদের দেশেই সম্ভব !

রাম অবতার, তাঁর হাতেই রামধনু মানায় ; ভক্তিবাদী ভারতবর্ষ এটা মনে করে বলেই বর্ণালী-বিচ্ছুরণকে ধনুকাকৃতি হওয়ায় (কারণটা কিন্তু প্রাকৃতজ, supernatural কিছু নয়) লোক-বিশ্বাসে নির্দ্বিধায় রামের ধনুক বলে চিহ্নিত করলো। একবারও ভেবে দেখলো না— যে রামায়ণে রামকাহিনীর বর্ণনা আছে সেখানে কিন্তু কোথাও বর্ণালী-বিচ্ছুরিত ধনুকের বর্ণনা নেই। এমন কি আকাশে বিশেষ সময়ে তার সংস্থাপনের উল্লেখও নেই। তবু লোক-বিশ্বাসে, যুক্তিবাদের দৃষ্টিতে ইউরোপ যাকে দেখেছে rainbow-রূপে, তাই হয়ে গেল রামের হাতের ধনুক। আর তার আবির্ভাব নিয়েও কত কল্পনা।—

"বাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"[৪]

প্রশ্ন জাগে, এই বিশ্বাসের জন্ম কেমন করে ? স্পষ্টতই বলতে হয়, দেববাদকে যাঁরা অলৌকিকত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, এ-ও সেই পৌরোহিত্যেরই সৃষ্টি। রামকে অবতার, —এই পৌরোহিত্যই করেছে। কারণ, 'রাম' নরদেহধারী হবার আগে ছিল 'রমনস্থান'। এটি আভিধানিক অর্থ এবং শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ।[৫] কিছুদিন আগে[৬] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামায়ণ সম্পর্কিত যে সেমিনার হয়ে গেল তার একদিনের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনও উপরিউক্ত বক্তব্যই রেখেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, ইরাণীয় ভক্তিবাদ শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

তাহলে 'রামধনু'র অর্থ কী ?

ক্লান্তিকর, বর্ষণসিক্ত প্রায়ান্ধকার পরিবেশে ধনুকাকৃতি বিচ্ছুরিত-বর্ণালীর যে চিত্র মানুষকে, তার মনকে রমন করে, আনন্দ-পুলকিত করে তা-ই রমনীয় ধনু বা রামধনু। পৌরোহিত্য যখন এই অতিবাস্তব সত্যকে নতুন ব্যাখ্যায় প্রকাশ করলো, তখন রামধনুর অর্থানুষঙ্গ এবং ভাবানুষঙ্গ imaginary বা কাল্পনিক হয়ে

পড়লো। কিন্তু, কোনটা কাল্পনিক—রমণীয় ধনু না রামের ধনু ? কোনটাই তো কাল্পনিক নয়! ধনুকাকৃতি দৃশ্যটি রমনীয়—এটা যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, তেমনি পৌরোহিত্যের ব্যাখ্যায় ভক্তিবাদীর কাছে রামের ধনু মানস-সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। রামকাহিনী রামায়ণে বা অন্যত্র বাস্তবসত্যরূপেই তো প্রতিষ্ঠিত ভক্তের মনোজগতে! অতএব কল্পনা কোথায়? অবশ্য বাস্তবসত্য এবং কাল্পনিক সত্য এক নয়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতে রামকাহিনীকে কেন্দ্র করে কোন ভক্তিবাদী মানস-পরিমণ্ডল গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, আজও নেই। অথচ শিকারের অন্যতম শস্ত্র (অস্ত্র নয়) ধনুকের আকৃতির মত প্রতিভাত হয়েছিল বলেই শব্দ দুটি (ভারতের ধনু, ইউরোপের bow) সৃষ্টির প্রথম যুগে উভয়দেশের অরণ্যচারী মানুষ ধনুকই বললো। বিরুদ্ধ-প্রকৃতির বুকে সংগ্রামের মধ্যে যাদের বাঁচতে হয়, ইউরোপীয় তারা দৃশ্যটির মধ্যে, শব্দ-সৃষ্টির প্রথম যুগে কোন রমনীয়ত্ব খুঁজে পেলো না ; বরং বৃষ্টির সঙ্গে এর আবির্ভাবের সম্পর্ক—এই অতি বাস্তব সত্যকে সামনে রেখে সোজাসুজি নামকরণ করলো—Rainbow।

কি ভারত, কি ইউরোপ, কোথাও শব্দ দুটি সৃষ্টির মূলে imagination-এর ছায়া পর্যন্ত নেই।

দেব-পুরাণ বা ধর্ম্ম-পুরাণ কেমন করে myth-এর সৃষ্টি করে তা-ই আলোচনার জন্য এতকথা বলা। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সত্যকে খুঁজে পাই না বলে বলি কাল্পনিক। Myth শব্দটি তাই এখন বিশেষণ পেয়েছে— fictitious, supernatural, imaginary।

॥ ২ ॥

যে Myth আজ মিথ্যা, অতিলৌকিক এবং কাল্পনিক আখ্যা পেয়েছে তার জন্ম-ইতিহাস কি? Maria Leach (উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি) সুদূর অতীতে ঘটেছে এমন গল্পকথাই myth।

আর একখানি অভিধানের[৭] মতে myth হচ্ছে : A fable or legend of natural upgrowth embodying the convictions of a people as to their gods or their divine personages, their own origin and early hisiory and the heros connected with it, the origin of the world etc.; in a looser sense, an invented story; something purely fabulous or having no existance in fact.

অক্সফোর্ডের মত এই অভিধানখানিও বলছেন—বাস্তবে অস্তিত্ববিহীন, কোন একজন গোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত, গল্পকাহিনীই Myth কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কোন গল্পই কোন এক বিশেষ যুগে এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত হয়ে চিরকাল একই আকারে থাকে না। অর্থাৎ, অন্যান্য লোক-কাহিনীর মতই Myth -ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাব ভাবনার সংমিশ্রণে নবগঠিত হতে হতে এগিয়ে চলে। ফলে বিশেষ জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবিত কাহিনী বহু ভাবনার মিলনে মূলত দেবতা এবং ধর্মচিন্তা, বর্তমানে অতিলৌকিক কথাবস্তু তথা লোকাচার, লোকাচরণ সমূহই Myth বা দেব—, ধর্ম পুরাণের বিষয়বস্তু হয়ে বিশেষ জন-গোষ্ঠীতে বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সংজ্ঞা এগুলো হলেও Myth-শব্দটির অর্থ কি? অভিধানের মতে, মূলে গ্রীক ভাষার mythos শব্দের অর্থ— a word, a legend। অক্সফোর্ডের মতে, L. Latin এ শব্দটি ছিল mythos, mod, Latin-এর উচ্চারণ mythus; তাই থেকে myth। অর্থাৎ, গ্রীক বা Latin-এর মিথোস্ থেকে মিথ-শব্দটির জন্ম। অর্থ-কাহিনী, কথা, কেচ্ছা কথা।

কথাই হোক আর কাহিনীই হোক, তা বলার জন্য, মনের ভাবপ্রকাশের জন্য, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। কিন্তু কারা বলতো? কাদের কাছে বলতো? মনে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে Conviction of a people। নিজেরাই পরস্পরের মধ্যে কখনও দুজনে, কখনও বা সমস্ত গোষ্ঠী মিলিত হয়ে নিজেদের সৃষ্টিকথার পুরোনো ঐতিহ্য, দেবতা, বীরের কীর্তি-কলাপ অথবা পারস্পরিক আলাপ আলোচনাই myth বা mythos বা mythus.

আমরা একে গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষার শব্দ বলে জানি। কিন্তু অনেকেই জানিনা হয়তো, যে শব্দটি ঐ ভাষার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি নয়। একই অর্থে, একই উচ্চারণে শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যত্র আছে। ভারতীয় আর্যভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক বা ছান্দসের যুগথেকে অন্তত কথা-সরিৎ-সাগরের যুগ পর্যন্ত কেমনভাবে ব্যবহৃত হতো তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।—

নকির্হ্যেষাং জনূষি বেদ তে অঙ্গ বিদ্রে মিথো জনিত্রম্।

অভি স্বপূভির্মিথো বপন্ত বাতস্বনসঃ শ্যেনা অস্পৃধ্রন্ ॥ ঋ. ৭. ৫৬. ২-৩

বঙ্গার্থঃ কেউ এদের জন্ম জানে না। তারাই পরস্পর আপনাদের জন্মকথা

জানেন আপনারাই সঞ্চরণ করে পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগশালী শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করেন।[৮]

রাম যখন বনগমন করছেন তখন অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ রামবিহীন অযোধ্যায় থাকার চেয়ে তাঁর সঙ্গে বনগমনই স্থির করলো। এ ব্যাপারে—সর্বে সংজল্প্য-রথো মিথঃ।[৯] জল্পনা পারস্পরিক।

ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজের বিলাপ-বর্ণনা করছেন কালিদাস ঃ

গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। ৮।৬৭।

করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম। রঘুবংশম্

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি আমার ঘরণী, পরামর্শের সচিব, প্রেমের বধু, ললিতকলায় আদরের শিষ্যা—নিষ্করুণ বিধি তোমাকে কেড়ে নিয়ে আমার কী না নিয়ে গেল বলো।[১০] এখানেও মিথ শব্দের অর্থ 'যৌথভাবে' 'সমবেত ভাবে'।

ইন্দ্রের আহ্বানে মদন বা কামদেব দেবসভায় উপস্থিত। সভার নিয়ম লঙ্ঘন করে, অতিরিক্ত প্রয়োজনের তাগিদে, দেবরাজ তাকে নিজের পাশে বসালেন। তখন 'স্মর'—

ভর্তুঃ প্রসাদং প্রতিনিন্দ্য মূর্ধ্না বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্।

কুমারসম্ভব। ম ৩১।৩২।

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রভুর অনুগ্রহকে অভিনন্দিত করে মাথা (মুখ) নীচু করে মদন বলতে লাগলেন।[১১] এরপর ইন্দ্র-মদনের পারস্পরিক আলোচনা এবং পরামর্শ বর্ণিত। এখানেও 'মিথ' অর্থ পারস্পরিক কথাবার্তা।

অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ।

(১) নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ যশ্চাপি নিষ্পতেৎ॥ মনুসংহিতা ৮।৫৫

বঙ্গানুবাদ ঃ যে নির্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথাবার্তা কহিয়াছে, অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না (তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হয়)।[১২]

(২) মিথো দায় কৃতো যেন গৃহীতো মিথ এব বা।
মিথ এব প্রদাতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ॥ মনু. ৮।১৯৫

বঙ্গার্থ ঃ নির্জনে (অন্যের অনুপস্থিতিতে, পারস্পরিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—বর্তমান লেখকের সংযোজন) গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং নির্জনে গচ্ছিত লইয়াছে, এমতস্থলে নির্জনেই গচ্ছিত প্রত্যর্পন করিবে ; যেমন গ্রহণ তেমনই প্রত্যর্পন।[১২]

গুণাঢ্য-বিরচিত 'পৈশাচী' ভাষার 'বৃহৎকথা'র সংস্কৃত অনুবাদ করেন কাশ্মীরের সোমদেব ভট্ট। ঐ গ্রন্থের 'কথাপীঠ' নামক প্রথম লম্বকের দ্বাবিংশ তরঙ্গে গরুড় এবং সর্প প্রসঙ্গে আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

পুরা কশ্যপভার্যে দ্বে কদ্রুশ্চ বিনতা তথা।
মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল চক্রতুঃ॥

বঙ্গার্থ : বলা হয়েছে, পুরাকালে কশ্যপের দুই স্ত্রী কদ্রু এবং বিনতা পরস্পর বিবাদ করেছিল।

এ ছাড়া, বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র, যা এখনও হিন্দুদের ধর্মীয় ক্রিয়া কাণ্ডে ব্যবহৃত হয়, তার নজির পুরোহিতদর্পন জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সেখানেও মিথঃ শব্দের একই অর্থে ব্যবহার আছে।

এককথায়, ঋক্সূক্ত থেকে শুরু করে বৃহৎকথা বা বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো তার সর্বত্রই মিথঃ শব্দটির মৌলিক অর্থ পারস্পরিক আলোচনা। আরও একটি লক্ষণীয় দিক আছে। —গ্রীক্ বা ল্যাটিনে শব্দটি ছিল Mythos বা Mythus ; ঠিক তেমনি ভারতীয় আর্যভাষায়ও শব্দটি মূলে মিথস্। mythos ইংরেজীতে হয়েছে myth। বৈদিক মিথস্ হয়েছে মিথঃ। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় mythus এর মতই ভারতীয় ভাষায় মিথুন একটি শব্দ আছে। এরও আভিধানিক মৌলিক রূপ মিথ।

গ্রীক সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পরের। অতএব গ্রীক ভাষা থেকে এ শব্দ ভারতীয় আর্যভাষায় আসতে পারে না। আর্যদের আগমনের পর ভারতে প্রথম বিদেশী আক্রমন খ্রীঃ পূর্ব ৬ শতকে পারস্যরাজ দরায়ুস-এর। খৃঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকরাজ আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমন (ঋক্ সূক্ত এর বহু আগেই রচিত। আর এখানেই প্রথম মিথঃ বা মিথস্-শব্দের ব্যবহার— পারস্পরিক কথোপকথন অর্থে ; যে অর্থের সঙ্গে গ্রীক্ mythos বা mythus শব্দের মূলগত অর্থ মেলে)।

একথা সর্বজনবিদিত যে ভারতীয় বা ইউরোপীয় আর্যদের প্রাচীনতর বাস-ভূমি মধ্যপ্রাচ্য। সেই মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের পারস্য-দেবতা মিথ্র। এঁর নামও মিথ্র বা মিথ্রস। ভারতে বৈদিক ধর্মে ইনি হয়েছেন মিত্র বা সূর্য। পরবর্তী কালে সৌরশক্তিতে, পৌরোহিত্যের ব্যাখ্যায়, রূপান্তরিত হলেও মূলে ইনি ছিলেন অর্ধনারীশ্বর বা মিথুন-দেবতা।—

"The Parsian Mithra was a god and goddess combined. Herodotus, in fact, appears not to have known that he was other than a female deity. He says, the Parsians worshipped Urania, which they borrowed from the Arabians and Assyrians. Mylitta is the name by which the Assyrians know this godess, whom the Arabians call Alitta, and the Parsians Mithra.[১৩]

হেরোডোটাস এবং ম্যাকেঞ্জির এই সাক্ষ্যকে যদি ধর্ম-পুরাণ না বলে ধর্মের ইতিহাস বলি, তবে মিথ্ বা মিথ্স, ভারতের মিথুন (যার ধাতু √মিথ্) গ্রীসের Mythus একই হয়ে যায়। অন্ততঃ 'The Parsian Mithra was a god and goddess combined.— এই সাক্ষ্যের আলোকে। আর তা যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গ্রীক Mythos বা Mythus, ইংরাজীর myth, ভারতীয় মিথস্ বা মিথঃ, পারস্তের মিথ্স্ বা মিথ্ (শব্দটির উৎসে) একই শব্দ। এবং সর্বত্রই অর্থ পারস্পরিক মিলন, আদান প্রদান। এবং যেহেতু এই তিন সভ্যতার মধ্যে পারস্যীয় জরথুষ্ট্রীয় এবং ভারতীয় বৈদিক প্রাচীনতর সভ্যতা, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় Mythos বা Mythus গ্রীক শব্দ নয়— এটি ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর প্রাচীনতর ভাষা-ভাণ্ডারেই ছিল। এবং সেখানে অর্থ ছিল পারস্পরিক ভাব এবং অনুভূতি, ইচ্ছা এবং আকাংক্ষায় আদান প্রদান।— এই আদান প্রদান —এতো fictitious নয়, real; supernatural নয়, অত্যন্ত natural; imaginary হতে পারে না, এরা day-to-day experience based.

॥ ৩ ॥

কি ভারত, কি মধ্য-প্রাচ্য, কি ইউরোপ বা দূরপ্রাচ্য সর্বত্রই আজ myth-এর ঘটনা, কাহিনী বা আচার-আচরণ সবই অতিপ্রাকৃত, অবিশ্বাস্য এবং কাল্পনিক মনে হয়—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু, প্রত্যেক দেশের myth বা দেব, ধর্ম-পুরাণের সংজ্ঞায় বারে বারে স্বীকার করা হয়েছে যে পুরাকালে বা সুদূর অতীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এইসব কাহিনীকে প্রত্যক্ষ বাস্তব বলেই জানতো। যে দেবতা, তাদের ক্রিয়াকলাপ· অথবা তৎসংক্রান্ত বর্ণনা আজ অতিজাগতিক বা কল্পরাজ্যের বলে মনে হয়, তারাও কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে এককালে প্রত্যক্ষ বাস্তব ছিল (এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা অন্যত্র[১৪] করেছি)। কিন্তু আজ তাদের অবাস্তব, কাল্পনিক অথবা অতিলৌকিক মনে হয়। এর কারণ কী?

প্রথমত, মনে রাখা দরকার সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে স্তরে এদের জন্ম, তাকে আজকের মানুষ এত-এত পেছনে ফেলে এসেছে যে তাকে ভাবতেও সে পারে না। দ্বিতীয়ত, সেই জীবনযাত্রার লোকাচার-লোকাচরণ এমন পর্যায়ের ছিল, যার সম্বন্ধে আজকের সভ্যতা চিন্তাই করতে পারে না যে আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতৃপুরুষরা তেমন জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন। তৃতীয়ত, বেদ—, ধর্ম্ম-পুরাণ-গুলির উপর আবহমানকালের এত বৈচিত্রময় হস্তাবলেপন পড়েছে যে হাজার বছরের পুরোনো বটগাছের মত মূল শেকড়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে এককালে তার একটিই মূল ছিল, আর আজ সে শতমূলী হয়ে পড়েছে। চতুর্থত, মূলকাহিনী বা অভিজ্ঞতার মিথ-কথার উপর পৌরোহিত্যের সুপরিকল্পিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সেই ব্যাখ্যার খোলস ভেঙে সত্যকে স্বরূপে প্রকাশ অত্যন্ত দুরূহ।

পৌরোহিত্যের সুপরিকল্পিত কাহিনীবিন্যাসের ফলে ভক্তের ভাব-ভাবনা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সে বিশ্বাস করতে অভ্যস্থ হয়েছে যে দেবতারা অথবা প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিকুল (আকাশের সপ্তর্ষি) স্বর্গবাসী। স্বর্গ কোথায়? —উর্দ্ধাকাশের কোন একস্থানে (এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভক্ত-সাধকের উক্তি, এমন কি বিভূতিভূষণের 'দেবযান'-ও স্মর্তব্য)। দেবতারা কেমন দেখতে? ভক্তের নির্বিচার উত্তর—তাঁরা সকলেই মনুষ্যদেহাকৃতি বিশিষ্ট এবং প্রায় সবক্ষেত্রে (অল্পকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বয়সে তরুণ-তরুণী, রূপে অপরূপ-অপরূপা। এই দেব-কুলের হস্ত-পদ-মস্তকসংখ্যা ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে বাড়ে, কমে (অজ-একপাদ, মধ্যপ্রাচ্যের ফ্‌তা একপদ। বামনঅবতারে বিষ্ণু ত্রিপদবিশিষ্ট)। আবার প্রত্যেক দেবতাই কোন না কোন মানবেতর প্রাণীকে বাহনরূপে পেয়েছেন। দেবর্ষি নারদের ভাগ্যে জুটেছে— প্রাণী নয় ঢেঁকি।

বর্তমানে দেবকুল মনুষ্যরূপী, পশুপক্ষী সরীসৃপবাহন হলেও দেবপরিকল্পনার ক্রমবিবর্তন ধারায় এর ঠিক অব্যবহতি পূর্ববর্তীস্তরে এঁরা সকলেই ছিলেন অর্ধপশু-অর্ধ-মানব-মানবী। গণেশ গজানন, দক্ষপ্রজাপতি ছাগমুণ্ড, নৃসিংহরূপী বিষ্ণু, বারাহীদেবী, ভ্রামরী দুর্গা, কোকামুখী দুর্গা—এমনি দেশবিদেশের সংখ্যাতীত দেবতার নাম করা যায়।

আরও পেছনের দিকে তাকালে দেখবে অন্য আর এক রূপ। সেখানে দেবতাদের কোন বাহন নেই। কিন্তু এযুগের বাহনরাই সেযুগের দেবদেবীকুল।

অর্থাৎ, কাক, চিল, শকুন, বাঘ, কুকুর (এযুগেও কুকুরবাহন ভৈরব বা বটুক ভৈরবের পূজার বহুল প্রচলন আছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে), সাপ, কুমীর—এরাই দেবদেবী-রূপে পূজিত।[১৫]

দেব-পরিকল্পনায় প্রথম যুগে কেন এরা দেবত্বের মহিমা পেল তার আলোচনা আছে আমার 'বাঙালীর বারোমাসে তেরো পার্বন'—প্রবন্ধে।[১৬]

কি মানুষ, কি মানবেতর প্রাণী কেউই কল্পরাজ্যের অধিবাসী নয়, সকলেই বাস্তব পৃথিবীর, অতি প্রত্যক্ষ প্রাণিকুল। অথচ এদেরই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দেবপুরাণ বা ধর্ম-পুরাণ।

বৃহৎ লক্ষ্মীচরিতে আছে প্যাঁচার পিঠে চড়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাতের অন্ধকারে মানুষের সুখ দুঃখ দেখবার জন্য আকাশপথে ঘুরে বেড়ান, তাদের কথা আলোচনা করতে করতে সরজমিনে তদন্ত করেন। সুখী দম্পতিকে দেখলে আমরাও বলি, স্বামী-স্ত্রী যেন লক্ষ্মীনারায়ণের মত।

পেচক-বাহন লক্ষ্মীনারায়ণের আকাশপথে ভ্রমণ, মানুষের জন্য ব্যথিতচিত্ত আলাপ আলোচনা এ সমস্তই আমাদের চিন্তায় দেববাদ, দেবতার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অলৌকিক ধ্যান ধারণার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ব্রত উদ্‌যাপনের পর পুরোহিত যখন সংস্কৃতভাষায়, অথবা একনিষ্ঠ ভক্তিমতী ব্রতিনী যখন ধান-দূর্বা হাতে সেই কাহিনী শোনে, তখন পৌরোহিত্যের অনুশাসনপুষ্ট ভক্তিবাদী মন ভক্তির আলোকে প্রত্যক্ষ করে দেবতার অলৌকিক মহিমা। সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারে না যে যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে এ যুগে নরনারীরূপী প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মূলে তারা কিন্তু, দেব-পরিকল্পনার প্রথম যুগে পেচক-পেচকী। চোখ বিবর্তনধারার দিকে পড়ে না। ভক্তিকে যাঁরা যুক্তির আলোকে দেখতে চান, মানবচিন্তার এই বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বলে ওঠেন কাহিনী মিথ্যা, কাল্পনিক, অতিলৌকিক। পেচক-পেচকীই যে মূলে লক্ষ্মী এই বোধ আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, পেচকের আচরণ লক্ষ্য না করলে লক্ষ্মী-নারায়ণের আচরণ বোঝা যাবে না। প্যাঁচা রাতের অন্ধকারেই খাদ্যের অন্বেষনে বেরোয়। ক্ষুধার্ত প্যাঁচা পেঁচীর মনের কথাই দেববাদের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দুঃখকথায় রূপান্তরিত। তৃতীয়ত, পুরাণকথায় বহু জায়গায় আছে অভিশপ্তা লক্ষ্মীর নারায়ণ-বিরহের কথা। আমাদের একটা ধারণা আছে যে নরনারীর প্রেমে যে একনিষ্ঠতা দেখা যায়, নারীর পতিভক্তির যে নিদর্শন মানবসভ্যতায় পাওয়া যায়, তা মান-

বেতর প্রাণীতে নেই। মানবেতর প্রাণীকুল জৈব-তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের যাকে সামনে পায় তার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাম চরিতার্থ করে। এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এইসব প্রাণীও সঙ্গী-সঙ্গিনী বেছে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরণ স্বামী-স্ত্রী-রূপে বসবাস করে। মানুষও তার এক-কালের অত্যন্ত কাছের এইসব প্রাণী থেকে এইসব দিক গ্রহণ করেছে, সমাজ-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রেমের একনিষ্ঠতা পেচকের মধ্যে খুবই বেশী। Tawny-প্যাঁচারা দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রী-রূপে বসবাস করে।[১৭] পেচক-প্রেমের এইরূপ লক্ষ্মীনারায়ণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে সুন্দরভাবে স্থানান্তরিত।

লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী। স্নেহশীলা হলে কন্যা বা বধূকে আমরা 'লক্ষ্মী'-মেয়ে,-বউ বলি। তার পয়ে নাকি ঐশ্বর্যবৃদ্ধি, সন্তান-সন্ততি সুখে থাকে। প্যাঁচার মত শিকারী পাখি খুব কমই আছে, দূরাগত বিচিত্র ধ্বনির দিক নির্ণয়, রাত্রির অন্ধকারে শিকারের সময়, উ-উ, ঈ-ঈ শব্দ করে সহ-শিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, গর্তে গিয়ে ইঁদুর ধরা, মাছ শিকার করা বা অন্য ক্ষুদ্র প্রাণি-ধরার ক্ষমতায় প্যাঁচা প্রায় তুলনা-রহিত। আমাদের চক্রাবর্ত হয় ৩৬০ ডিগ্রিতে। প্যাঁচা তার মাথা ঘোরাতে পারে প্রায় ২৭০ ডিগ্রি। অর্থাৎ তার ঘাড়ের গঠন তাকে প্রায় সর্বদিকদর্শী করে তুলেছে। অক্ষিগোলককে ঘোরাতে না পারলেও ঘাড়ের সাহায্যেই সে সবদিকের শিকারের উপর লক্ষ্য রাখতে পারে। খাদ্যরূপ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করতে পারে। এই সর্বদর্শিতা লক্ষ্মীনারায়ণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

পতি-পত্নীর একনিষ্ঠতা কর্তব্য পালনের আরও দিক আছে। সন্তান প্রতি-পালনের সময় পুরুষ প্যাঁচা খাদ্য সংগ্রহ করে স্তূপাকার করে স্ত্রী এবং সন্তানের সামনে (আমাদের দেব-ভোগও স্তূপাকার করারই রীতি)। স্ত্রী-প্যাঁচা বসে থাকে; সন্তানকে খাওয়ায় কেবল। লক্ষ্মীনারায়ণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যে যা বিভিন্ন ধর্ম-পুরাণ বা দেবপুরাণ বা myth-এ বর্ণিত, তার সবই এসেছে, প্রায়, পেচক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে।[১৮]

আমাদর মাঙ্গলিক লোকাচারে উলুধ্বনি বা জোকার দেবার রীতি আছে। রাধাকৃষ্ণ বা বিবাহের বর কনেকে সাজানোর সময় কপাল থেকে ভ্রু-গাল পর্যন্ত চন্দন অথবা পাউডারের ফোঁটা দিয়ে সাজানোর রীতি আছে। এগুলো পেলাম কোথায়? লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—

উলুধ্বনি দিতে হলে মাথে পড়ে বাজ।
হাস্য ঠাট্টা করে বলে অসভ্যের কাজ ॥

একথা শুধু আধুনিক নারীসমাজেরই বক্তব্য নয়, উৎস খুঁজে না পাওয়ার ফলে এই ধরণের বহু লোকাচারকে আদিম এবং অসভ্য বলে চিহ্নিত করেছে আধুনিক সভ্যতা, নির্বিচারে বাদ দিয়েছে মানুষ তাদের অনুষ্ঠানাদি থেকে।

প্যাঁচার অন্য নাম উলূক। অভিধান বলছেন, উলু করে যে, সেই উলূক (উল্মুক নয়)। পূর্বোক্ত Encyclopaedia বলছেন যে, প্যাঁচার বাচনভঙ্গীতে ক্রোধ অথবা ভালবাসার ধ্বনি আছে।

On clear, calm late winter and early spring-nights the usual howling, moaning and sometimes melodic sound of courtship call by male, the biological songs to attract the mate— এই ধ্বনিই উলুধ্বনি। এই উলুধ্বনি উপযুক্ত (পূর্ণিমার জো, অমাবস্যার জো) মুহূর্ত, মিলন (বিয়েতে 'জো' যুগ্ম খেলা) ধ্বনি তাই—জো-কার। প্রাচীন প্রায় সব অনুষ্ঠানই ছিল সৃষ্টিধর্মী, তাই জোকার বা উলুধ্বনি। এ ধ্বনি পুরুষ প্যাঁচার সঙ্গিনীকে আহ্বানধ্বনি, মিলনে থেমে যায়।

প্যাঁচার ইংরেজী প্রতিশব্দ owl। এই শব্দটি ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে (com : Tent : O. E. ule, OLG ula) derived from the voice of the bird।[২৩] এই উলুধ্বনি প্রেমিক-প্রেমিকার আহ্বানসঙ্গীত, মিলনসঙ্গীত তাই হিন্দুর উৎসবে ব্যবহৃত।

নারায়ণ বা লক্ষ্মীর পৌরোহিত্য শাসিত পূজা সাত্ত্বিক পূজা। কিন্তু লোকাচারের দিকে তাকালে দেখা যায় লক্ষ্মীকে মাছ ভোগ দেওয়ার রীতি আছে ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন পরিবারে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সোনা বা রূপোর মাছ বেদীতে রাখার বিধি আছে। এই লোকাচারের উৎস যে পেচকের মৎসশিকার ও ভক্ষণ তা না বললেও চলে।

খাদ্য সংগ্রহ, শিকারের প্রথম পর্বে মানবসভ্যতা অন্যান্যদের মত এই প্রাণীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করেছিল। ফলে, তৈরী হয়েছে বিভিন্ন লোক-কাহিনী, লোক-সংস্কার (সবই মানুষের অভিজ্ঞতা এবং তারই সিদ্ধান্তে)। পৌরোহিত্যের অনুশাসনে; দেববাদের এবং সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে নারী যেহেতু সৃষ্টিধারণ এবং পালন করেন, তাই গড়ে উঠলো এথেনা, মিনার্ভা, লক্ষ্মীর তরুণী (প্রজনন ক্ষমা)

মূর্তি, তার পূজাপদ্ধতি। ততদিনে অনেক, অনেক পেছনে ফেলে এসেছে মানুষ বিভিন্নদেশে কেবল-মাত্র-শিকার-কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে। মূল অভিজ্ঞতার পাখি ও তার আচরণ-এর প্রত্যক্ষ এবং চিত্র ম্লান থেকে ম্লানতর হতে হতে মুছে যেতে থাকলো ; এলো পেচক-বাহিনী দেবী, সর্বশেষ স্তরে দেবীরাই প্রধানা হলেন, বাহন থাকতে হয় তাই থাকে—এমনি অবস্থা। গড়ে উঠলো পুরাণ কথা, গল্প, রূপকথা—পেঁচা কেন্দ্রিক। দেবীমাহাত্ম্য যখন গড়ে উঠলো তখন হলো দেব-পুরাণ বা মিথ (মনে রাখা দরকার কাহিনীতে থেকে গেল পাখির আচার-আচরণের কথা। কিন্তু **transformation** এর ফলে তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হলো)। তাই মিথ, অতিলৌকিক, সে কাল্পনিক, সে মিথ্যা। কিন্তু মূলে তো ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা! —যাকে 'মিথ' এর আধুনিক সংজ্ঞায়ও স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মূলে এই কাহিনীতো ছিল শিকার-জীবী মানুষের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়।

॥ ৪ ॥

প্যাঁচার মতই আরও কাহিনী বহু আছে, যাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'মিথ'। এবং সেই সঙ্গে লোকাচার। এখন এমন যে তিনটি মিথ-উৎস নিয়ে আলোচনা করবো তারা হলো গোবর, তুলসী এবং ভক্ষিত-উদ্গীরণ।

প্রথমে গোবর সম্পর্কিত লোকাচারের কিছু উদাহরণ দিয়ে নিই।

একই রান্নাঘরে অন্যান্যদের জন্য আমিষ এবং বিধবাদের জন্য নিরামিষ রান্না করার প্রয়োজন হলে হয় নিরামিষ রান্না আগে শেষ করে তবে আমিষে হাত দেওয়া হয় ; উল্টোটা করতে হলে উনুনের 'ঝিঁক'-এ গোবর নিকিয়ে তবে নিরামিষ রান্না হয়। অর্থাৎ, হিন্দু-চিন্তায় ধরে নেওয়া হয়, গোবরের পবিত্রী-করণের ক্ষমতা আছে।

এই একই দৃষ্টিতে প্রায়শ্চিত্তে পঞ্চগব্যের প্রথমটি গোময়, দ্বিতীয়টি গো-মূত্র। এখানে গোময় সেই একই পবিত্রীকরণ ক্ষমতার অধিকারীরূপে কল্পিত।

একই দৃষ্টিভঙ্গীতে খাওয়ার পর বিশেষ করে হিন্দুরা মেঝে থেকে ভুক্তা-বশিষ্ট তুলে নিয়ে জায়গাটিতে গোবর-জল বুলিয়ে দেন। এছাড়া, বিশেষ বিশেষ উৎসবে, বৃহৎ কর্মোপলক্ষে সমস্ত বাড়ীর মেঝে, উঠোন ইত্যাদিতে গোবর লেপা, অথবা বিশেষ বিশেষ মাসের সংক্রান্তি উপলক্ষে একই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। অশৌচান্তেও গোবরের ব্যবহার হয়।

যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো তাদের বলা যেতে পারে গোবর-কেন্দ্রিক সামাজিক লোকাচার। এগুলো কেন করা হয়? এ প্রশ্নের সম্ভবত, একটাই উত্তর; আর তা হলো, গোবরের স্বাস্থ্যবিধি সম্মত ক্ষমতা আছে বলে, রোগজীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতায়, লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হোত তখন, যখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে খাদ্য-উৎসর্গের সংস্পর্শ-অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য সামাজিক লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

অশুচিবোধের মানসিক-ব্যাধি যে মানুষকে কোন হীন মানসিকতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তার একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক সামাজিক নীতির এই সে-দিনের ইতিহাস এখানে তুলে ধরছি।—

আমাদের খুব ছোটবেলায় দেখেছি, লক্ষ্মীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা অথবা বিবাহ-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে ঢাকী বা ঢুলিরা সদলে বাড়িতে আসতেন, দুই বা তিনদিন থাকতেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেদের বলা হতো ঋষি (কেন? তা গবেষণা-সাপেক্ষ)। এরা সামাজিক দিক থেকে অচ্ছুৎ বলেই পরিচিত। উঠোনে বসে আমাদের বাড়ীর বাসনে এদের খাওয়ার কথা ঠাকুরমা, জ্যাঠাইমারা ভাব-তেই পারতেন না। এদের ভাত তরকারী ঢেলে দেওয়া হতো তাদেরই কাপড় অথবা কাপড়ের আঁচলে বিছিয়ে রাখা কলাপাতার উপর স্পর্শ বাঁচিয়ে। বাড়ির বাইরে বা কোন এক কোণে বসে তাঁরা খেতেন এবং খাওয়ার পর যেখানে বসে খেয়েছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে নিয়েছেন, তা তাদেরই গোবর নিকিয়ে নিতে হতো। এই ঘৃণ্য সামাজিক লোকাচার তখন ছিল বহুব্যাপক।

এরপর আসে ধর্মীয় লোকাচারের কথা।

আভ্যুদায়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ যেখানে হয় তার সামনের দেওয়ালে ঘুঁটের পিঠের আকৃতি-বিশিষ্ট্য বস্তুর উপর পঞ্চাঙ্গুলিক চিহ্নিত করে তলায় পাঁচটি সিঁদুর অথবা ঘিয়ের ফোঁটা বা ধারা দেওয়ার রীতি আছে উত্তর ভারতের (দক্ষিণে এ রীতি আছে কিনা খেয়াল করেও দেখতে পাইনি) প্রায় সমস্ত অঞ্চলে।[২১] গোব-রের উপর থাকে চিৎ করে আটকে রাখা পাঁচটি কড়ি।

প্রথম ঋতুমতী কন্যাকে ঋতুদর্শনের পঞ্চমদিনে কৃতস্নানা করে গোময়,-মূত্র পান করানোর রীতি আছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে।

গর্ভিনী নারীকে বিভিন্ন শাখায় বৈদিকমন্ত্র শোধিত পঞ্চগব্য (গোময়, গো-মূত্র, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত) খাওয়ানোর লোকাচার এখনও বর্তমান। মজার

ব্যাপার হলো, গো-মূত্র শোধনের ক্ষেত্রে যে মন্ত্র তিন শাখাতেই উচ্চারিত হয় তা হলো—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ এই গায়ত্রীমন্ত্র।

প্রথম প্রশ্ন—গায়ত্রী কে? তার স্বরূপ কি? গো-মূত্র শোধনে তা ব্যবহৃত হবে কেন? গায়ত্রী সূর্যশক্তি, সূর্যকুমারী। গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা জপের তিনটি মন্ত্র আছে। প্রাতর্গায়ত্রী জপের মন্ত্রে তাকে বলা হয়েছে— সূর্যমণ্ডলস্থিতা, ঋগ্‌বেদ-উদ্ভূতা, ব্রহ্মস্বরূপিনী, কুশধারিণী কুমারী। মধ্যাহ্ন ধ্যানে গায়ত্রী যজুর্বেদোদ্ভূতা, সূর্যমণ্ডল-গতা, পীতাম্বরধারিনী, গরুড়াসনা, যুবতী বৈষ্ণবী। সায়ং সন্ধ্যা মন্ত্রে—শিবশক্তি, বৃদ্ধা বৃষারূঢ়া, সামবেদোদ্ভূতা, সূর্যমণ্ডলগতা। গায়ত্রী তাহলে সূর্যবন্দনা নয়; এটি নারীশক্তির বন্দনা; এবং সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে গো-মূত্র-শোধন মন্ত্রে। অর্থাৎ, গো-মূত্র সৃষ্টিশক্তিময় (মন্ত্রপূত) করে খাওয়ানো অর্থ, প্রাচীনতর চিন্তার কোথাও এই ক্ষমতা মানুষ দেখেছিল। তা-ই বৈদিক আর্যরা গ্রহণ করে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করেছে। মূলে যা ছিল গো-ময়, গো-মূত্র-কেন্দ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, তা-ই পৌরোহিত্যের শাস্ত্রানুশাসনে সূর্যকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণায় রূপান্তরিত হলো, তখন মূলের রূপ ও স্বরূপ হলো পরিবর্তিত। গড়ে উঠলো লোকাচার-ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক myth। গায়ত্রীকে পরবর্তীকালে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভূষিত করা হয়, বর্তমানক্ষেত্রে প্রয়োগেব মধ্যে তার মিল খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অন্যদিকে পঞ্চগব্যের গোময় শোধনের মন্ত্রটি এই রকম।—

গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।[২২]

এই মন্ত্রটিও কিন্তু মিলন চিন্তা প্রসূত। আর "মিথঃ" শব্দটি সেই পারস্পরিক অর্থকেই প্রকাশ করছে।

লোকাচারে (ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে) কোন দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত, অন্যায়-কারীর, মৃত্যুপথযাত্রীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, তাতেও পঞ্চগব্যই ব্যবহৃতব্য।

এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, হিন্দুর চিন্তায় মৃত্যুজীবনের ছেদ নয়; বরং পরলোকে নবজীবনের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া। সেই লোক অমৃত-লোক; অর্থাৎ, অনন্তজীবনলোক

গো-পুরীষের এবংবিধ ব্যবহার ছাড়াও অন্যতর রূপ আছে; তারা মোটামুটি এই রকম।—

* অলক্ষ্মীপূজায় দেবীর গোময় মূর্তিগঠনের উল্লেখ আছে।

* মেদিনীপুরের কাঁথি-অঞ্চলে মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় "খোলাপূজা"। এই অনুষ্ঠানে একটি গোবরের 'বাসুয়া' বা বৃষভ ব্যবহার করা হয়।[২৩]

* রাঢ়বাংলা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মকর সংক্রান্তিতে দুর্গোৎসবের মতই প্রাণ-চঞ্চল টুসু[২৪] উৎসব। টুসুতে আধুনিক কালে মৃন্ময়ী কুমারী মূর্তি থাকলেও "পুরুলিয়ার গ্রামে এখনও কোন কোন বাড়িতে তুলসীতলায় মাটি কেটে গর্তকরে তুষু পূজা" হয়।

* টুসুতে গোবরের নাড়ুর ব্যবহার সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কালের সকলেই বলেছেন।

* পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন মৃৎপ্রতিমা গড়া হয়। কুমারী মৃত্তিকা (মাটি না পোড়ালেই কুমারী থাকে) এই মূর্তিগঠনে গোবর অপরিহার্য উপাদান।

এ ব্যাপারে আর তথ্য ভারাক্রান্ত না করে বলি, এ দেশের লোকাচারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোবরের যে ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল, বর্তমান সমাজ-পরিস্থিতির বিচারে, তার কোন দিককে কেউ বলবেন স্বাস্থ্যবিধি, অনেকে বলেছেন (বিশেষ করে টুসু-প্রসঙ্গে,) কৃষিচিন্তা। কিন্তু কোথাও এর কৃষিচিন্তা আছে কি? টুসুতেও যে নেই, সে কথা বলবার চেষ্টা করেছি টুসুব্রতের উৎসচিন্তা-প্রবন্ধে। স্বাস্থ্যসম্মত কোন উপাদান এর আছে কিনা সেকথা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, বলবেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। কিন্তু গোবরের উল্লিখিত তথ্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই, এই বস্তুটি যে প্রাণ-উজ্জীবনের উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের উল্লিখিত উতঙ্ক-Myth-এও সেই একই চিন্তার প্রকাশ। গোময় ভক্ষণে যে প্রাণশক্তির লাভ ঘটবে, তাতে কুণ্ডল পাওয়া সহজ।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেমন করে গোবর এমন বহুব্যাপক ভূমিকা লাভ করলো?— এই প্রসঙ্গে পাঠককে আমার 'টুসুব্রতের উৎসচিন্তা' প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছি। সেখানে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি যে, ভারতীয় সভ্যতার মহেঞ্জদরো-যুগের সমসাময়িক বা তার আগেকার মিশরীয় সভ্যতায় গোবরকেন্দ্রিক দেববাদের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাতেই গোময়কে প্রজননভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুবরেপোকা-দেবতা খেপ্রি বাখেপেরার জন্ম গোবর থেকে। সেই গুবরে পোকা-দেববাদের চিন্তা মধ্যপ্রাচ্য

থেকে আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা বাহিত হয়ে ভারতীয় জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহুদিন আগে। সেখানে সভ্যতাবিকাশের প্রথম স্তরের আহার্য সংগ্রাহক মানুষ গুবরে পোকাকে খাদ্যতালিকাভুক্ত করেছে (এমন কোন প্রাণীর নাম বলা মুস্কিল, যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে মানুষের খাদ্য তালিকাভুক্ত না হয়েছে)। গুবরে পোকার জন্ম এবং 'লার্ভা'র খাদ্য তথা প্রাণ-উজ্জীবনের শক্তি সংগৃহীত হয়েছে গো-ময়, গো-মূত্র থেকে। সে যখন দেবতা হল তখন তার খাদ্য ও প্রজনন ভূমি মানুষের খাদ্য-পানীয় তালিকাভুক্ত হলো; এতে দেবতার মত দৈবশক্তি লাভ করা যায়, পৌরোহিত্যের এই অনুশাসনে জন্ম হলো গোময়, গোমূত্র ভক্ষণ পানের লোকাচার। ক্রিয়াকাণ্ডগুলি শ্রদ্ধেয় তথা পবিত্র দেবতার তাই পবিত্রী-করণের ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার (এর অন্যতম কারণ, মানুষ এই উৎস-অতীতকে অনেক, অনেক পেছনে ফেলে এসেছে)। মূল খুঁজে পাইনা বলে গোবর সংক্রান্ত লোকাচার কুসংস্কার. গঠিত মিথ fictitious।

আজকের সভ্যতাগর্বী খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কিত সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সেই সুদূর অতীতের মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারার প্রণালীকে বিচার বিশ্লেষণ করলে বারে বারেই ভুল হবে। সত্যের সন্ধান সহজ হবে না।

আবার বলি, স্তূপাকৃতি গোবর থেকে গুবরে পোকা বেছে বার করা আদিম মানুষের খাদ্যসংগ্রহমূলক অর্থনীতিভিত্তিক লোকাচার। গোবর মানুষের খাদ্য দিতে পারে, তাই এর গুরুত্ব তার কাছে অপরিসীম। অন্যদিকে গুবরে পোকারূপী খেপ্রি-দেবতা যদি গোময়ের রস, গোমূত্র পান করে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন তবে মানুষেরও সেই পর্যায়ে উঠতে হলে দেবভোগ্য পানীয় গ্রহণই একমাত্র পথ, পৌরোহিত্যের এই অনুশাসন যেমন প্রাচীন যুগে কাজ করেছে, ঠিক তেমনি করেছে myth-সৃষ্টির যুগেও।—উতঙ্ক দেবাদেশে গোময়-মূত্র গ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু যখন সে শুনলো, তার গুরুও এই কাজ করেছে, তখন আর তার দ্বিধা বা সংকোচ রইল না। মানুষের এই দুর্বলতার দুর্যোগে আমাদের লোকাচার, গল্প বা দেব—, ধর্মপুরাণে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার মূল আবিষ্কারও অতি-বিবর্তনের ফলে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

যুগ যুগ ধরে এই "মিথঃ"-কৌশল, "মিথঃ"-লোকাচার এবং মিথঃ-গল্প অথবা myth সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। এই সহজ সত্যকে মনে রাখলে অনেক জটিল চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এই দৃষ্টিতে এদেশের গোবর সম্পর্কিত myth বা লোকাচারের উৎস খুঁজে পাওয়ার অসুবিধে হয় না।

॥ ৫ ॥

ছোটবেলায় কুল, কামরাঙা, আম অথবা কাঠবাদামের লোভে বনে-বাদাড়ে বা জঙ্গলে,— কোথায় না ঘুরে বেড়িয়েছি। আর যে সব জায়গায়, আস্তাকুড় বলে বড়রা কেউ যাবে না, বালক-বালিকাদের সেটা অবাধগতির স্থান। বড়, বিশেষ করে অতিলোভী বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের হাত এড়িয়ে এমনতর জায়গাতেই পড়ে থাকার সম্ভাবনা বেশী। সেই জায়গা থেকে ফল কুড়িয়ে (প্রায়শই মুখে পুরে) যেমন না বেরিয়েছি অমনি সামনে পড়ে গেলাম সোনা জ্যাঠাইমা অথবা বট্‌ঠাকুরমার ; আর রক্ষে নেই। গরমকাল হলে গায়ের জামাকাপড় সমেত স্নান (ভাল করে ডুব দিয়ে, কাপড় জামার কোন অংশ শুকনো থেকে গেলে আবার ডুবতে এবং ডোবাতে হতো) করিয়ে তবে ছাড়তেন। শীতের দিন হলে দণ্ড একটু লঘু হতো (প্রথম কারণ আর বাড়িতে পরার গরম জামাকাপড নেই ; দ্বিতীয়ত, অসুখে পড়লে আমাদের সঙ্গে ওঁদেরও ভোগাতাম)। সে ক্ষেত্রে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে তাড়া করে করে তিনসন্ধ্যা (তৃতীয়—১ম প্রাতঃ সন্ধ্যা, ২য় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ৩য় সায়ং সন্ধ্যা) বেলায় এনে ফাঁসির আসামীর মত দাঁড় করাতেন তুলসীমঞ্চের কাছে। একটা বাটিতে অথবা ঘটিতে জল নিয়ে আসতেন ; প্রণাম করতেন তুলসীদেবীকে ; ঝাঁকুনি দিতেন গাছের গোড়া ধরে (সূর্যডোবার পর তুলসীপাতা ছিঁড়তে নেই—লোকসংস্কার)। দু'টি একটি আধ শুকনো যে পাতা পড়তো, তাই জলে ডুবিয়ে ছড়িয়ে দিতেন আপাদমস্তক। কাপড় জামাগুলোতে যাতে বেশী ছড়িয়ে তুলসী জল পড়ে সেদিকে শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন। বেশী করে দিতেন চুলে, মাথায়। তুলসী-কেন্দ্রিক এই ধরণের ধর্মীয় সংস্কারগত লোকাচারের চিত্র বাংলার সর্বত্রই হয়তো দেখা যাবে। —প্রতিটি হিন্দুর বাড়িতেই প্রায়, তুলসীমঞ্চ থাকে। সন্ধ্যাবেলায় গলবস্ত্র, ধূপদীপ হাতে নারী-সমাজকে দেখা যাবে এর মূলে প্রণাম করতে। অথবা কার্তিকের পয়লা তারিখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিসন্ধ্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এর মঞ্চের উপরে জ্বলতে থাকবে আকাশ প্রদীপ।

আমার অতিবাল্যে দেখেছি মানুষকে ঘরের মধ্যে মরতে দিলে পাছে ঘর অশুচি হয়, দেহত্যাগের পর পুরোনো আবাসস্থানের মায়ায় ঘর, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গবঞ্চনার আশংকায় গৃহত্যাগ না করে (এই চিন্তার সুন্দর ব্যঙ্গচিত্র আছে রবীন্দ্র-

নাথের জীবিত ও মৃতগল্পে-কাদম্বিনীকে কেন্দ্র করে), এই ভয়ে অতিবড় নিকট আত্মীয়রাও বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে হতভাগ্য মুমূর্ষকে টেনে বার করে তুলসীতলায় শুইয়ে দিত (অন্তর্জলির বীভৎস চিত্র তো সমাজইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে!) উন্নততর চিকিৎসার পরিবর্তে (এমনি এক করুণবেদনাবিধুর চিত্র অঙ্কিত আছে আমার একটি চার বছরের ফুটফুটে ভাইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। প্রায় এক বৎসরের উপর রোগশয্যায় শুয়ে থাকা শিশুকে যখন ঘর থেকে বের করা হলো তখনকার আমার মা-বাবার বুকফাটা চিৎকার কিন্তু ধর্মধ্বজীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কঠোর কর্তব্যবোধ থেকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি, যেমন ঘটেনি কর্তব্যচ্যুতি রবীন্দ্রনাথের পলাতকা কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্কৃতি'র নায়িকা মঞ্জুলিকার বাপের অন্য ধরনের সামাজিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে। আজও যখন দুপুরের রোদে প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকা আমার ভাই সেই শিশুর করুণ চাহনির [তার জ্ঞান ছিল] কথা মনে পড়ে তখন অস্থির হয়ে উঠি আমি)।

মরে গেলে চোখের পাতাদুটি বুজিয়ে তার উপর রাখা হয় সচন্দন অথবা এমনি তুলসীপাতা। মৃতের মাথার বালিশের তলায় তুলসী গাছ রেখে দেওয়া হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য আজও। দাহ শেষ হয়ে গেলে সেই চারাটি শ্মশানের মাটিতে রোপন বিধেয়। হিন্দুর শব পোড়ানো হয়, তাই শ্মশান বললে বুঝি শবদেহ দাহনের স্থান। কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (শবাঃ শেরতে ইতি) শবশয়ন স্থান। যেখানে শবদেহকে শুইয়ে রাখা হয়। প্রাচীন পারস্য অথবা মিশরে এমনি শবশয়ন স্থানে তুলসীরোপনের বিধি ছিল।[২৫] বাবুই তুলসী—"এই গাছ বঙ্গদেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে"(ন)[২৬]

ধর্মীয় লোকাচারে হিন্দুর প্রতিটি পূজায় তুলসীর ব্যবহার আবশ্যিক। আজ কাল মূলত গতানুগতিকভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ফুল বেলপাতার সঙ্গে তুলসীও বিক্রি হয়। পাতা নয়, শেকড় বাদ দিয়ে পুরো গাছটাকেই দুমড়ে মুচড়ে আনেন বিক্রেতারা। কিন্তু এটা করার উপায় নেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে। পুরোহিতদর্পণ, ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, বিশেষ করে নিত্য কর্মকৌমুদীতে তুলসীচয়নের বিস্তৃত বিধিনিষেধ আছে। একটি একটি করে সবৃন্ত/স-মঞ্জরী তুলসী পত্র চয়নই বিধেয়। ডাল কোনমতেই ভাঙ্গা চলবে না। তাহলে যে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া হয়!

পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্নাশাখা যদাভবেৎ।
তদাহৃদি ব্যথাবিযোদ্দীয়তে তুলসীপতেঃ॥[২৭]

আমাদের দেশে যেমন স-মঞ্জরী তুলসীবৃন্ত চয়নের বিধি আছে পূজা সম্পর্কিত লোকাচারে, ঠিক তেমনি ধারণাই দেখা যায় মোল্ডাভিয়াতে। সেখানে ভবঘুরে তরুণের হাতে মন্ত্রপূত তুলসীমঞ্জরী তুলে দিলে তার বাউণ্ডুলে জীবনের অবসান ঘটবে বলে লোকাচারগত বিশ্বাস।

এ দেশে তুলসী অতি পবিত্র। শুদ্ধাচারী না হয়ে তুলসী-চয়ন করতে নেই।—এটাই লোকাচার। অন্যদিকে প্রাচীন গ্রীক অথবা রোমীয়রা, গালি না দিলে তুলসীগাছ বড় হয় না,—এই বিশ্বাসে পুঁতবার সময় তুলসীগাছকে গালি দিত ; এই লোকাচার তাদের ছিল।[২৮]

তুলসী সম্ভবত প্রাচীন গ্রীসে রাজকীয় উৎসবে ব্যবহৃত হতো। এখানেই শেষ নয় , আমাদের দেশে যেমন বিবাহ—প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পান, সুপুরি, তেলসিঁদুর দিয়ে সামাজিক নিমন্ত্রণের লোকাচার বিধি আছে, তেমনি গ্রীকবিবাহে "Sweet basil is represented by the bride's father to the father, or nearest relative of the bride-groom, on a plate, with these words thrice repeated "Accept the betrothel of my daughter to your son," and a similar ceremony is performed on behalf of the bride-groom, in acceptance with custom in ancient Greece.[২৯]

এগুলি সবই লোকাচারের অন্তর্গত। সেই লোকাচার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পেঁীছেছে যে, এদেশে নতুন পুকুর কাটলে সেখানে তুলসীর বিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। এখানেই শেষ নয়, —ভাদ্র মাসে তুলসীব্রত পালনের বিধান আছে ধর্মীয় সংস্কারে। ঐ ব্রতের কথায় ভবিষ্যৎপুরাণের উল্লেখ করে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশ্নোত্তরে দ্রৌপদীর কাছে তুলসী মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ব্রত কথায় বলা হয়েছে, যেখানেই তুলসীগাছ আছে, সেখানেই অন্যান্য দেবতাসহ জনার্দনের অবস্থান। তুলসীদর্শনে, স্পর্শনে অথবা ভক্ষণে স্বর্গলাভ হয়।

ব্রতের অধিকার নারীসমাজের। তুলসীব্রতও স্বভাবতই তাঁদেরই করণীয়। কিন্তু কেন তাঁরা এইব্রত করবেন ? সংকল্পমন্ত্রে বলা হয়েছে—'ধনধান্য,ধর্মবৃদ্ধি, সৌভাগ্য-

-সন্ততি, অকালমৃত্যু নিবারণ—বিষ্ণুলোকগমন—কাম্য” এই ব্রত করবো ; ব্রতিনীর এই কামনা।

তারই কাছে সেই জিনিস আমরা চাই, যার যে জিনিস দেবার ক্ষমতা আছে বলে আমরা মনে করি। দেবতার কাছে প্রার্থনার ক্ষেত্রেও তা-ই বক্তব্য। তুলসীব্রতের শেষ কামনা বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি। উপায় তুলসীব্রত। তুলসীর সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক কী ?—

“ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে, আদিতে তুলসী শ্রীরাধারসহচরী। কৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীর অন্তরঙ্গতা ধরা পড়লে রাধিকার অভিশাপে একই নামে তুলসী ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এবং শঙ্খচূড়ের স্ত্রী-অবস্থায় নারায়ণ এর সতীত্বনাশ করেন, শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে। পরে নারায়ণের বরে তুলসী তাঁর প্রিয়া হয়ে নারায়ণের সান্নিধ্য লাভ করে। পদ্মপুরাণেও বিষ্ণুকর্তৃক জলন্ধরপত্নী বৃন্দা-নাম্নী তুলসীর সতীত্বনাশের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে।”[৩০] অন্যদিকে হিন্দু পূজারীতিতে স-শ্বেতচন্দন তুলসীপত্র নারায়ণ বক্ষে ধারণ করেন।

তুলসী কাহিনী যখন নারায়ণ বা বিষ্ণুর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন সে দেবপুরাণ বা Myth-এর পর্যায়ভুক্ত নিঃসন্দেহে। কিন্তু বিষ্ণু-তুলসীর মূল কাহিনী সতীত্বনাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একে legend-পর্যায়ে ফেলা যাবে না ; কারণ প্রথমত এটি দেবতার কথা। দ্বিতীয়ত legendary hero-র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য মূলত নারীর প্রতি, তার সম্মান প্রদর্শন। এখানে সেই গুণের সম্পূর্ণ অভাব। ভক্তের দৃষ্টিতে legendary hero-র চেয়ে দেবতা অনেক উঁচুতে। তবু, আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, চরিত্রের এই জাতীয় দুর্বল দিকগুলো প্রায় সবদেশের Myth বা দেবপুরাণে অত্যন্ত স্পষ্টকরে দেখানো হয়েছে। এর প্রধান কারণ, আজ ভক্তির আলোকে কাহিনীগুলোকে দেখলেও মূলে এগুলো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন-অভিজ্ঞতার “মিথঃ”-কথা। দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, আজ মানবায়িত মূর্তিতে কল্পনা করলেও মূলে দেবকুল সবদেশেই পশু বা মানবেতর প্রাণী। তৃতীয়ত, মানুষও তখন সেই স্তরে জৈব-জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। আজ যাকে অতিসঙ্গত ভাবেই সতীত্বনাশ বলছি, সভ্যতাবিকাশের সেই যুগে সে ধারণাই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই “মিথঃ”-কথায় তাকে স্থান দিয়েছে। তাছাড়া পরনারীহরণ, বলপূর্বক ধর্ষণ—

এই ঘটনাগুলো বর্তমান মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় তদানীন্তন সমাজ-জীবনে প্রায়শই ঘটতো। myth-এর সংকলকেরাও অনায়াসে দেব—, ধর্ম—, ইতিহাস— পুরাণে স্থান দিয়েছেন। আর, এ চিত্র শুধু এদেশেরই নয় এটা সর্বব্যাপী।

নারী যে বীর্যশুল্কা তার কাহিনী ইলিয়াড ওডেসি রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে অতি বর্তমানের ইতিহাসের পাতায় রাজ-কাহিনীগুলিই প্রমাণ করে। নারীর প্রতি, নারীত্বের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী না বদলালে সভ্যতা কোথায় গিয়ে পৌঁছোবে জানি না।

নারী বীর্যশুল্কা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দেবায়ত প্রকাশই ঘটেছে নারায়ণ-বিষ্ণু-তুলসীর কাহিনীতে। সে যুগের "মিথঃ" কথাই আজকের দেবানুগ্রহ (তুলসীকে বক্ষে ধারণ) রূপে গৃহীত।

মিথঃ-কথায় বিষ্ণু-তুলসী কাহিনী অমার্জিত বা crude। এর অন্যতম প্রধান কারণ ব্যাস-বাল্মিকী-হোমারের নামে এরা বহুদিন আগেই সংকলিত, তাই একটা নির্দিষ্ট রূপ বহুদিন আগেই পেয়ে গেছে বলে মূল কাহিনী- কাঠামো পরিবর্তন সহজ নয়। অন্যদিকে লোককথা বা গল্প বা রূপকথা যেহেতু বিভিন্ন সময়ে ভিন্নতর জনগোষ্ঠীর হাতে পড়ে অথবা একই জনগোষ্ঠীর সমাজ-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ভিন্নতর পরিবেশে পড়ে বেশ পরিবর্তনের সুযোগ পায় (কারণ mythology পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে নি), সংকলিত না হওয়ার ফলে, তাই একই বিষয়ে ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায় অনেক সময় (তুলসী কাহিনীকে কেন্দ্র করে ইউরোপে তাই ঘটেছে।

বোকাসিও-র ডেকামেরণে (IV/5) এবং কীট্‌স্‌-এর একটি কবিতায় তুলসী (সতীত্বনাশ নয়) প্রেমগুল্মরূপে চিত্রিত হয়েছে। উভয়েরই নাম Issabela or Pot of Basil। গল্প বা কবিতাটির বিষয়বস্তু এইরকম।—

ফ্লোরেন্সের তরুণী ইসালো। তার ভাইয়েরা আবিষ্কার করলো যে সে লরেঞ্জো নামে এক তরুণকে ভালবাসে। একদিন তারা লরেঞ্জোকে ভুলিয়ে বনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। দেহটি মাটিতে পুঁতে রাখলো। ইসাবেলা খুঁজে বার করলো দেহটি। মাথাটি এনে রাখলো একটি টবে; তার উপর পুঁতে দিল তুলসীর একটি চারা।

অতিযত্নে সে গাছটিকে লালন পালন করে আর তার পাশে বসে নীরবে

চোখের জল ঝরায়। ভাইদের সন্দেহ হলো, তারা টবটি চুরি করে নিয়ে দেখলো —কৃতকর্ম ধরা পড়েছে। পালালো তারা। আর এদিকে শোকার্তা ইসাবেলা ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

ধরে নেওয়া যেতে পারে,—এককালে এটি ছিল প্রাক্-খ্রীষ্টযুগের মিথঃ-কথা ; রূপ হয়তো ছিল বিষ্ণু-তুলসীর মতই। কিন্তু বোক্কাসিও বা কীটস্ যখন গল্পে-কবিতায় লোক-কাহিনী বা মিথঃ-কথাকে ধরতে গেলেন তখন ইউরোপের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তুলসী-কেন্দ্রিক ইউরোপীয় লোকাচার মূলত অন্তর্হিত , তাই **Issabela** বা **The Pot of Basil** সুদূর অতীতের সাক্ষ্যবহন করে মিথঃ-কথার কাব্যরূপ নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

অন্যদিকে ভারত এখনও প্রাচীন লোকাচার এবং ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। তাই **The Pot of Basil** আজও গলবস্ত্রকুলনারীর প্রণাম পায়। ব্রহ্মবৈবর্ত অথবা পদ্মপুরাণ এখনও ভক্তের মনে আনে বিষ্ণুমহিমার কথা (ভক্তি সমাজসংস্কৃতি-অর্থনীতির দৃষ্টিতে এগুলোর বিচার করে না)। বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির আশায় আজও ভাদ্রে তুলসীব্রত উদ্‌যাপন করেন ব্রতিনীরা।

myth মিথ্যা, অতিলৌকিক। কিন্তু কোন্ কল্পনার জগৎ থেকে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ বা ভারত তুলসীকে সংগ্রহ করলো, আর তাকে নিয়ে গড়ে তুললো **mythology**, লোকাচার, গল্প আর কবিতা ?

আর কিছু না-ই হোক তুলসীনামীয় একটি গুল্ম আছে, তার পাতা, মঞ্জরী হয়,—এটাতো কল্পনা নয় ? এতো বাস্তব সত্য! তাকেই কেন্দ্র করে সতীত্বনাশ, প্রেম, বিবাহ, মৃত্যু, শুচিতাবোধকেন্দ্রিক লোকাচার। আগেই বলেছি, প্রার্থী অর্থী হয় তারই কাছে, দেবার ক্ষমতা যার আছে। সতীত্বনাশ করার মত শক্তি-সামর্থ্য, বিবাহে সন্তান-উৎপাদন (পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা)—এসব ক্ষমতা দানের ক্ষমতা যদি তুলসীর থাকে, তবে তুলসীকেন্দ্রিক মিথ মিথ্যা নয়, সে অতিলৌকিক নয়, সে কল্পনাপ্রসূত নয় ; সে লৌকিক এবং অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য।

অরণ্যচারী মানুষের যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে, ঠিক তেমনি নিবিড় পরিচয় ছিল বৃক্ষলতা-গুল্ম— এদের সঙ্গেও! জীবনের তাগিদে, বেঁচে সুস্থভাবে থাকার তাড়নায় **trial and error** পদ্ধতির সাহায্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বৃক্ষজগতের সঙ্গে তার পরিচয়। আর এই পরিচয়ের সূত্র

ধরেই গড়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইউনানী, ভারতে আয়ুর্বেদ এবং অন্যত্র অনুধরণের চিকিৎসাপদ্ধতি। কোন গাছই যে মানুষের চিকিৎসায় অপ্রয়োজনীয় নয় এটা মানুষ জেনেছিল খৃষ্টজন্মের বহু আগেই।—

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শৈল্যকর্তা জীবক ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম প্রিয় উপাসক ও চিকিৎসক। এঁর শিক্ষা তক্ষশিলার এক আচার্যের কাছে। এঁর শিক্ষা-সমাপ্তির ঘটনাটিই আমার পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের সাক্ষ্যবহ। একদিন জীবক আচার্যকে, সাতবৎসরে সমস্ত বিদ্যা অধিগত করে, জিজ্ঞাসা করলেন যে আর কতদিন তাঁকে পাঠগ্রহণ করতে হবে। আচার্য বললেন, "তোমায় চারিদিন সময় দিতেছি। তুমি এই নগরের চতুর্দিকে দুই যোজনের-মধ্যে যত তরুলতা, ফলমূল ইত্যাদি দেখিতে পাও, সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আসিয়া আমায় বল, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোনটি ভৈষজরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।" জীবক…চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, ঔষধে না লাগে এমন কোন উদ্ভিদই দেখিতে পাইলাম না; জগতে কুত্রাপি এরূপ উদ্ভিদ পাওয়া যাইবে না।" ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন, "বৎস, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে ; ..।"[৩১]

এই উক্তি কেবল জীবকেরই নয়; এ বক্তব্য সমগ্র মানব সভ্যতার। এই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে মানুষ যখন তুলসীকে দেখলো তখন সে আবিষ্কার করলো যে এই গুল্ম উষ্ণবীর্য, সুগন্ধি, ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রযন্ত্র ও জন্ম-যন্ত্রের রোগ নিবারক। তুলসীপাতার ক্বাথ এলাচগুড়া এবং একতোলা পরিমাণ সালেম মিছরি পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়। ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সেবন করিলে ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আরাম হয়। রামতুলসীর কৃষ্ণ বর্ণটি শিবপূজায় ব্যবহৃত (কেন, তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য)। এই পাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গণোরিয়া রোগে বড় উপকার হয়। পাতার ক্বাথ ধ্বজভঙ্গে বড় উপকারী। বাবুই তুলসীর বীজের রস গণোরিয়ায় হিতকর, মূত্রকর। ইহার বীজ ফলের সহিত সেবন করিলে প্রসবান্তিক বেদনা আরাম হয়। রক্তমূত্রন, শুক্রমেহে উপকারী।[৩২]

শুশ্রুতের দৃষ্টিতে, হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত, কর্পূর তুলসীর বৃষ্য (শুক্রবৃদ্ধিকর)[৩৩] ও বাজীকর (যাহা অবাজীকে বাজী করে অর্থাৎ সুরত অসমর্থকে সমর্থ করে) শুক্রবৃদ্ধিকর, বীর্যজনক, কামবর্দ্ধক [দ্রব্য][৩৪] গুণ আছে। তুলসীর বীজ জলে ভেজালে পিচ্ছিল হয়, এই জলে চিনি মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবঘটিত পীড়ায়

উপকার হয়। ইউনানী চিকিৎসায় লেখা আছে হৃদরোগে উপকার হয়।[৩৫]

ভারতীয় বনৌষধি (খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩৯) আরও বলেছেন : ভূ-তুলসীর বীজই ব্যবহৃতব্য। ইহা গণোরিয়া বাধকরোগে হিতকর। বম্বে দেশে ইহার বীজ সম্ভোগেচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Dymock)। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে উপকারী।

কোন কোন অঞ্চলে রান্নায় ব্যবহৃত হয়। তুলসীর গন্ধ মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষে উপকারী, এটি আনন্দবিধায়ক।[৩৬]

তুলসীর উপরিউক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র-কথিত গুণগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখলে তুলসীকেন্দ্রিক বিভিন্ন দেশের লোকাচার, পূজা-পদ্ধতিতে ব্যবহার, গল্প-কবিতায় তুলসীর প্রসঙ্গকে আর অলৌকিক, কাল্পনিক বা মিথ্যা বলবো না। সুপ্রাচীন জীবনে মানুষের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়ে যে মিথঃ-কথার জন্ম দিয়েছিল, তারই আদিমতম প্রাপ্ত তুলসীকেন্দ্রিক রূপ ব্রহ্মবৈবর্ত বা পদ্মপুরাণে বিধৃত। এরা প্রচলিত অর্থে myth নয়, অর্থাৎ মিথ্যা, কাল্পনিক বা অতিলৌকিক নয় এই জন্য যে নারীধর্ষণ সেযুগে ছিল ; আজও সমাজবিরোধীদের মধ্যে আছে। তফাৎ শুধু এইখানে যে, এ যুগের ধর্ষণের পেছনে আছে কেবল প্রবল-কামচিন্তা, আর সেযুগে ছিল গোষ্ঠীবৃদ্ধির অদম্য তাগিদ। আর সেইজন্যই সতীত্বনাশকে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী মনে করতো না। এযুগে যা নারীর প্রতি পুরুষের সম-মর্যাদাবোধের দৃস্টিতে, মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধ।

মোল্ডাভিয়ায় তরুণের হাতে তুলসীমঞ্জরী তুলে দেওয়া হয়, ভারতে সমঞ্জরী তুলসীচয়ন কেন, তার অর্থ সুস্পষ্ট। আগেই বলেছি, পৃথিবীর প্রায় সবধর্মই মৃত্যুকে অন্যতরলোকে যাত্রার দ্বার মনে করে, তাই পার্থিব মৃত্যু যখন চোখকে বুঁজিয়ে দেয় তখন তার ওপর তুলসীপাতা রাখলে "ইন্দ্রিয়শক্তি ফিরে আসবে—এই বিশ্বাসে কাজ করে। শ্মশানে তুলসীরোপনও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীতে। ইছাবেলা প্রেমিকের মাথা তুলসীটবে রাখে কারণ এটি মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। মস্তিষ্ক উদ্‌জীবিত হয়ে আবার প্রাণ ফিরে আসবে—এই অবৈজ্ঞানিক লোকবিশ্বাস থেকেই উল্লিখিত লোকাচারের জন্ম। আদিম জ্ঞান বিশ্বাসমতে এরা সত্য, কেউ মিথ্যা নয়। আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বাংলার মানুষ যে সংস্কারের জন্ম দিয়েছে তা হলো "কুমারী মেয়েদের তুলসীগাছে জল দিতে নেই, দিলে অকালবৈধব্য ঘটে।[৩৭] তুলসী যে কামোদ্দীপক তা আগেই দেখেছি। অতি

কামুকা নারী অথবা অতি কামুক পুরুষ পারিবারিক জীবনে স্বভাবতই অমঙ্গল ডেকে আনে রোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, যার পরিণতি অকালমৃত্যু। কুলবধূর অকাল বৈধব্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে অনভিপ্রেত।

তুলসী তাই দেবতা হয়েও, কুলনারীর ব্রত-পূজা পাবার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কুমারীর কাছে ভয়ের।

॥ ৬ ॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে মোটামুটিভাবে দেবীমাহাত্ম্য-মূলক বলে mythology পর্যায়ে ফেলা যায়। এর জন্মখণ্ডে যে স্বর্গরাজ্যের অভিশাপের কথা থাকে তাকে সবাই অতিলৌকিকই বলবেন।

এইকাব্যে 'কমলে কামিনী'র যে চিত্র অঙ্কিত আছে ধনপতি-সওদাগর-উপাখ্যান অংশে, তা নিঃসন্দেহে myth-লক্ষণাক্রান্ত। ধনপতি এবং তৎপুত্র শ্রীমন্ত সিংহল যাওয়ার পথে পদ্মস্থিতা দেবীকে দেখেছে একটা হাতিকে গিলতে এবং তারপরই তাকে উগরে ফেলে দিতে।

একটা নারী তথা দেবীর পক্ষে হাতিকে গিলে আবাব উগরে ফেলা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু, যেহেতু এটা দেবী তথা কমলে-কামিনী তথা চণ্ডীর আচরণ, তাই myth।

একই ধরণেব ঘটনাব আংশিক বিকৃতরূপ আমরা লক্ষ্য করি ইল্বল-বাতাপি-অগস্ত্যমুনির মহাভারতীয় কাহিনীতে। ভাই মেষরূপী বাতাপিকে কেটে খাইয়ে ইল্বল অতিথি সৎকার করে। বিশ্রামরত অতিথিব পেট চিরে আবার বেরিয়ে আসে রাক্ষস বাতাপি দাদা ইল্বলের আহ্বানে। অগস্ত্য তাকে হজম কবে legendary hero হয়েছেন।

অন্যদিকে, একই ধরণের খেয়ে ফেলে আবার জীবন্ত উগবে দেবাব ঘটনার উল্লেখ দেখি বিভিন্ন রূপকথার গল্পে।

ঠাকুরমার ঝুলির ৩৮ 'নীলকমল-লালকমল' গল্পে দেখি রাজার রাক্ষসরানী 'আপনার ছেলেকে মুড়্‌মুড়্ করিয়া চিবাইয়া খাইল। রাণীর গলা দিয়া এক লোহার ডেলা গড়াইয়া পড়িল।' তার আগে যখন সতীনপুত্র কুসুমকে খেলো, 'অজিত ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসের মাথায় চড মারিল। রাক্ষস আঁই আঁই করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া এক সোনার ডেলা উগারিয়া পলাইয়া গেল।' লাল আর নীল ডিম ভেঙে বেরিয়ে এলো দুই রাজপুত্র।

ডিমের ভেতর থেকে শাবকের নির্গমন এটা পক্ষী এবং সরীসৃপজগতের স্বাভাবিক ঘটনা ; ভারতীয় myth-এ বিষ্ণুবাহন গরুড়ের জন্ম ডিম থেকে, যদিও মানবীর গর্ভে। গরুর পক্ষি-আকৃতি বিশিষ্টই হলো : কিন্তু অধৈর্যবশত যে ডিম-টিকে বিনতা আগেই ভেঙেছিল সে অসম্পূর্ণ-মনুষ্য (এযুগে দেবতাদের মানুষের আকৃতিতে-কল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে)-দেহধারী সূর্য-সারথি অরুণ। কি রূপ-কথা, কি mythology সর্বত্রই মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটেছে মিথঃ-কথায়, কখনও বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য, কখনও অলৌকিকত্ব আরোপের জন্য।

' ঐ নীলকমল-লালকমল গল্পে লালকমলের রাক্ষস-জন্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য 'বুড়ী 'হোৎ' করিয়া নাকের ভিতর হইতে পাঁচগণ্ডা লোহার কলাই বাহির করিয়া লালু-নাতিকে খাইতে দিল।'

'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পে রাক্ষসরানী মরবার আগে শুনলো, রাজ-পুত্র বলিলেন, 'দে, আমায় কোটালবন্ধু দে, কোটালবন্ধুর ঘোড়া দে ! দে, আমার সওদাগর বন্ধু দে, ঘোড়া দে ! মন্ত্রিবন্ধু, মন্ত্রিবন্ধুর ঘোড়া দে, আমার ঘোড়া দে।'

'রাক্ষসী হোয়াক্ হোয়াক্ করিয়া একে একে সব উগ্‌রিয়া দিল।'

'ডালিমকুমার'-গল্পে পাশাবতী রাজকন্যা এবং তার ছয় বোন পাশাখেলায় হারিয়ে সাত রাজপুত্র এবং তাদের পক্ষীরাজগুলো 'সব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া হালুম হুলুম করিয়া খাইয়া ফেলিল।' (এরা রাক্ষসী তাই কাঁচা খায়, মহাভারতের বাতাপিকে কেটে রান্না করে দেওয়া হয়, যদিও বাতাপি সেখানে মেষরূপী। অন্যদিকে কর্ণপুত্র বৃষকেতুকে ব্রাহ্মণ নরশিশু জেনেই খেতে চান)।

ডালিমকুমার এসে পাশায় হারিয়ে বলেন, 'আমার ঘোড়ার মত ঘোড়া, আমার মত রাজপুত্র দাও।' পাশাবতী এক রাজপুত্র, এক ঘোড়া আনিয়া দিল; রাজপুত্র দেখেন, ভাই ; ভাইদের ঘোড়া ! খেলিতে খেলিতে রাজপুত্র—সাত ভাই, সাত ভাইয়ের ঘোড়া, পাশাবতীর রাজরাজত্ব ঘরপুরী সব জিতলেন।'

এখানেও পাকস্থলী থেকে জীবিত অবস্থায় বার করে দেওয়া।—গল্পটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্য গল্পে রানীরা মৃত্যুকালে স্বরূপ প্রকাশ করে রাক্ষসী হয়। এখানে রাক্ষসী পাশাবতী এবং তার ছয় বোনও— রাজপুত্র 'দেখেন—সাত পাশা-বতী সাত কেঁচো হইয়া মরিয়া রহিয়াছে।' অর্থাৎ, রূপকথায় রাক্ষসী কল্পনা করা হলেও মূলে এরা কেঁচো বা অন্য কোন মানবেতর প্রাণীর বাস্তব মিথঃ-কথা।

আলোচ্য গল্পে সাত পাশাবতীর বক্তব্য : "যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি, আপনার ছয়বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে।" অর্থাৎ বলা যায় পরাজিত-দয়িত-ভক্ষণেও কোন এক যুগের মানুষ অভ্যস্ত ছিল।

পরিচিত জগতে এ ধরণের ঘটনা দেখা প্রায় যায়ই না। কিন্তু এ ধরণের ঘটনা বিরল নয়।—

'নিউগিনির পূবদিকে 'নিউ ব্রিটেন-দ্বীপ। সেখানকার দুটি চিত্র ভাষান্তরিত না করেই তুলে দিচ্ছি :

There is a horrible story of a chief who lived on the shore of Blanche Bay. This man's unfortunate young wife used to cıy and beg to be allowed to return to her own people ; moreover, what was worse in the eyes of her brutal husband, She refused to do any work. This he could not endure, and flying into furious passion, told her that, since she was of no use as a wife, he would make use of her in anothtr way. Seizing a spear, this inhuman monster killed his wife on the spot, cooked her body and called his friends together for a feast. [৩৯] এখানে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ভক্ষণ।

বাধ্য হয়ে নিজের স্বামীকে খাওয়ার চিত্র পাওয়া যায় এইখানেই অন্য এক প্রসঙ্গে (আমাদের দেশে মেয়েরা মেয়েদের গালি দেয়, 'ভাতার-পুতখাকী' বলে। এখন অনুষঙ্গ বদলালেও মূলে মানবসভ্যতায় এ চিত্র ছিল) :

On another occasion a man and his wife were taken by surprise in the bush, and made prisoners. The chief who captured them gave orders for the man to be killed ; and this was done, and the wife became his property forthwith... . at the marriage feast the new wife saw the body of her late husband served up. [৪০]

এই কাহিনী অতিবাস্তব প্রত্যক্ষসত্য যখন মিথঃ-কথায় গৃহীত হবে, তখন সেকি রূপকথার দয়িতা-ভোজী রাক্ষস-রাক্ষসীর রূপ নেবে না ?

এ ঘটনা দুটিই তথাকথিত অ-সভ্য সমাজের, এবং হয়তো বিগত দিনের।

অতি সাম্প্রতিককালেও দয়িতা-হত্যা এবং তার মাংসভক্ষণের ঘটনা ঘটেছে প্যারিসে।—

Paris—A French senator warned the Minister of Justice last week that the public would be outraged if a Japanese student accused of eating the flesh of a girl hé had murdered was not punished with exceptional severity......

Described by his Paris University teachers as of outstanding intelligence, Sagawa confessed to shooting a 25-year-old Dutch student Renee Hartevelt because she refused to have sexual relations with him. He then carved up her body in his Paris apartment, taking 30 colour pictures of the Process, and ate pieces of her flesh.

এই ঘটনাও একদিন মিথঃ-কথায় এসে রূপকথার বিষয়বস্তু হবে হয়তো। কারণ, Myth-ই হোক, আর লোক-কথাই হোক,—এরা মানুষের জীবন-অভিজ্ঞ-তার ফসল।

আলোচ্য দেবপুরাণ, রূপকথা বা সত্য ঘটনাগুলিতে দু'টি দিকের চিত্র দেখি—(ক) দয়িত/দয়িতা-ভক্ষণ। (খ) ভক্ষিত জীবকে জীবন্ত ফিরিয়ে দেওয়া। বাস্তব-চিত্রগুলিতে নরনারী ভক্ষণের মধ্যে স্পষ্টচিত্রটি হচ্ছে—মিলন, অথবা মিলনের ক্ষেত্রে বাধা। আর এই মিলনের ফলশ্রুতি সন্তান। পাশাবতী-ডালিমকুমার গল্পে রাক্ষসী নয়, মৃত্যুর স্বরূপে এটা কেঁচোর গল্প। হয়তো মূলে তা-ও ছিল না। কাহিনী মিথঃ-কথায় বহুদূর সরে এসেছে; যেমন এসেছে কমলে-কামিনী উপা-খ্যানের হস্তী কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বাঙালীর মা' কবিতায়। এখানে হাতী আছে; তার খাওয়ার প্রসঙ্গ অবলুপ্ত।—

'ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তিঘট শূন্যে ধরি,
তব শিরে ঢালিতেছে দেবতার পাদোদক সুধা।'

কমলে-কামিনী বঙ্গজননীতে এবং মূল দেবপুরাণের খাওয়া-উগরে ফেলা হাতি একের বদলে দুই হয়ে জলবর্ষণকারীতে রূপান্তরিত। আর এই মূর্তিই ছাপানো অবস্থায় এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

একথা, বোধ হয়, আজ আর কেউ অস্বীকার করবেন না যে সব স্ত্রী-দেবতাই

মূলে প্রজননের দেবী। দেব-আরাধনার প্রথম যুগে এঁরা দিতেন ভক্তকে পশু-শাবক, মানবসন্তান। পরিবর্তিত অর্থনীতির পরবর্তী যুগে শস্য, অর্থসম্পদ, মামলায় জয়, পরীক্ষায় পাশ—ইত্যাদি সবই দিচ্ছেন বলে ভক্তের বিশ্বাস। মূলে দেব-দেবীরা মানবেতর প্রাণিকুল--সমাজপটভূমি বদলে গেলে ভুলে গেল মানুষ সে কথা ; ভুলে গেল যে এদেরই জৈবিক আচরণ-সমূহই মিথঃ-কথার মধ্য দিয়ে ধরা আছে myth বা দেবপুরাণে, লোককথায়।

আদিম আচার আচরণ, চিন্তা কিন্তু স্বরূপেই থেকে গেল লোকাচারে (একথা আগেই বলার চেষ্টা করেছি গোবর-তুলসীকেন্দ্রিক আলোচনায়)। বুঝতে পারলাম না আমরা লোকাচার লোক-সংস্কারের অর্থ নতুনতর সমাজ পট-ভূমিতে, গতানুগতিকতার ফলে।

অন্যান্য দেবীর মতই কমলে-কামিনীও মূলে উর্বরতার দেবী। myth-এ এসে তিনি হাতি গেলেন, উগরে দেন। তাঁর বাস জলে, পদ্মের উপর (মধ্যপ্রাচ্য বা প্রতীচ্যের এবং তান্ত্রিকচিন্তায় এটি স্ত্রী-অঙ্গের প্রতীক)।

জলচর কোন প্রাণীকে মানুষ পদ্মের উপর থাকতে দেখেছে যাকে নিয়ে কমলে-কামিনীর পরিকল্পনা (আবার বলছি, আদিম দেবদেবী পরিকল্পনা হয়েছিল মানবেতর প্রাণীকে কেন্দ্র করে।)?

ছোটবেলায় মাস্টারমশায় একই শব্দ বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়, এটা বোঝাতে গিয়ে এই ছড়াটি বলেছিলেন—

> হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়।
> হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়॥

এখানে হরি শব্দের পর পর অর্থ জল, পদ্ম, ব্যাঙ, সাপ, ব্যাঙ, জল। অর্থাৎ, জলের উপরে পদ্ম শোভা পাচ্ছে, পদ্মের উপর ব্যাঙ বসে আছে। এমন সময় সাপকে দেখে ব্যাঙ জলে লুকিয়ে পড়লো।

ব্যাঙের খোলা পদ্মের উপর বসে থাকা হয়তো অনেকেই দেখে থাকবেন। আর প্রায় প্রত্যেক দেশেই ব্যাঙ দেবদেবীতে রূপান্তরিত (মধ্যপ্রাচ্যের দেবী হেকেৎ ব্যাঙমুখী, রেডইণ্ডিয়ানদের কুমারী পূজায় ব্যাঙ অর্ঘ্য হয়[৪২] আমাদের দেশেতো মণ্ডূক এবং মাণ্ডূক্য—দুখানি উপনিষদ্-ই তৈরী হয়েছে (যদিও তার বিষয়বস্তু ব্যাঙকেন্দ্রিয় নয়)। সেই দৃষ্টিতে কমলে-কামিনীর আদিরূপ স্ত্রী-ব্যাঙ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হস্তী বা করী শব্দ দুটি অর্থবোধের দিক থেকে অসুবিধা-

—সৃষ্টিকারী, করী বা হস্তী অর্থ 'হাতি'—বিশিষ্টার্থে হস্ত/কর—বিশিষ্ট যে কোন প্রাণীই করী, হস্তী। জলচর দেবায়ত্ত প্রাণীদের মধ্যে হস্ত সম্পন্নদের মধ্যে আছে কুমীর, কচ্ছপ (এরাও বিভিন্ন দেশে দেবায়ত) এবং ব্যাঙ। প্রথম দুটির পদ্মের উপরে বসে থাকা অসম্ভব। তাছাড়া, এরা যা গেলে তা জীবন্ত ফিরিয়ে দিতে পারে না, বা দেয় না। ব্যাঙই পদ্মের উপর মাঝে মাঝে বসে থাকে। আর দেবী প্রজননের। গেলা এবং উগরে দেওয়া এদুটিই মূলে ছিল প্রজননসংক্রান্ত চিন্তাজাত।

আমরা প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত যা জানি (বর্তমান অভিজ্ঞতায়) তা হলো ডিম্বাণু (fertilised egg) জরায়ুতে বাড়ে এবং যোনিপথে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ?' আজকের মানুষ সভ্যতার বেড়াজালে আটকে পড়ে মানবেতর প্রকৃতিজ অন্যান্য প্রাণী থেকে, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর জ্ঞান থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এতো মানুষের আদিম জীবন যাত্রার চিত্র নয়! সেখানকার চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। খাদ্য এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য তাগিদে এরাই ছিল মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। আর যেসব প্রাণী থেকে জৈবিক প্রয়োজন যত বেশি মেটাতে পেরেছে, দেবচিন্তায় তারাই স্থান পেয়েছে তত বেশি। ব্যাঙ এমনি একটি উভচর প্রাণী। আজও বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ সু-খাদ্য। এই খাদ্যাভ্যাস সু-প্রাচীন, —বলা যেতে পারে food-gathering-এর শেষ এবং hunting-এর প্রথম পর্যায় থেকে।

মনে রাখা দরকার, প্রাণিশিকারের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় তাদের মিলন ঋতু। আর 'ডিম-ভরা কই' খেতে হলে জানতে হয় ডিম্বধারণ মাছেরা কখন করে। শুধু সময় নয়, তখনকার আচার-আচরণ সম্বন্ধে সচেতন অভিজ্ঞতা না থাকলে ঈপ্সিত ফললাভ হয় না। এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা শিকারজীবী মানুষের ছিল বলেই মানুষ টিকে আছে, তার সমৃদ্ধি হচ্ছে।

কমলে-কামিনী উর্বরতার দেবী, তিনি গেলেন, উগরে দেন। তিনি জলের উপরিস্থিত-পদ্মালয়া। এই আচরণ ব্যাঙের। ব্যাঙকে নিয়ে দেবসৃষ্টি, রূপকথাসৃষ্টি লোকাচার (মূলত বর্ষণ সংক্রান্ত) সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ ব্যাঙের জীবনযাত্রা-প্রণালীকে, খাদ্য-প্রয়োজনের তাগিদেই, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে, অনুধাবন

করবার চেষ্টা করেছে। আজও অস্ট্রেলিয়াতে এক জাতীয় ব্যাঙ আছে, যারা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে গেলা এবং উগরে দেওয়া প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

'Gastric' frog

Canberra, April 3. Australian scientists have established that Australia has a rare 'Gastrics' frog which gives birth to its young through its mouth. This has been disbelieved overseas for many years beginning in the early 1970s when the British scientific journal, Nature, rejected manuscripts reporting the phenomenon. The scientists now have evidence on film of the frog regurgitations. The female 'Gastic' frog swallows its first fertilized eggs and broods them inside her stomach for eight weeks during which she eats nothing, but the youngs survive on food contained in a yolk sac, the scientists report.[৪৩]

এই বিষয়ের উপরই গত ১০. ৭. ৮১ তারিখে (যতদূর মনে আছে) আকাশবাণীর কোলকাতা-কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণা ঘোষাল বিজ্ঞানবিচিত্রায় বলেন।

অস্ট্রেলিয়ার জনগোষ্ঠীকে বলা হয় প্রটো-অস্ট্রলয়েড; ভারতেরও বিশাল জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ এরাই;—এ মতবাদ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের। আজ কেবল অস্ট্রেলিয়াতেই টিকে থাকলেও এককালে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ জুড়েই হয়তো এই প্রজাতির ব্যাঙ ছিল (ভারতে আজও আছে কিনা—এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক কোন অনুসন্ধান হয়েছে কিনা আমার জানা নেই)। বলা হয় পুরাণের যুগে আর্যেতর সভ্যতার প্রভাব পড়েছে আমাদের দেবকল্পনায়। তা কি এদেশেরই, না প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী তা গবেষণার বিষয়। কমলে-কামিনীকে সেই দৃষ্টিতে দেখলে আর্যেতর সভ্যতার ব্যাঙদেবতার মিথঃ-কথার দেব-পুরাণায়িত দেবী বলা যেতে পারে (তবে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম যুগে জীবন-অভিজ্ঞতা আর্য-আর্যেতর সকলেরই এক। কেবল ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী প্রাণিগোষ্ঠী ও তাদের আচরণ স্বতন্ত্র)।

ক্যানবেরার উল্লিখিত তথ্যে এই ব্যাঙ জলেও বাস করে কিনা বলা নেই। তবে ব্যাঙ যে উভচর প্রাণী একথা সর্বজনবিদিত।

আদিম মানুষেব ব্যাঙকেন্দ্রিক-অভিজ্ঞতা কেমন করে কমলে-কামিনী, ঠাকুরমার ঝুলি জাতীয় রূপকথায়, লোকসংস্কারে স্থান লাভ করে, তা দেখে আবার বলি myth fictitious নয়, supernatural নয়, imaginary নয়। সুপ্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি কালের মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতা-জাত মিথঃ-কথা-বস্তুর ফসল এরা। আর লোকাচারও এই একই চিন্তার অন্তর'রূপ মাত্র।

॥ ৭ ॥

মিথঃ-কথা বা myth এবং লোক-কথার মধ্য দিয়ে যে দেবাশ্রিত প্রাণিগোষ্ঠীকে মানুষ ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, তারা কালের প্রবাহে সমাজ-ভাষা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ফলে আজ বিস্মৃতমূল হয়ে পড়তে বসেছে। —একথা কি আগে থাকতে অনুমান করতে পেবেছিল সেই প্রাচীন যুগের মানুষ? তা যদি না হবে তবে myth বা লোকাচারেই কেবল বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে কেন খেপ্রি-দেবতাকে স-শরীরে ধরে রাখবার চেষ্টা করলো পৌরোহিত্য?—

MUMMY

Bristol, April 8, . The remains of plants, some eighty beetles and other insects and part of a prayer have been found by scientist on a 3,000 year old Egyptian mummy, thought to be that of a high priest called Hr-Set-Ra, was burried near Luxor and has been in Briston (?) musium since 1905.[৪৪]

প্রাচীন সভ্যতায় লোকপুরাণ

ডক্টর দুলাল চৌধুরী

In the beginning was the word.
St. John.

মানব সভ্যতা বস্তুত মানুষের লিপি ও লিখন প্রণালীর আবিষ্কারের এক বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী। স্থূল জৈব বাসনার শিল্পিত অনুরাগ ছন্দিত হয়েছে মানুষের প্রত্নলেখমালায়। গুহাচিত্রে মানুষ ছবি এঁকেছে, ছবিতে গল্প বলেছে। গল্প নিজেকে নিয়ে, আবার নিজের সমাজের পল্লবে-পুষ্পে নিজেকে ছড়িয়ে। মানুষের সভ্যতার অন্তরঙ্গ ইতিহাসই হলো ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের পদ্মসম্ভব জীবনের শতদলে বিকশিত হওয়ার কাহিনী। পৃথিবীলগ্ন মানুষের সব কাহিনীর সূত্রধার হলো মানুষ। দৈব শক্তির কল্পনা মূলতঃ মানুষের ও প্রকৃতির অপরাজেয় মহাশক্তির ঊর্ধায়ণ। কখনও কখনও মানসিক বিকৃতিসমূহ রূপ পেয়েছে অপদেবতায় বা ভূতপ্রেতাদি অশরীরী সত্তাকল্পনায়। মানুষের গল্প বলার ও শোনার স্বভাবের মধ্যেই পুরাণ-বীজ নিহিত রয়েছে। মানুষের সভ্যতা যত প্রাচীন, তার পুরাণও তত পুরানো। পুরাণ মানুষের আত্মসংরক্ষণের ও জৈব প্রতিরোধের যাদুকরী সৃষ্টি।

'পুরাণে'র মূল অর্থ হলো 'প্রাচীনকালে সৃষ্ট'। প্রাচীনকাল কত প্রাচীন, সেকথা কেউ পরিষ্কার করে বলেননি। এক দীর্ঘায়ত কালসীমায় যখন মানুষ পৃথিবীতে কল্পনার রসায়নে কথা বুনতে শিখল তখনই পুরাণের জন্ম বলা যেতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম নিয়ে রচিত, কথিত জনশ্রুতিমূলক আখ্যান পুরাণ বা 'মিথ' নামে প্রচলিত।[১] তবে পুরাণ কখনও ইতিহাসবাচক নয়।[২] বেদের

---

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস / বাঙ্গালা ভাষার অভিধান / ২য় ভাগ.

২. A purely fictitious narrative usually involving supernatural persons, actions, or events and embodying some popular idea concerning natural or historical phenomena

Property distinguished from allegory and from legend (which implies a nucleus of fact) but often used vaguely to include any narrative having fictitious elements.

—The Compact Oxford English Dictionary Vol : I

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে বর্ণিত রাজা ও গণের আখ্যায়িকাই পুরাণবাচক। ব্যসাদি মুনি রচিত যে কাহিনী সমূহ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বিশিষ্ট, কেবলমাত্র সে কাহিনীকেই বলা হত পুরাণ। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে অষ্টাদশ পুরাণ ও বহু সংখ্যক উপপুরাণ রয়েছে। যেমন, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নি, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ইত্যাদি।

'মিথস্' (mythos) শব্দ থেকেই এসেছে 'মিথ্' (myth)। এর অর্থ হলো গল্প, কথা।[১] মিথ্ মূলতঃ লোকাচার সম্পৃক্ত। লোকাচারের শিকড় প্রোথিত রয়েছে মানুষের আদিম লোকবিশ্বাস সমূহের মধ্যে। প্রাকৃশক্তি সঞ্জাত জাগতিক রহস্য ও নৈসর্গিক ক্রিয়াকর্মগুলি মানুষকে চঞ্চল ও ভাবাবিষ্ট করেছিল। ফলে এক একটি রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে রোমান্স-মিশ্রিত আবেগ যুক্ত হয়ে প্রতীকী গল্প জন্ম নিলো। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসে এই কাহিনীগুলির উদ্ভব মানুষের কাছে এখনও রহস্যমণ্ডিত। কারণ যে সামাজিক ও নৈসর্গিক পটভূমিতে এই পুরাণসমূহের উদ্ভব হয়েছিল সেই আদিম তথ্য আমরা সংরক্ষণ করতে পারিনি। একালে মিথের রহস্যভেদ করতে গিয়ে আমাদের সামনে বহুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় পুরাণে 'ইন্দ্র-কাহিনী' ও 'অহল্যা-উদ্ধার' এদের মধ্যে অন্যতম। রূপকের অন্তরালে যে অর্থ নিহিত রয়েছে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারায়, জনমানসের সুগভীর মনস্তত্ত্বের আলোকে আজ আমরা সেই পুরাণ-কথার যথার্থ এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। অথচ এই মিথ্ বা লোকপুরাণের যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা মানব-ইতিহাসে ছিল তাও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ রামের 'অহল্যা-উদ্ধারে'র যে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এটা অনেকেরই ধারণা যে 'রামের জন্মের পূর্বেই' রামায়ণ রচিত হয়েছিল। হয়ত এটা অতিকথন। কিন্তু এও ঠিক যে বাল্মীকি যে

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তা' কোন অখণ্ড রামকাহিনী দেখে নয়, বরং খণ্ড ছিন্ন, অসংখ্য কাহিনীর এক সুডৌল বয়ন করেছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি। বিস্তৃত ভূখণ্ডে অসংখ্য কাহিনী-রেণু ইতস্তত সঞ্চরমান থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বাল্মীকি বা বেদব্যাস তাঁদের অপরিমেয় কবি-প্রতিভার দ্বারা খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। এঁরা ছিলেন শিল্পিত প্রতিভার প্রজাপতি। তাই পুরানো কাহিনীর এক নব রূপদান করতে এঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। হোমারের ইলিয়ড ও ওডেসি প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'[১] রামায়ণের 'অহল্যা-উদ্ধার' প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য বলেছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন: 'যে ভূমি হল চালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া, পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল ও সেই কারণে দক্ষিণা-পথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকা একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।'[২] এরই মধ্যে নিহিত ছিল আদিম কৃষির মুক্তি সংক্রান্ত একটি পুরাণ কাহিনী। অহল্যার ইন্দ্রগমন, ঋষির অভিশাপ, পাষাণরূপ ধারণ ও শাপমুক্তির মধ্যে লোকপুরাণের বহু রেণুর স্তরে স্তরে বিশ্বাসের উপাখ্যান সঞ্চিত রয়েছে। বাল্মীকি বা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনতম উপাখ্যান-রেণু-সমূহের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক মুক্তির কথা খুঁজে পেয়েছেন। অহল্যার নারী-মনের 'নিদ্রাহীন ব্যথা' অথবা 'অনুর্বরা-অভিশাপ' মূলতঃ দুটি স্তরের সমাজ-বাসনা। তৃতীয় স্তরে রামচন্দ্রের কর্ষণ-সম্ভব-উৎপাদিকা শক্তিদ্বারা অহল্যার জাগরণ ভারতীয় সাহিত্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু তা নয় আমাদের সভ্যতার নব ব্যাখ্যা (যা স্বভাবতই যুগের বাসনা) এর মধ্যে প্রতিফলিত। মিথ্

---

১. সাহিত্য / 'সাহিত্যসৃষ্টি' / বিশ্বভারতী / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ইতিহাস / বিশ্বভারতী / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বা লোকপুরাণ পুরানো বটের মত। এর শিকড় ছড়িয়ে থাকে যে কোন জাতির জীবনের সুদূর গভীরে। কালের যাত্রায় তার প্রকাশ ঘটে চিত্রে, শিল্পে, কাব্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে অথবা মহাকাব্যে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকপুরাণের তুলনায় ভারতীয় লোকপুরাণ অনেক পরিমাণে জীবনস্রোতাশ্রয়ী। চলমান জীবনের অনেক প্রেক্ষার পটে মিথ্ বা লোকপুরাণ মিশে রয়েছে। ইউরোপ বা আমেরিকার লোকপুরাণের অধিকাংশই আজ এক দূরাগত স্মৃতিমাত্র। মিথ্ নিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে পরীক্ষা -নিরীক্ষাও সামান্যতম। পুরোহিত শাসিত সমাজের যে বর্ণাশ্রম প্রথা একদা ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল তারই স্তরে স্তরে চুনকাম করা হয়েছে লোকাচার ও মিথ দিয়ে। মিশরে একদা এই লোকপুরাণ ছিল প্রাকৃতিক রহস্যের পুঞ্জীভূত সত্যের প্রতীক। রাজতন্ত্রের যুগে এই লোকপুরাণ রাজকীয় মহিমা প্রকাশের ও প্রচারের কাজে ব্যবহার করলেন পুরোহিত ও রাজতন্ত্র। মধ্যযুগে অবশ্য সেই লোকপুরাণ হয়ে উঠল দার্শনিক আদর্শ ও ভাববাদের দ্যোতক। ভারতবর্ষে এই ঘটনা ঘটেছে। এমনকি প্রশাসনকে জনজীবনে দৃঢ় করবার জন্যও লোক-পুরাণকে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের পুরাণাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যগুলি এবং ব্রতকথার মধ্যেও আদর্শবাদ, ধর্ম ও সামাজিক তৃপ্তির কথা বলা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে পুরোহিত তন্ত্র ভারতে রাজসভার সঙ্গে লোক-পুরাণকে এবং জনগণকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিল। বেদে অবতারদের কোন সূত্র ছিল না। সম্ভবত অবতারবাদ বৈদিক আর্য জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অজানাই ছিল। অথচ মধ্যযুগে এসে তা দেখতে পেলাম। অর্থাৎ অষ্টাদশপুরাণে কূর্ম, বরাহ; বামন ইত্যাদি অবতার আমরা দেখতে পেলাম। এক দেবতাবাদ থেকে বহু-দেবতাবাদে রূপান্তর বা বিবর্তনের সূত্রে শাস্ত্রাকারেরা ব্যাখ্যা দিলেন নবনব দেবতা বা অবতারের। এই ব্যাখ্যাসমূহ কালক্রমে লোকপুরাণ কথাকে অতিক্রম করে শাস্ত্রে পরিণত। শাস্ত্র অনুশাসনে ও সংহিতায়। ফলে মানব জীবনকে নানা আচারে বন্দী করার প্রথম শক্তিশালী হাতিয়ার হলো লোকপুরাণ।

প্রাগ্-আর্য ও দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মিথ বা লোক-পুরাণের সৃষ্টি করেছিল। পরে বেদ এবং বেদোত্তর সাহিত্যে দিব্যলোকের মহিমাজ্ঞাপক নানাবিধ আখ্যান সৃষ্টি হয়েছিল। আদিম ও আদিবাসীদের নানা রকম মিথ্‌কে হিন্দুপুরাণে আশ্রয় দিতে গিয়ে ভারতীয় হিন্দুপুরাণের দেহ হয়ে-

ছিল স্ফীত। অধিকন্তু, ভারতীয় জনগণ অতিমাত্রায় সহনশীল। ফলে নবাগত দেবতাকে কোন হিন্দু প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং আপন ইতিহাসে একটা স্থান করে দিয়েছেন।

যোগেশ্বর শিব শিল্প, প্রজনন, উৎপাদনের দ্যোতক। কালক্রমে শিব সমুদ্র-মন্থনজাত বিষ পান করে হলেন নীলকণ্ঠ। দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মিথের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তা' মূলত মানব সভ্যতার অন্তরালবর্তী দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের কাহিনী।

গ্রীকপুরাণে বীরগাথা, দ্বীপান্তর, নির্বাসন, কলহ, যুদ্ধ, অপহরণ, অবৈধ জন্ম, ইত্যাদি বিষয় আশ্রয় লাভ করেছে বেশি। ভারতীয় পুরাণে এইসব ঘটনা বিরল নয়। গ্রীক পুরাণে বিমাতার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। সম্ভবতঃ গ্রীসের পারিবারিক জীবনের প্রভাব পড়েছিল তাদের লোকপুরাণে। ব্যক্তি-দেবতা-পশু এই বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে গ্রীসের লোকপুরাণ। বলি—আত্মোৎসর্গ অথবা নিহত হওয়ার ঘটনার প্রাচুর্য গ্রীসের—প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্জীবনের ভয়াবহ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে। 'নেমেসিস্' বা নিয়তি গ্রীক অদৃষ্টবাদের জীবন্ত চরিত্র। দুর্লঙ্ঘ্য মানবজীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—এটাই যেন গ্রীক্ প্রাচীন মহাকাব্যের মূল বাণী। এক ধরণের 'অপরাধী মনস্তত্ত্ব' বা 'অপরাধ সংস্কৃতি' গ্রীকপুরাণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। হোমারের মহাকাব্যে এই ধরণের ঘটনার প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে।

রোমীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীক পুরাণের সাদৃশ্য কোথাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে। স্থানগত নৈকট্যের জন্য এই নৈকট্য সম্ভব হয়েছে। তবে গ্রীক ও রোমীয় দেবতার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর।

গ্রীক পরাণের দেবতারা মানব সদৃশ। এপোলো, জুপিটারকে নিয়ে বহু কাব্য-গাথা রচিত হয়েছে। বহু দেবতায় বিশ্বাসী গ্রীকদের তুলনায় রোমকরা স্বল্প দেবতায় বিশ্বাসী। রোমকরা জুপিটারকেই তাদের দেবমণ্ডলীতে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। জুনো চন্দ্রের অধিশ্বরী। যিনি কৃষিকর্মকেও নিয়ন্ত্রন করেন। মিনার্ভাও রোমকদের অনন্যা বিদ্যার অধিশ্বরী।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবতাও পশুর সম্মিলনে অনেক অর্ধদেবতার সৃষ্টি হয়েছে। ওই দেবমণ্ডলী মানুষের সঙ্গে পশুর সম্পর্ক যেমন দ্যোতনা করে তেমনি আবার মানুষের মধ্যে পশুপক্তির বিকাশকে প্রকাশ করে। লোকপুরাণে যৌন

প্রতীক বা প্রজনন প্রতীক শস্য, পত্র-পুষ্প, পশু ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রীস ও রোমের তুলনায় আফ্রিকার মিথ সমূহ একটু ভিন্ন। কারণ আফ্রিকার লোকপুরাণ সমূহ এখনও অলিখিত। অরণ্যসঞ্চারী আফ্রিকার মানুষ লিখন প্রথার আবিষ্কার করেছে অনেক পরে। আফ্রিকার লোকপুরাণে আমরা পাব সৃষ্টির রহস্য কথা, পশু-পক্ষির কথা, মানুষ ও তার সমাজব্যবস্থার কথা। এরাও মনে করে এর মধ্যে রয়েছে 'পবিত্র ইতিহাস'। 'পিগ্‌মি' গল্প-গুলি আফ্রিকার পুরানের অনন্য অংশ।

সাপ বিশেষত চক্রাকারে আপন লাঙ্গুল মুখগহ্বরে অনুপ্রবিষ্ট এমন সাপ—আফ্রিকার লোকপুরাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রতীকটির অর্থ বহু ব্যাপক। এই সর্প যৌন প্রতীক ; আত্মরতির অনন্য নিদর্শন।

প্রাচীন সভ্যতায় লোকপুরাণের ভূমিকা সুদূর প্রসারী। কারণ মানুষের গল্প বলার প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছে সৃষ্টিমূলক 'মিথ্‌' রচনার মধ্য দিয়ে। সূর্য, আকাশ, গ্রহতারা, চন্দ্র, পৃথিবী, সর্প, বৃক্ষ, লতা-পাতা, খাদ্য, ঋতু, জন্ম-জরা-মৃত্যু, দেবতা-অপদেবতা, অসুর-দানব, দৈত্য, পরী, পক্ষিরাজ, কথকপাখি ইত্যাদি প্রথমদিকের মানবসভ্যতাগুলির মৌখিক সাহিত্যকৃতির অন্যতম উপজীব্য। কাল-ক্রমে চিরায়ত মহাকাব্য ও আখ্যানগুলিতে এই উপকরণগুলি জাতীয় জীবনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের অনুষঙ্গ হয়েছিল। মানুষের দৈহিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিবর্তনও ঘটেছিল। ফলে আদিম-বর্বর-সভ্য এই স্তরগুলির মধ্য দিয়ে স্থানিক, কালিক পটভূমিতে নানাবিধ উপকরণকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। লোকপুরাণে এই আত্মীকরণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। ফলে লোকপুরাণগুলি হয়েছে সমৃদ্ধ। কিন্তু মৌখিক স্তর অতিক্রম করে যখন পাণ্ডুলিপিতে বা পুথিতে লোকপুরাণগুলি সংবদ্ধ হয়েছে, তখন পরিবর্তনশীলতার সম্ভাবনাও গেছে কমে। অধিকন্তু লোকপুরাণ দৈব-মহিমা ও চরিত্রাশ্রয়ী বলেই এদের পরিবর্তন কোন দেশের জনগোষ্ঠীই তেমন করেনি। লোকাচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-দেবতা ইত্যাদির দুচ্ছেদ্য বন্ধন লোকপুরাণকে চিরায়ত মহিমা দান করেছে। অতএব লোকপুরাণ মিশর, মেসোপটেমিয়া, সুমের, গ্রীস, রোম, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে একটি পাকা আসন পেতে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, অনেক পুরাণ-রেণু আবার

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আধুনিক সাহিত্যে ও জীবনে ভিত পেতে নিয়েছে। ফলে লোক-পুরাণ যে কোন দেশের মানুষের জীবন ও সাহিত্যকে একদিকে করেছে উর্বরা, অন্যদিকে নীতিবাদী।

লোকপুরাণে ধর্ম-দেবতা-যাদু যেমন আছে, তেমনি আছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান কিভাবে, কতটা আছে তা' সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। তবে ' একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি লোকপুরাণে প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষভাবে মানব-সমাজের প্রাচীনতম স্তরের অনেক স্মৃতি স্তবীভূত হয়েছে। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে যে চিত্র বা মূর্তি পরিকল্পনা আমরা দেখি, তাতো সমাজ ও জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য তার সঙ্গে আধিদৈবিক মানসিকতা মিলে-মিশে এমন আবহ সৃষ্টি করেছে যা আধুনিক জীবন দিয়ে বিচার করা যায় না। হারানো সেই জীবনের প্রত্নলিপি পুরোটা আজ পাঠ করতে আমরা অক্ষম। কিন্তু একদা ঐ 'প্যাটার্ন অব লাইফ' যে বিভিন্ন দেশে ছিল সেকথা অস্বীকার করতে পারি না।

লোকপুরাণে যে ঘটনা ও চরিত্রগত বৈপরীত্য আছে তা অনেক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ স্বীকার করেছেন। লেভি ষ্ট্রাউস তাঁর সুবিখ্যাত 'ষ্ট্রাকচারাল এনথ্রোপলজি' গ্রন্থে মিথের গঠন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রত্যেক মিথে 'binary oposites' বা ঘটনাগত বৈপরীত্য রয়েছে। 'সমুদ্রমন্থন' সম্প-র্কিত ভারতীয় মিথে দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্ব এবং সর্পরজ্জু (mediator) গরল ও সুধার আবির্ভাব সামাজিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বা সংঘর্ষের প্রতিফলন মনে হয়। বিশ্বের তাবৎ মিথের অন্তরালে যে তত্ত্ব ও সত্য নিহিত আছে, তাই'ত সমাজ-বাস্তবতা।

লোকপুরাণ মানবজাতির শৈশবাবস্থার প্রতিচ্ছবি। কি করে আমরা (মানুষ) এলাম পৃথিবীতে? কে এই পৃথিবীর স্রষ্টা? কে প্রথম মানুষ? ইত্যাদি প্রশ্ন প্রাচীন মানুষ তুলেছেন। তার উত্তর আমরা পেয়েছি 'মিথের' মধ্যে। অবশ্য ঐকালের বিজ্ঞানী মন লোকপুরাণের ব্যাখ্যাকে মানতে রাজী হবে না। তবে প্রত্নবিদ ট্রোজান সমরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। মহাভারতের ও রামায়ণের ঘটনাবলীও আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য খণ্ডিত। লোকপুরাণে যে ঐতিহাসিক উপকরণাদি থাকে তাকে বিশ্লিষ্ট করা বিজ্ঞানীর কাজ। তবে একথা ঠিক এখনও আমরা মিথের আলোছায়ার জগৎ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাইনি; হয়ত পাব না। এযে জীবন থেকে জীবনে সঞ্চারিণী। সেই কারণে

বলতে পারি : চিরায়ত লোকপুরাণ পাঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, অনুশীলনে লোকপুরাণ পঠনীয় বিষয়। মানব সভ্যতার অনেক গভীরতর জগৎ লোকপুরাণের আবরণে ঢাকা ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. **Encyclopaedia of Floklore, Mythology and Legend (Vol I & II) : Ed : Maria Leach**

২. **Structural Anthropology : Claude Levi Strauss**

৩. **Myth and Reality : D. D. Kosambi**

৪. **Collin's Concise Encyclopaedia of Greek and Roman Mythology : —Sabine G. Oswalt**

৫. **World Mythology Series : Paul Hamlyn (Vol 1—10)**

৬. **Ramayana : Myth and Reality : H. D. Sankalia**

৭. **The Cultural Heri tage of India (Vol I—V) : Ramakrishna Misson Institiute of Culture**

৮. **Dictionay of Classical Mythology : J. E. Zimmerman**

৯. **A Dictionary of symbols : J. E. Cirlot**

১০. **Ritual Art and Myth : Jane Harrison**

বাংলার প্রাচীনতম লোকপুরাণ-মনসামঙ্গল

—সুজিত সুর

সুন্দরবনের জঙ্গলগামী গুনিনদের বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে একটি অদ্ভুত মন্ত্র পাওয়া গেল। মন্ত্রটি —'বাইশ ফকিরের নাম'। পরপর বাইশজন গুনিন (এঁদের ফকির বলে অভিহিত করা হত) এর নাম উল্লেখ করে সশ্রদ্ধভাবে বলা হয়েছে—"পূর্বে আনন্দ সহিত এই বাইশজন। এরাই করিল ৮০ হাটের পত্তন।" —কোনও দেবদেবীর দোহাই নেই, অন্য কোন কথাই নেই—কেবল এই বাইশ-জনগুনিনের অতি সাধারণ নাম। উত্তরকালের জঙ্গলগামী গুনিনের কাছে এই নামগুলি মন্ত্র হয়ে উঠেছে।

এমন করেই লোকসমাজ তার ইতিহাসকে ধরে রাখে। তার মূল্যবান অভি-জ্ঞতা, তার বীরসন্তানদের নাম ও কাহিনী সে স্মৃতির মধ্যে রেখে দেয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের (ritual) সঙ্গে যুক্ত লোকপুরাণ (myth) এর মধ্যে। যুগ যুগ ধরে উত্তরপুরুষের কাছে সেগুলি হস্তান্তরিত হতে থাকে। রীতি-অনুষ্ঠানগুলি হয়ত নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে, অনেক পরিবর্তনও আসে তার মধ্যে। লোকপুরাণগুলির অংশবিশেষ হারিয়ে যায়। আবার কখনও নতুন কোনও ধারা এসে তাকে পুষ্ট করে। তবু যেখানে অন্য কোনও উপায়ে ইতিহাস রক্ষা করার উপায় থাকে না—সেখানে এমনি করেই লোকসমাজ তার ইতিহাস রক্ষা করেছে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র, বরুণ অথবা মিত্রকে দূর অতীতের বীরনায়ক বলে এখন আমরা মেনে নিয়েছি। ঋষিদের সুক্তগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছি সুদূর অতীতের এক বা একাধিক আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর ইতিহাস।

আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বেদকে মূল্য দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাস সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের বেলায় ঐতিহাসিকরা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং লিখিত সাহিত্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। বিশেষ করে ট্রাইব পদ্ধতি যেখানে বেশী চালু ছিল এবং বর্তমানেও সেই ট্রাইব হিসাবে না থাকা লোক-সমাজেও যখন তার রেশ অত্যন্ত বেশী পরিমানে দেখা

যায়—সেখানে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে লোক-সমাজের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে ঐতিহাসিকরা 'লোকসমাজের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস'—একথাকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করেও এখনও পর্যন্ত লোকপুরাণ-গুলি অনুসন্ধান করার কাজে অগ্রসর হননি। লোকজীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান যে ইতিহাস চর্চার প্রথম ধাপ—কোশাম্বী সে বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথকে অবলম্বন করার চেষ্টা অতি ক্ষীণ। 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব'তে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বললেন, "আগেই বলিয়াছি জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার যে-সব উপাদান আমাদের আছে তার অধিকাংশ রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আশ্রয়ে রচিত। রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য তাহার অনেকাংশ এইসব উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের বা তাহা-দের আশ্রয়ে রচিত কোনও উপাদান আমরা পাইনা কেন?" এরপর 'ডাকের বচন', 'শূন্যপুরাণ', গোপীচাঁদের গীত', 'সেখ শুভোদয়া', 'আদ্যের গম্ভীরা' 'মুর্শিদ্যাগান' প্রাচীন রূপকথা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এগুলি "পরবর্তীকালে ক্রমশ যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন যে সঙ্গে সঙ্গে সম-সাময়িক যুগের সমাজের পরিচয় তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে নাই তাহার নিশ্চয়তা কী?" —শুচিতার দোহাই দিয়ে তিনি লোকসমাজের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। লিপিমালা এবং রাজসভা-ধর্মগোষ্ঠীর সাহিত্য থেকে আমরা প্রাচীন বাঙালী জীবনের একটি আংশিক স্থিরচিত্র লাভ করলাম।

প্রাচীন বাঙালী লোকসমাজকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস হিসাবে বাংলার প্রাচীনতম লোকপুরাণ 'মনসামঙ্গল'কে কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি।

॥ ১ ॥

পণ্ডিত মহলের ধারণা—মনসা সাপের দেবী, কিন্তু নিজে সর্পরূপা নন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "আদিম বাঙালীর সর্প ও ব্যাঘ্র-ভীতি সুবিদিত, এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কী করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল তাহাও এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাঘ্র-

পূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই।"

অবশ্য মনসার অন্তরূপগুলি কিছু কিছু যে নজরে পড়েনি—তা নয়। সাপকে প্রজননের প্রতীক হিসেবে পৃথিবীর নানান্ জায়গায় প্রাচীন মানুষরা যে গ্রহণ করেছে—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তা স্বীকার করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড প্রথমার্ধে মনসামঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা বলিয়া বিভিন্ন নামে মনসার পূজা চলিয়া আসিয়াছিল। এখানে ইনি বিশেষ করিয়া সাপের দেবতা, তবে নিজে সাপ নন।'

ডঃ সেন মনসার উৎস খুঁজতে গিয়ে এমনকি ঋগ্বেদে সাপের উল্লেখ পর্যন্ত দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—এই জাতীয় প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত বাইশা বা বাইশ কবির মনসামঙ্গলের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন, একমাত্র বেদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই সাধারণ বাঙালীর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণ এই দেশে আসিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, বাঙালী জীবনের প্রতিটি সাংস্কৃতিক উপকরণেরই ভিত্তি বেদপুরাণ বা স্মৃতিশ্রুতি। বিশেষতঃ সমাজের উচ্চতর স্তরে বেদপুরাণের প্রভাব কতকটা স্পষ্ট হইলেও সাধারণ কিংবা নিম্নস্তরে ইহার প্রভাব একেবারে নাই বলিলেও চলে। মনসাপূজা বাঙালী সমাজের সাধারণ ও নিম্ন-স্তরেই একটি মুখ্য উৎসব, অতএব ইহার উৎপত্তি নির্দেশ করিতে বেদপুরাণ অনু-সন্ধান করা নিরর্থক।"

ডঃ ভট্টাচার্য বাংলার আশেপাশে এবং ভারতের আরও অনেক জায়গায় বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে সর্পপূজার রূপটি অনুসন্ধান করেছেন। তিনিও কিন্তু বাংলার মনসাপূজার সঙ্গে এইসব সর্পপূজার কি সম্পর্ক তা বিচার করেন নি। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের ভাগ্যান্বেষী সেনরা বাংলার কিছু অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল বলে দক্ষিণ ভারতের 'মনে মঞ্চাম্মা'র সঙ্গে মনসা সম্বন্ধ আছে কিনা, তা তিনি বিচার করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য সে সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে 'মনসা'র উৎস যে বাঙালী লোকজীবনেই খুঁজে পেতে হবে, এই সত্যটি তুলে ধরেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, মনসাপূজার যে সব বিচিত্র রীতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত, সেগুলি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন ব্রতকথার দাঙ্গাই

বুড়াই কাহিনী। কিন্তু তিনিও যেন সাপের দেবী হিসাবেই মনসাকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত। ঘট পূজাতে ডঃ ভট্টাচার্য সম্পদের দেবীকে পূজা করার রীতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সাপের সঙ্গে গুপ্তধনের সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি যখন 'সর্পদেবী' মনসাকে পূজার কথা বলেছেন তখনই কিছুটা ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। গুপ্তধন সম্পর্কিত ব্যাপারটি লোকসমাজে সাধারণের পূজা হতে পারে কিনা সন্দেহ।

লোকজীবনে প্রাচীনকাল থেকে আগত আনুষ্ঠানিক রীতিগুলি কখনই নিরর্থক নয়। সমষ্টিগত জীবনচর্চার কোনও না কোন স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত থাকবেই। পরবর্তীকালে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ গৃহদেবতার পূজোর মধ্যে, অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রাচীন রীতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। আবার কোনও গোষ্ঠি নতুন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেও লোকসমাজে লক্ষ্য করা যায়—পুরাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় খুলনা জেলা থেকে আগত রাজবংশীদের মধ্যে শীতলার জাগরণ গান চালু আছে। এই ঐতিহ্য তারা গ্রহণ করেছিল দক্ষিণবঙ্গে আসার পর। আলোচ্য রাজবংশী সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব দেবতা হরি-সন্ন্যাসীঠাকুর। দক্ষিণবঙ্গের অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঠাকুরের পূজোর প্রচলন নেই। হরি সন্ন্যাসী দুজন দেবতা। দুজনেই ব্যাঘ্রবাহন। (অনুসন্ধানের সময় জানা গেছে বাহন ঠিক ব্যাঘ্র নয়। স্থানীয় কুমোরেরা রূপটি কল্পনা করতে পারে না বলে বাঘ তৈরী করে। আসলে নাকি শিয়ালের মত একটা প্রাণী বাহন ছিল। ঠিক ঠিক বর্ণনা বয়স্ক কোনও রাজবংশীও দিতে পারে নি।) যিনি হরি ঠাকুর, পরনে তাঁর রাজবেশ, মুখ-ব্যাদনরত বাঘ তাঁর বাহন। আর সন্ন্যাসীঠাকুরের চেহারা এবং বেশ অনেকটা মহাদেবের মত। তাঁর বাহনের মুখ বন্ধ করা। এই যুগল দেবতার প্রাচীন ঐতিহ্য এই রাজবংশীসম্প্রদায়ের কারও জানা নেই। কিন্তু বছরের একসময়ে এই ঠাকুরের সাধারণের পূজো হয়। কেউ কেউ মানত করে বাড়ীতে পূজো করে। আবার শীতলার জাগরণ গান করার সময় দেববন্দনা পর্বে যথোচিত মর্যাদা সহকারে হরিসন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করে। অন্য সম্প্রদায়ের শীতলার গানে হরিসন্ন্যাসী অনুপস্থিত।

আবার লোকজীবন অনেক সময় তার রীতি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নানা কারণে হারিয়ে ফেলতে পারে। শীতলা যে অনেক জায়গাতেই তাঁর প্রাচীন

ঐতিহ্য হারিয়ে বসে আছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এখন বসন্ত রোগ-আরোগ্য দেবী। তাঁর কাঁখের কলসিটি এখন শান্তি বারিতে পূর্ণ থাকে, আর হাতের শস্যের প্রতীকটি এখন ঝ াটা বলে পরিচিত। এ ব্যাপারে পূজারী ব্রাহ্মণের ভূমিকা থাকাটাও বিচিত্র নয়। পুরাতন ঐতিহ্যকে বুঝবার কোনও দায়িত্ব তার থাকে না। নতুন ব্যাখ্যা জোগানের ব্যাপারেও সে সিদ্ধহস্ত। বন-বিবির পূজোতে বনবিবিকে মহামায়ার অংশ বলে ঘোষণা করে মহামায়ার মন্ত্রে তার পূজোকরার কথাও জানা যায়।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত জীবন ছাড়া কোন সাধারণের রীতি অনুষ্ঠান তৈরী হতে পারে না। কোনও গুপ্তধনের ব্যাপারকে সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিভিন্ন গ্রীক লোকপুরাণের ব্যখ্যা করতে গিয়ে রবার্ট গ্রেভস্ এক জায়গায় বলেছেন, Zeus as serpent is Zeus ctesius, protector of store-houses, because snakes got rid of mice. (7 : 3 Greek Myths). অর্থাৎ জিউস সর্প হিসাবে হলেন জিউস স্টেসিয়াস, ভাণ্ডারের রক্ষা কর্তা। কেননা সাপ ইঁদুর মারত।

মনসাকে সম্পদের দেবী হিসাবে ঘটপূজো করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে সাপের দেবী বলে ব্যাখ্যা করতে চাওয়াতেই বিপত্তি ঘটেছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে পেঁচা। গণেশের সঙ্গে ইঁদুর, ষষ্ঠীর সঙ্গে বিড়াল, শীতলার সঙ্গে গাধা যুক্ত হয়ে আছে। তাই বলে এই সব দেবদেবীকে কখনই পেঁচা, ইঁদুর, বিড়াল অথবা গাধার দেবতা বলে উল্লেখ করার চেষ্টা হয়নি। এমনকি শিবের সঙ্গে সাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও কেউই বলেন নি যে শিব সাপের দেবতা। কোনও আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কোনও দেবতার পূজো করা হলেই তিনি সেই বিশেষ রোগের আরোগ্য দেবতা হয়ে উঠবেন—এ ব্যাখ্যাও ভ্রান্তিমূলক। ও ম্যালির খুলনা জেলা গেজেটে উল্লেখ আছে, সেই সময়ের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, জঙ্গলে কাউকে বাঘে মারলে যদি মৃতদেহ উদ্ধার করা না যেত, তাহলে ধরে নেওয়া হ'ত শীতলা তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এই কারণে বাঘের দেবী বলে শীতলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা নেই। সর্পদংশনের চিকিৎসা করতে গিয়ে ওঝারা মনসা বা বিষহরির নাম করে থাকে। কিন্তু তারা যে কেবল মনসার নাম করে—তাও নয়। শিব, কৃষ্ণ, গরুড়, আদ্যাদেবী, ধর্ম্মঠাকুর, গোরক্ষনাথ, হাড়ি ঝি—এদেরও নাম করা হয়। এমন কি চন্দ্রসূর্য্যের উল্লেখও পাওয়া যায় সাপের ওঝার

মন্ত্রের মধ্যে।

মনসার সঙ্গে মনসামঙ্গল কাহিনী যুক্ত না থাকলে অবশ্য সমালোচকরা এতটা মাথা ঘামাতেন কিনা সন্দেহ। মনসার লোকপুরাণকে কেউই ঠিক মত ধরতে পারেন নি। মনসাকে উপেক্ষা করারও উপায় ছিল না এই মঙ্গলকাব্যের জন্যে। একসময় বাংলা সাহিত্যে মনসা-মঙ্গলই একমাত্র সৃষ্টি। আধুনিক শিক্ষিত মহলে মনসা উপেক্ষিতা হলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু কটাক্ষ করলেন। গোপাল হালদারের মত বিদগ্ধ সমালোচক উপেক্ষা দেখালেন। তবু এই 'লঘু জাতি' 'চ্যাংমুড়ি কানী' কে অস্বীকার করা গেল না। তবু বিংশ শতাব্দীর এই শেষ অর্ধেও লোকসমাজে তিনি বিশেষভাবেই জনপ্রিয়। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা কিন্তু 'মনসা'র চেয়ে মনসামঙ্গলের কবিদের নিয়েই মেতে উঠলেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বললেন—'অনেক রকম প্রাচীন মিথ মিলিয়া মিশিয়া মনসার কাহিনী গঠিত।' কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে সেই 'মিথ্'গুলির উল্লেখই তিনি করলেন না—বিশ্লেষণ তো দূরের কথা। তিনি বলেছেন, "অনেক কবিই মনসা-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্নকালের বিভিন্ন সময়ের লোক। কাল অনুসারে কাহিনীর রূপান্তর ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনা। তবে স্থান হিসাবে কাহিনীর অল্প স্বল্প বিভিন্নতা গ্রাহ্য করিতে হয়।" —এই 'অল্পস্বল্প বিভিন্নতা' নিয়ে তিনি কিছুটা আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁব মূল বিতর্ক যেন কবিদের প্রাচীনত্ব নিয়ে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও যেন 'বাইশা'র ভূমিকায় এবং মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাসে কবিদের উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

'বাইশা' বা 'ষট্পদী' রীতির কথা ডঃ ভট্টাচার্য নিজেই উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গলের বিভিন্ন গায়েন বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ সঙ্কলন করে এক একটি সম্পূর্ণ পালা তৈরী করে নিতেন। এই গায়েনদের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। কানা হরিদত্তের নামে প্রচলিত কাব্যাংশের মধ্যে পুরু-ষোত্তম বলে যে নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়—সেটি একজন গায়কের নাম বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। গায়েনের গুরুত্ব বিজয় গুপ্তের কাব্যেও স্বীকৃত। তাঁর কাব্যের বন্দনা অংশে আছে, "গাইন বন্দম, বাইন বন্দম সঙ্গের পঞ্চভাই।" এই সব গাইনদের গানে কবিদের কাব্য সম্পূর্ণ অধিকৃত থাকত, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ নেই। অন্যদিকে প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে কবিরা নতুন কিছু রচনা করতেন—তাও নয়। কানা হরিদত্তকে মনসার মুখ দিয়ে নিন্দিত করার সময়

বিজয় গুপ্ত যে কথা বলেছেন—তা উল্লেখ করা যাক।

"কথার সঙ্গতি নাই নাইক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাই মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাফ ফাল।"

এ থেকে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে এই নতুন ছন্দ, মিত্রাক্ষর ইত্যাদির জন্যেই কবিরা নতুন করে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করতে উৎসাহী হতেন। বিষয়বস্তুর জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হত। এই সমস্ত দেখে মনে হয় মনসামঙ্গলের কবি নয়—কাব্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার বিশ্লেষণের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

মনসামঙ্গলকে লোককাব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা নাহোক—তার উৎস যে লোকজীবন—একথা স্বীকৃত হয়েছে। কাব্যে মনসাকাহিনী যে ভাবে উল্লেখিত হয়েছে, এবং লোকজীবনে যে ভাবে মনসা পূজিত হন, তা থেকে তাঁর কোন রূপটি ধরা পড়ে—তা দেখার চেষ্টা করা যাক।

পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলায় শ্রাবন অথবা ভাদ্রে সারা মাস ধরে মনসার ভাসান গাওয়া হয়। দক্ষিণ বাংলার প্রচলিত রীতিতে এই গান মেয়েরা করে থাকে। রাত্রি জাগরণের ব্যাপারটিও এর সঙ্গে জড়িত। সমষ্টিগত জীবনে এ ধরণের অনুষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ষকালপঞ্জী (Calendar) অনুসারে শ্রাবন, ভাদ্র লোকজীবনে অত্যন্ত সঙ্কটময় কাল। চাষী চাষ সেরে মাঠ থেকে উঠে এসেছে। সামনের দিনগুলিতে এক অনিশ্চিত আশা নিয়ে প্রতীক্ষা। এর মত সঙ্কটময় মুহূর্ত চাষীর কাছে আর নেই। স্বভাবতই এই সময়ে প্রার্থনাই তার কাছে বড অনুষ্ঠান। এই প্রার্থনা—সমবেত প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনা যার কাছে জানানো হবে—তিনি সর্পদেবী—একথা চিন্তা করা কঠিন। এখনও লক্ষ্য করা যায়, এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে মূলত মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করে। রাত্রি জাগরণ করে মেয়েরা যে অনুষ্ঠান করে থাকে, তার সঙ্গে প্রজনন বা কৃষির সম্পর্ক থাকবেই। পূজার উপকরণ হিসাবে দুধকলার ব্যবহার করা হয়। যতই বলা হোক না কেন, 'দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা'—দুধকলা কিন্তু সাপের আহার্য নয়। এটি প্রজনন প্রতীক।

সাপকে গোষ্ঠী টোটেম হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়াও সাপের সঙ্গে প্রজননের সম্পর্কটি আমাদের দেশে অধিক স্বীকৃত। পাশ্চাত্য লোকপুরাণে সাপকে কোথাও কোথাও মৃত্যুর প্রতীক বলা হয়েছে। এদেশে এখনও লৌকিক

বিশ্বাস। সাপের স্বপ্ন সন্তানের জন্ম দেয়। সাপের রহস্যময়তার মতই প্রজনন এবং কৃষির রহস্যময়তা। স্বভাবতই সেই কারণে কৃষির প্রতীক সাপকে বেছে নেবার সম্ভাবনা আছে। সর্বোপরি সাপের আছে খোলস ছেড়ে নবরূপ ধারণ করার ক্ষমতা। মৃত্যুর পর পুনর্জন্মলাভ—এই ধারণাটি কৃষিজীবী লোকসমাজেরই এক বিশিষ্ট ধারণা।

সুন্দরবন এলাকার শীতলার জাগরণ গান সম্পর্কে অনুসন্ধানের কালে দেখা গেছে লবকুশের হাতে শ্রীরামের মৃত্যুর পর সীতার বিলাপ এই গানের মধ্যে আছে। "ও লবকুশিরে, কোন বনে রোণ করে এলি। পুত্র হয়ে শত্রু হলি, সিঁথির সিঁদুর মুছাইলি।" ইত্যাদি।

আর মনসাকাহিনীর মানব অংশে লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফাল্গুন চৈত্রে শীতলার জাগরণ গানে দেখি—শোকাতুরা সীতার বিলাপ। সে সময়ে শ্রীরামের পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত-অগ্রসর হবার কোনও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্রের মনসা কাহিনীতে মৃত্যুর কথা বড করে দেখা যায়না। আশায় বুক বাঁধার জন্যে পুনর্জীবনের জাদুবিশ্বাস একান্ত ভাবে প্রয়োজন। লক্ষ্যের যত কাছাকাছি পৌঁছানো যায়. অনিশ্চয়তার দোলা তত বেশি নাড়া দিতে থাকে। সে সময়ে বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে ধরে রাখার প্রয়োজন আরও বেশি। লোকসমাজে বিশ্বাস—লখীন্দরের সর্পাঘাত পর্বটি শুনলে বা শোনালে তার পুনর্জীবন পর্যন্ত শুনতে বা শোনাতে হবে। এই প্রবন্ধের পরিকল্পনাকালের মধ্যে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত মনসার গানে লখীন্দরের সর্পাঘাত পর্বটি কোনও এক লোকগায়ক বিস্তারিতভাবে গাইলেন। দেখা গেল, স্বল্প সময়ের দরুন গানের বদলে কথা দিয়ে লখীন্দরের পুনর্জীবনলাভের কথা শুনিয়ে শেষ করা হল।

মনসামঙ্গল কাব্যের ২টি বিবাহ বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি মনসার বিবাহ।

মনসার বিবাহ পর্বটি অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যপুরাণের প্রভাবে এই বিবাহ পর্ব সম্পন্ন করা হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশা'তে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের যে অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় মনসা কাজলা মাল্যানীকে বলছেন, "কুমারী দেখ্যা উপহাস কর।" অথবা অন্য এক জায়গায় বলা হল, "মনসা কুমারী গেল সিজুয়া শিখর।"

স্ত্রী-পুরোহিতদের অবিবাহিত থাকার মত কোনও রীতির ইঙ্গিত আছে কিনা তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি দিকের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখা যায় ছয়পুত্রের শোকে চাঁদ বলছেন,

"ধামনা-ভাতারী তোর হিতাহিত নাই।
আমি তোর দেবকুলে ভাঙ্গিব বড়াই।।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর বগুড়া জেলার কবি জীবন মৈত্রের কাব্যে দেখা যায় (বাইশাতে উল্লিখিত) চাঁদ মনসাকে লক্ষ্য করে বলছেন, "ভাল বাঁচি গেলু মাগী ধামনা ভাতারী।" টীকাতে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন যে এইভাবে 'ধামনা-ভাতারী' বলে মনসাকে অনেক জায়গায় গালি দেওয়া হয়েছে। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে দুই এলাকায় দুই কবি যখন 'ধামনা-ভাতারী' শব্দটি ব্যবহার করছেন তখন নেহাতই গালাগালি বলে শব্দটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। 'ঢ্যামনা' শব্দটি অবশ্য গালাগালি হিসাবে এখনও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপারটি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

মহাভারতের জরৎকারু-কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে মনসার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের কবিরা মোটামুটি ভাবে উচ্চকোটির সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। নিম্নকোটির সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় আসার সময় স্বাভাবিক ভাবেই লোকপুরাণের সঙ্গে তাঁরা সংস্কৃত পুরাণের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এইভাবে লোকপুরাণের মহিমা বৃদ্ধি করে তাকে কিছুটা জাতে তোলার চেষ্টা করেছেন এঁরা। লোকসমাজেও ধীরে ধীরে সে প্রচেষ্টাকে স্বীকার করে নিয়েছে। এইভাবে জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্যে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু সেই বিবাহ পর্বেও লক্ষ্য করা গেল, বিবাহ রাত্রি শেষ হয়ে আসার সময় জরৎকারু মুনি মনসাকে ফুল তুলে আনতে আদেশ করলেন এবং মনসা তা করতে অস্বীকার করাতে মুনি কিছুটা কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে চেষ্টা করলেন। তখন মনসা তাঁর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রাত্রি প্রভাতে সকালে এসে দেখলেন মুনি মারা গেছেন। অবশেষে শিবের অনুরোধে মনসা আবার বাঁচিয়ে তুললেন জরৎকারুকে। সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনী এইভাবে বাংলা লোকপুরাণে নতুন রূপ লাভ করলো।

দ্বিতীয় বিবাহ কাহিনীটি অত্যন্ত সুপরিচিত লখীন্দরের বিবাহ কাহিনী। এখানেও বিবাহ রাত্রে লখীন্দর মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণও মনসা এবং তিনিই তাকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। কিন্তু এবারের পুনর্জীবন রাত্রিশেষেই নয়। কেতকাদাসের রচনায় পাওয়া যায়—

"বেহুলা কান্দিয়া বলে প্রাণনাথ লৈয়া কোলে
যাব আমি ছয়মাসের পথ।"

এই ইঙ্গিতের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। শ্রাবণ বা ভাদ্র থেকে ছয় মাসের পথ অতিক্রম না করলে লখীন্দরকে ফিরে পেতে পারি না। এই লখীন্দর চাষীর ঘরের ফসল যা পৌষ মাঘ মাসে চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়ে ফিরে আসে।

এরই প্রায় কাছাকাছি একটি অতিরিক্ত কাহিনী পাওয়া যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে। অন্যত্র এই ঘটনাটির উল্লেখ নাই। চণ্ডীর পুষ্পবন থেকে ফিরে আসার সময় শিব মনসাকে করণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আসছিলেন। এই করণ্ডীর মধ্যে মনসাকে লুকিয়ে রাখাও মৃত্তিকার মধ্যে বীজ বপনের ইঙ্গিত বহন করে মনে করলে ভুল হবে না। প্রজননের ইঙ্গিতও এ ব্যাপারে জড়িত আছে বলে মনে হয় করণ্ডী শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে। যাই হোক, নদী পার হবার পথে চণ্ডী ডোমনীর ছদ্মবেশে শিবকে নাকাল করলেন। অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে শিবকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে তিনি রেগে ফিরে গেলেন। শিব আর সরাসরি ঘরে ফিরতে সাহস পেলেন না। তিনি গেলেন তাঁর ভক্ত 'বচাই'র বাড়িতে। সেখানে শিবের অনুপস্থিতিতে বচাই করণ্ডীতে যুবতী কন্যা মনসাকে আবিষ্কার করল। ভাবল, শিব বোধহয় তাঁর এই অবিবাহিত ভক্তটির জন্য বিবাহের কন্যা এনেছেন। বচাই ভয়ানক খুশী। মনসা দেখলেন অবস্থা খুবই বেগতিক। তখন তিনি বচাইর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে মেরে ফেললেন। এক্ষেত্রেও শিবের অনুরোধে তিনি আবার বচাইকে বাঁচিয়ে তুললেন।

বিবাহরাত্রে পতির মৃত্যু এবং তার পুনর্জীবনলাভ—এর সঙ্গে কৃষির প্রতীক যেভাবে যুক্ত এবং মনসামঙ্গলে তার উল্লেখ বার বার যেভাবে রয়েছে, তা থেকে মনসার কৃষিদেবীর রূপটি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এরই সঙ্গে ঘটপূজো এবং সিজগাছপূজোর পদ্ধতির কথা ভাবলেই বোঝা যায় শস্য এবং উর্বরতার দেবী হিসেবেই মনসা পূজিত হন।

॥ ২ ॥

কিন্তু মনসার এই রূপটি কোনও স্থির চিত্র নয়। বিবর্তনের মধ্য থেকেই এই রূপের প্রকাশ ঘটেছে। সেই বিবর্তনের ধারাটি লোকপুরাণের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। সে ধারাটি অনুসরণ করতে যাবার আগে আরও কিছু কিছু দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যকে লোক-কাব্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, কেননা এর মধ্যে পরিশীলিত কবিকৃতির ছাপ বর্তমান। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বাইরেও মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু লোক-জীবনে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলির মধ্যে যে চিত্রগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিব অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

সাপেব ওঝারা যে সমস্ত মন্ত্রবলে সেইসব গুপ্তমন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন লোক-পুরাণের অনেক অংশ লক্ষ্য করা যায়। এদিকটি সম্পর্কে অনুসন্ধান কতখানি সাহায্য করতে পারে, লেখকেব যৎসামান্য সংগ্রহেব সামান্য বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়বে।

মন্ত্রগুলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রথমেই জেনে রাখা দরকার। সাধারণতঃ মন্ত্রগুলি কাউকে বলার রেওয়াজ নেই। শিষ্যরা গুরুকে তদ্বির করে তবেই মন্ত্র-লাভ করতে পারে। গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র না পেলে সেই মন্ত্রে কোনও কাজ হবে না বলেই বিশ্বাস। অনেকে অবশ্য খাতাতে মন্ত্র লিখে রাখেন। কিন্তু তার মধ্যে যতি চিহ্ন ব্যবহারে; পংক্তি সাজানোতে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়। পাঠের পদ্ধতি স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি গুরুর সাহায্য ছাড়া আয়ত্ত করতে পারে না। একই ব্যক্তি নানা মানুষের কাছে মন্ত্র শেখে। তার ফলে একজনের কাছেই নানা সম্প্রদায়ের ধারা এসে মিলিত হতে পারে। মিশ্রণ কম হয়েছে এমন মন্ত্রগুচ্ছ হয়ত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একেবারেই মিশ্রণ হয়নি তেমন মন্ত্রগুচ্ছ পাওয়া অসম্ভব বলেই ধারণা হয়েছে। অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উর্দু (?) মন্ত্রগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য নাও খাটতে পারে। কিন্তু বাঙলা মন্ত্রের বেলায় একথা সত্য। কেবলমাত্র যতি চিহ্ন এবং পংক্তি ব্যবহারে সম্পাদনা থাকলেও অন্য ব্যাপারে মন্ত্র-গুলিকে উদ্ধৃত করার সময় অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করা হল না। মন্ত্রগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,— বন্দনা, উড়ান, ঝাড়ান, মথন, গামছা-পড়া, কামুখ্যামন্ত্র, সুপারীবাটাউড়ান, কৃষ্ণসার, গোপীসার, ব্রহ্মজাল, রামসার চৌসাপা ঝাড়ান—ইত্যাদি। একই জায়গায় প্রায় একই মন্ত্র একাধিক বিভাগে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে।

মঙ্গলকবির রচনাও কিছু কিছু এই মন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে বন্দনা অংশে একটি মন্ত্রের ভনিতায় কেতকাদাস এবং অন্য একটি মন্ত্রের ভনিতায় ক্ষেমানন্দ নাম পাওয়া যাচ্ছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল হাতের কাছে না থাকায় সেগুলি মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যত্রও সে সন্দেহের অবকাশ আছে।

মন্ত্রের কিছু কিছু উল্লেখ করা যাক।

'মথন' মন্ত্রের সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের পুরাণকাহিনী মিশে গেছে। মহাদেবের আদেশে দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থন করা হলে যে কালকূট উৎপন্ন হল, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মহাদেব সেই কালকূট পান করে কণ্ঠে ধারণ করলেন। নাম হল তাঁর নীলকণ্ঠ। মনসামঙ্গলে এই পৌরাণিক কাহিনীর কিছু পরিবর্তিতরূপ লক্ষ্য করা যায়। কথা বাখার জন্য শিব বিষপান করে মৃতপ্রায় হলেন। তখন মনসাকে ডেকে আনা হল। তিনি এসে শিবের চৈতন্য ফিরিয়ে আনলেন। মনসামঙ্গল কাব্যের এই পরিবর্তিত রূপটি ওঝাদের মন্ত্রে ধরা পড়েছে।

একটি মথনমন্ত্রের অংশ—

(শিব বিষপান করার পর)

"বুক বেয়ে তামার গোটা ২ নাল ॥
কি কর কি নারদ ভাগিনে আমার কথা লও।
ঢেকির পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দুর্গার কাছে যাও ॥"

(নারদ দুর্গার কাছে গেলেন—)

"কি কর ২ মামী বসে আছ ছেলে।
বিশ খেয়ে ঢুলেছে মামা সাগরের কুলে ॥
কি কথা বলিলে নারদ তোর গদিতে দিলে মন।
কি রূপে দেখিলে আমার আজর ঢুটি স্থন ॥
আমার মাথা খাইগো মামী কার্তিকের মাথায় হাত।
বিষ খেয়ে ঢুলেছে মামা শিবশঙ্কর নাথ ॥
ওই কথা শুনে দেবী গেল বাসর ঘরে।
বাসর ঘরে গিয়ে দেবী আলুলাইলেন চুল।
চুল বেয়ে পড়ে দেবী শঙ্খ জাতীর ফুল ॥
কি কর ২ নারদ ভাগিনা বাটার গুয়ুল খাও।

ঢেকির পিঠে সওয়ার হয়ে পদ্মার কাছে যায়॥
সেখানে গমন করিল নারদের গণ।
ঢেকির পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দিচ্ছে দরশন॥
কি কর ২ দিদি বসে আছ হেলে।
বিষ খেয়ে ঢুলেছে মামা সাগরেরী কূলে॥
বাপু মলো ভাল হলো বসো ঠাকুর ভাই।
গুটি কতক রাগ আমি আনি ডাক দিয়া আনি॥"

বিভিন্ন 'রাগ' (সাপ) আনা হল। "সুতা সঞ্চার সাপ মনোসাব হাতের অঙ্গরী গোটা।" তারপর—"কতক রাগ লইয়া বেহুলা বাপ জিয়াইতে যায়।
ওডো ২ সদাশিব বিশ নাইকো গায়॥
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে ভস্ম হয়ে যা—।।"

মন্ত্রাংশ থেকে শিব নারদের মামা ভাগ্নে সম্পর্কটি লক্ষ্যণীয়। অন্য কিছু কিছু মন্ত্রে শিব নারদ প্রসঙ্গ ছাড়াই মামা ভাগ্নে প্রসঙ্গ আছে। একটি মন্ত্রে—
"মামা ভাগিনে জড়ে হাল মধ্যে দিয় ইশ।
কুথা চলে যাও তুমি ভামাগুডির বিষ।।"

অন্য একটি মন্ত্রে দেখি—

"সোনার লাঙ্গল রূপর ফাল মামা ভাগিনে জুড়ে হাল মধ্যে দিয়া ইশ।"

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসে' একটি মনসামঙ্গল থেকে (কামরূপ কামতার কবি মনকরের মনসাকাব্য) উদ্ধৃতি দিয়েছেন, নারদ গঙ্গাকে সংবাদ দিচ্ছেন— "হেমন্ত ঝিউদুর্গা গৈল ফুলধারি।
তার সঙ্গে মমাই যে খেলায়ে ধামারী।"

'হেমন্তের কন্যা ফুল চুরি করিতে গিয়াছিল। মামা তাহার সঙ্গে স্ফূর্তি করিতেছেন।' বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মনসা-নারদ সংবাদে দেখি—
"মুষল বাহনে নারদ চলে শীঘ্রগতি।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া যথা পদ্মাবতী।।
নারদে দেখিয়া পদ্মা বলে ভাই ভাই।
বিনয়ে করিয়া আসনে দিল ঠাঁই।।
নারদ বলে দিদি আসনে কাজ নাই।
তোমার কারণে মোরে পাঠালেন গোসাঞি।।"

এই সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিহ্ন থাকাই সম্ভব। নারদের প্রতি দুর্গার তিরস্কারটি লক্ষণীয়। মন্ত্রের শেষাংশে মনসার সর্প-সজ্জার ইঙ্গিতটিও উল্লেখযোগ্য। হরিদত্তের রচনায় এই রকম সর্পসজ্জার বর্ণনা আছে। কিন্তু মন্ত্রের শেষাংশে 'মনসা'র জায়গায় বেহুলা শব্দটি ব্যবহার করা হল কেন? তা ঠিক বোঝা গেল না। এটি কি লিপিকর প্রমাদ, নাকি অন্য কিছুর ইঙ্গিত? প্রাপ্তমন্ত্রগুলির একটি বন্দনামন্ত্রে ছাড়া আর কোথাও বেহুলার কোনরূপ নামোল্লেখ নেই। আর একবার বেহুলার নাম না করে সামান্য ইঙ্গিত আছে।

"শুনগো মনোসা মাথা আমার আরতি।
ঝাট করে জিয়াই দাও আমার প্রাণনাথ পতি ॥
প্রাণনাথ পতি জীয়াইলে সাধিব কল্যাণ।
মনসা মা পুনঃ কর মনের বাসনা ।।"

অন্য একটি মথন মন্ত্র নিম্নরূপ—

"মথনে ২ বিষ সাগরেরি কূলে।
তার তেজে সদাশিব পড়িলেন ঢুলে ॥
প্রবেশ করিলে দেহে রক্ত করে জল।
বিশ অঙ্গে বিশ আর না করিস বল ॥
যে তোরে সৃজিল তার অঙ্গে কর ঘা।
অনাদী হুকারে বিষ ভস্ম হয়ে যা ॥
মস্তক ছাড়িয়ে বিশ ঘা মুখেতে আয়।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর বর কামখের (?) আজ্ঞে ।।"

এটি একটি সম্পূর্ণ মন্ত্র। এখানে সমুদ্রমন্থন এবং শিবের বিষপানের ইঙ্গিত থাকলেও অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে মনসা বা বিষহরির উল্লেখ নেই। কিন্তু 'হাড়ির ঝি চণ্ডী কামখে'র এবং 'অনাদী'র উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। জীবন মৈত্রের কাব্যে (বাইশাতে উদ্ধৃত) আছে—

"মন্ত্রপড়ে ধন্বন্তরী সিদ্ধিগুরুর পাও।
দোহাই ধর্মের বিষ পঞ্জরে মিলাও ॥
হাড়ি ঝীর আজ্ঞা আর সিদ্ধিগুরুর পাও।
অনাদ্যের দোহাই বিষ ক্ষয় হইয়া যাও ॥"

আর একটি মথনের মন্ত্র নানা কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"পদ্মবনে পদ্মনালী। তাইতে বসল পুয়োবালী ॥
পুয়োবালী আজান জান। ৩৬ বিশ দিলেন টান ॥
তাহা খালেন নই কালী। নেই বিশ পুয়োবালী ॥
নব নালা ৩২ কোটি। তাহে উপজিল বিশ ॥
বিশের পোটে শুনিয়া পক্ষীরাজ করে হান ২,।
নাবরে বিশ তুই জগতের বান ॥
৪ পাচল পাকপাকী জলে আর স্থলে।
এক পাখা নিয়ে গেল এ মহিমণ্ডলে ॥
পাখা বলে পক্ষি মোর নায়ে কর নট।
উছান ছাড়িয়ে বিষ নায়ে বোস ভট

মন্ত্রটির প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্বের দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে' আসামের কামরূপ কামতা অঞ্চলের দুই কবি মনকর (মনোহর কর) এবং দুর্গাবরের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "দুই রচনাতেই মনসাকে বলা হইয়াছে 'পোঁঞা' (পদ্মাশব্দের তদ্ভব রূপ যাহা বিষ্ণু-পালের রচনা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় নাই)।" —সুন্দরবন এলাকা থেকে সংগৃহীত এই মন্ত্রে পাওয়া গেল—'পুয়োবালী'। বালা-পুরুষ এবং তার স্ত্রী -লিঙ্গে 'বালী' ব্যবহার—লক্ষ্যণীয়। (গাজনের সময় 'বালা' গান ছেলেরা করে থাকে।) পুংলিঙ্গে 'পাখা' এবং স্ত্রীলিঙ্গে পাখী (পাকা পাকী অথবা পাখা পক্ষী) ব্যবহারটি লক্ষ্যণীয়। হয়ত্ বা পুরানো ভাব মন্ত্রটিতে বেশী পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। 'পাখা বলে পক্ষি মোর নায়ে কর নট'—পংক্তিটি চর্যাপদের ডোম্বীপ্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। মনকরের মনসাকাব্যের সৃষ্টিপর্বে আছে, 'সংসারপত্তনের উদ্দেশ্যে গোঁসাই একজোড়া পাখি সৃষ্টি করিলেন।'—ডঃ সুকুমার সেন। —'পাখা পক্ষি' প্রসঙ্গে সে কথাও মনে করিয়ে দেয়। 'নই কালী' কে? তাঁর প্রসঙ্গ কি-ভাবে এল? মনে হয়, তন্ত্র সম্পর্কে যাঁদের ধারণা পরিষ্কার, তাঁরা মন্ত্রটির মধ্য থেকে আরও কিছু পেতে পারেন।

দুটি মন্ত্রে মনসার বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ক) "সির্জুন পর্বতে আছে জয় বিষহরি।"—(কৃষ্ণসার বিভাগে মথনবিষয়কমন্ত্র)

খ) "মনসার ঘরবাড়ী সুর্জিত পর্ব্বতে।"—(মথন মন্ত্র)

শেষোক্ত মন্ত্রটির শেষাংশে আছে—

"মহামন্ত্রে পড়ে মুখে করিল চুম্বান।
মনসার শির পাইল চেতন॥
বাপ ঝি হইয়া দেখ উপজিল হাস। —(হাম না হাস ?)
অমৃত দৃস্মেত কাল কুটি নাশ॥
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে—॥"

শিব মনসা পিতা-পুত্রী সম্পর্ক। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, মনসাকে দেখে শিব কামার্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মনসা আত্মপরিচয় দিয়ে শিবকে নিরস্ত করেন। —মন্ত্রটিতে অনুরূপ ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এর পরের উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে আবার এই প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। কিন্তু 'মনসার শির পাইল চেতন' কেন ? মনসা শিবকে বাঁচিয়েছেন—এপ্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্যে এবং মন্ত্রে পাওয়া গেছে। কিন্তু এটি কি লিপিকর প্রমাদ ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—কৃষ্ণসার মন্ত্রে এবং অন্য কিছু মন্ত্রে উল্লেখ আছে, কালীয় সাপের বিষে কৃষ্ণ অচেতন হয়েছিলেন। রাধার সর্পদংশন প্রসঙ্গও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে মন্ত্রগুলিতে। কখনও ললিতা কখনও বা কৃষ্ণ রাধাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

একটি ঝাড়ান মন্ত্র—

"কাগ বলে কাগী দেখ অপরূপ রঙ্গো।
বাপ ঝিয়ে কমলবনে লাগাইএছে সঙ্কো॥
এই কথা শুনে দেবীর উপজিল রিস।
মূলমন্ত্র ভস্ম যা কালকুটি বিষ॥
বাপ হায় ঝি হরে চুম্বু দিয়ে গালে।
বেজাতে কাহা জেতে বসল শিমূলের ডালে॥
হংস বলে হংসী দেবী দাখ অপরুপো রঙ্গো।
বাপ ঝিয়ে কমলবনে লাগাইয়ে শঙ্কো॥
এই কথা শুনে দেবীর উপজিল রিস।
মূলমন্ত্রে ভস্ম যা কালকুটি বিষ॥
নেই বিষ বলে শিরে হানে চাপড়ে ঘা।
তাইতে নেই বিষ কুথায় পদ্ম মা॥"

উত্তরবঙ্গে 'তন্ত্রবিভূতি'র মনসাকাব্যের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন। সেখানে আছে—'মনসা যখন বেশ পরিধান করিতেছে তখন কিছুক্ষণের

জন্য উলঙ্গ হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া দুর্গা ও নারদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনসাকে গালমন্দ করিতে লাগিল। মনসা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ চড়াইয়া দিলে শিব আবার ঢলিয়া পড়িলেন।' —মন্ত্রটিতে দুবার পিতা-পুত্রীর অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত আসতেই দেখি—'এই কথা শুনে দেবীর উপজিল বিষ।' অন্য একটি মন্ত্রে আছে—শিবকে বাঁচানোর জন্যে নারদ যখন মনসার কাছে গেলেন, তখন মনসা বলছেন, সেখানে চণ্ডী আছেন।

"সেই সে হেমন্তঋষির কন্যা বড় অহংকার।
সতাই গালি দেয় বাপও ভাতার।।"

আলোচ্য মন্ত্রটিতে 'কাগ-কাগী' এবং 'হংস-হংসী—দুই পাখির প্রসঙ্গ আছে।

চাঁদ সদাগরের কাহিনী কিভাবে মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করা যাক।

:'ওমা যারে খাবে কাল সাপে কি করবে তার ওঝার বাপে
তার সাক্ষী আছে বালা লক্ষীদার
সাঁতালী পর্বত পরে চাঁদ লোহার বাসর ঘরে
বেহুলা যে পতি লয়ে কোলে।
মাগো কাল নিদ্রা দিলে তার ডংশিলে মা লক্ষিদার
তব পূজা করিতে প্রচার।
কলার মাদাস পরে ছয়মাস ভাসিলেন জলে
তবে মা তার হইলেন সদয়।
ওমা দিয়েছিলেন যার প্রতিদান পুনঃ করিলে মনস্কাম
হরি ২ বল সর্বজন।''

—এটি একটি বন্দনামন্ত্রের অংশ। 'বন্দনা' প্রসঙ্গের মন্ত্রগুলির কিছু অংশ সম্পর্কে আগেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এটিও কোনও প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের অংশ হওয়া বিচিত্র নয়। ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার দেখে এরকম সন্দেহ মনে আসে। অন্য একটি বন্দনামন্ত্রে দেখা যায় 'বন্দম নাট্যম বন্দম তাল।'—মন্ত্রের মধ্যে এ রকম নাট্যম এবং তালকে বন্দনা কেন? বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বন্দনা অংশে আছে—"তাল যন্ত্রে বন্দি আর মন্দিরার ঘা।"

একটি ঝাড়ান মন্ত্র নানা কারণে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।—

"সীতার সমান সতী আছে কোনজন।
মনসার জন্মের কথা মন দিয়া শুন ।।
কোন পদ্মবনে ছিল পদমও কুমারী।
তার পিছে জন্মেছিল ওঝা ধন্নন্তরী ।।
চাঁদ বেনে সোওদাগারে বধ করিলেন তারে।
ছয়পুত্র খেয়েছিল সাপে ছয় বধু রাড়ী ।।
বাসর নিম্মান করিলেন পর্ব্বতের উপরে।
তাহে শুয়ে নিদ্রা যায় সোনার লক্ষিনদার ।।
দেখিয়ে তো কালনাগিনী ভাবিতে লাগিল।
এ সুন্দর লখাই আমি কেমনে ডংশিব ।।
দেবীর যে আজ্ঞা কভু খণ্ডান না জায়।
কালসর্প হয়ে লক্ষিনদারের ডংশিল পায় ।।
হাদেরে চাড়ালে বিষ তার আদ্যের বাখানি।
হিংসার কথা শুনে তোরে বলী ।।
শনির দৃষ্টিতে গনেশের মুণ্ড গেল চলে।
যেমন কোলেতে সন্তান লয়ে সনেকা ভেসেছিল জলে ।।
এক ২ করে ছয়পুত্র ভাসিল জলে।
কোলেতে বসিয়া মাগো করগো কল্যাণ।
উপলোকের জীবন দাও বাচাও লক্ষিণদার ।।
সোনার বর্ণ লখাই আমার বর্ণ হইল কালো।
কি সাপে ডংশিল লখাই তাই আমারে বল ।।
ডান হাতে খুঙ্গুরী পুথী বাম হাতে বাতি।
ঔষধ তুলিতে চায় ইসুপর রাতি ।।
ঔষধ তুলিয়া রানী ঝাড়ে বাধে বোঝা।
চাম্পাই নগরে না মিলিল ওঝা ।।
আরে ২ নেহেড়ে গো হোড়ে গাজরের বিষ ঘা মুখেতে আয়
ঘা মুখেতে এসে বিষ ভষ্ম হয়ে যা।
নেই বিষ হরির আজ্ঞে ।।

মন্ত্রের 'উপলোকের' স্থানে যে ব্যক্তিকে সর্পদংশন করেছে, সেই ব্যক্তির নাম

করতে হবে। এখানে লিপিকর প্রমাদে 'উনলোকের' স্থানে 'উপলোকের' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

মনসাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত মঙ্গলকাব্য ছাড়া অপ্রচলিত হয়ে পড়া বেশ কিছু মঙ্গলকাব্য থাকাটা বিচিত্র নয়। সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনী থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি স্থানীয় দুখে সাহার কাহিনী নিয়ে বোনাবিবি জোহুরানামা তৈরী হয়েছে। তেমনি বিচিত্র কাহিনীর যোগাযোগে মনসার মঙ্গলকাব্য রচিত হওয়াও বিচিত্র নয়। আলোচ্য মন্ত্রটি থেকে সে রকম কিছু কিছু ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

মন্ত্রটিতে ধন্বন্তরী-জন্মকাহিনী যেভাবে বলা হয়েছে সেটি মনসামঙ্গলের সঙ্গে মেলে না। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ধন্বন্তরী হয়েছেন শঙ্কর গারুড়ী। তিনি মনসার সহচরী নেতার শিষ্য। পদ্মা দেখলেন, শঙ্কর গারুড়ী জীবিত থাকতে চাঁদ সদাগরকে জব্দ করা সম্ভব নয়। তিনি নেতার সাহায্য চাইলেন। নেতা জানালেন, শঙ্কর তাঁর শিষ্য, সুতরাং তাকে বধ করার উপায় তিনি বলবেন না। পদ্মাকে তিনি পরামর্শ দিলেন, পদ্মা যেন শঙ্করের স্ত্রী কমলার কাছ থেকে কৌশলে শঙ্করের দুর্বল স্থানটি জেনে নেয়। পদ্মা সেই কৌশলই অবলম্বন করলেন। —অন্য একটি ঝাড়ান মন্ত্রে দেখি. "পদ্মা মা আইল তার বধিতে ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরী বধে তোমার হইল অপযশ।" —ধন্বন্তরী বধে অপযশ কেন? মনসামঙ্গলে মনসার কোপে যাদের মৃত্যু ঘটেছে—তার মধ্যে কিন্তু ধন্বন্তরীই পুনর্জীবন লাভ করেন নি। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, মনসা এবং 'নেতো'—একই দেবতার দুইরূপ। একটি মন্ত্রের মধ্যে সে কথার সমর্থন মেলে। "নেতপদ্মা নারী নাম শুনিলে সাপের বিষ ভস্ম হয়ে যায়।" —দুজনেই শিবের কন্যা এবং দুজনেই অযোনী সম্ভবা। দুজনের সঙ্গেই ধন্বন্তরীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

দুর্গাবরের মনসাকাব্যের বিবরণে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "দুর্গাবরের অংশে চান্দোর নগরী চম্পায়লী গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। সন্তানহীন বলিয়া চাঁদোর ও পত্নী সোনেকার মনে সুখ নাই। একদিন বর্ষাকালে উত্তরদেশ হইতে ধন্বন্তরী ওঝা আসিয়া চাঁদোর বাড়ীর দরজায় ঢাক পিটাইল। শুনিয়া সোনেকা বাহির হইয়া আসিল। ধন্বন্তরী তাহাকে দেবী মনসার পূজা বাতলাইয়া দিল। (এ মনসা সলিল দেবী, যেন গঙ্গাই।)"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন—শঙ্কর গারুড়ীর উপাখ্যানটি

একটি স্বতন্ত্র ধারা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান প্রয়োজন।

মনে হয় দীর্ঘদিনের ঘসামাজার মধ্যদিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনী তার বর্তমান রূপটি ধারণ করেছিল। তা না হলে 'কোলেতে সন্তান লয়ে সনেকা ভেসেছিল জলে'—বলা হল কেন? সুপ্রচলিত কাহিনীর মধ্যে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না। লখীন্দরের মৃত্যুর পর

ডানহাতে খুঙ্গুরী পুথী বামহাতে বাতী।
ঔষধ তুলিতে চায় ইসুপর (দ্বিপ্রহর?) রাতি ॥

—এ হেন বর্ণনা কোথাও নেই।

প্রচলিত কাহিনীতে জানি, রাত্রি প্রভাতেই সনেকা পুত্রের সর্পদংশনের কথা জানতে পারলেন। এ ছাড়া খুঙ্গুরি পুঁথি নিয়ে সনেকার চলা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। তবে কি চাঁদ উপাখ্যানে প্রথমদিকে সনেকার ভূমিকাই বড় ছিল? বেহুলা কি পরবর্তী কালের সংযোজন? মন্ত্রটির প্রথমে সীতার সতীত্ব গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করা হল। কিন্তু কঠোর তপস্যায় যে বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন—মন্ত্রটিতে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকল না। অন্যান্য মন্ত্রগুলির মধ্যে একবার বন্দনা মন্ত্রে বেহুলার নাম উল্লিখিত। আর একবার 'মনসা' স্থানে 'বেহুলা' শব্দটি ব্যবহৃত। এই ভ্রান্তি কেন? নাকি এটিই সঠিক প্রয়োগ?

॥ ৩ ॥

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে কি পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এযাবৎকাল এইসব মঙ্গল কাব্যকাহিনীর মানব-অংশের গুরুত্বই সমধিক বলে বিবেচিত হয়েছে। তাও আবার এইসব কাহিনীর এবং কাহিনীর চরিত্রগুলির বিচার করা হয়েছে এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। চাঁদসদাগরের দৃঢ়তা, বেহুলার সঙ্কল্প ও কষ্টস্বীকার ইত্যাদির মহত্ত্বকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব বিভিন্ন সামাজিক রীতি অনুষ্ঠান থেকে। এই কাহিনীগুলি গান করা হত বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং রীতিঅনুষ্ঠানগুলির পক্ষে তা ছিল আবশ্যিক। এই ধরণের রীতি অনুষ্ঠান এবং তার আনুষঙ্গিক লোকপুরাণের মধ্যে সুদীর্ঘকালের ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে বাধ্য। পঞ্চদশ শতকে বা তারও আগে উচ্চকোটি সমাজের ব্যক্তিরা যখন মনসাপালা 'রচনা' করতে

শুরু করেছেন, তখনও লোকসমাজে এই রীতি অনুষ্ঠানটি খুব একটা কমজোরী বলে মনে হয় না। অনুসন্ধানী গবেষকরা সকলেই মোটামুটি তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চান নি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করার সময় তাঁরা যে সব উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন, তার মধ্যে লৌকিক-জীবন নির্ভর উপাদান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তার ফলে সেই ইতিহাস স্থির চিত্রে পর্যবসিত। সেই চিত্রের এক কোণে দারিদ্র-পীড়িত, হতাশা জর্জর লোকজীবন কোনমতে সামান্য একটু স্থান পেয়েছে। তা থেকে এমন কোনও সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না, যা দিয়ে পঞ্চদশ শতকে বা তার আগে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হবার কারণটি ব্যাখ্যা করা যায়। 'বাংলার নব জাগৃতি' গ্রন্থের 'ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতি সমন্বয়' প্রবন্ধে বিনয় ঘোষ ১৮৯১ এর লোকগণনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, —"ভারতে মোট মুসলমান সংখ্যা তখন ছিল ৫ কোটি, তার মধ্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরেরই প্রায় অর্ধেক এবং খাস বাংলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ।" ছশ বছরে এই পরিবর্তন কেমন ভাবে সম্ভব হ'ল—তারও কোনও সূত্র ঐতিহাসিকদের রচনায় অনুপস্থিত থাকল।

এ বিষয়ে কিছু সম্ভাব্য অনুমান-প্রকল্প (hypothesis) উপস্থিত করা হল।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে স্বীকৃত হয়েছে যে বহু জাতির মিশ্রনে বাঙালী জাতির উদ্ভব। বর্তমানে তাদের প্রায় সকলকেই হিন্দু বা মুসলিম ধর্মের আওতার মধ্যে ধরা হলেও বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকা বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি তাদের সমান্তরাল সমাজব্যবস্থা চালু রেখেছে। তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং সমাজ স্বাতন্ত্র্য এখনও অনেকটা বজায় আছে। ব্রিটিশ-শাসনের সুদীর্ঘকালের 'রোলার' এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে লোপ করতে পারেনি। লোক-জীবনের কোন শক্তি তাদের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে—তার অনুসন্ধান অবশ্য প্রয়োজন। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় শাসন সমাজের গভীরতর অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তা সত্ত্বেও এই শাসনের সময়ে লক্ষ্য করা যায়—প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রশাসন খুব কড়াকড়ি রকমের ছিল না। ব্রিটিশ শাসন তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এইসব অঞ্চলে কড়াকড়ি না করার এবং সামাজিক ব্যাপারে খুব বেশি নাক না গলানোর নীতি গ্রহণ করে-ছিল। সামাজিক ব্যপারে ব্রিটিশের প্রতিনিধি ছিল জমিদার শ্রেণী। কিন্তু জমিদারী শাসনের তীব্রতার মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায় যে তার পুরাতন স্বাতন্ত্র্য

বজায় রাখতে পেরেছিল—তার কারণ সেই ঐতিহ্য সে পেয়েছিল অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে।

ব্রিটিশের আগে মধ্যযুগে মুসলমান নরপতিদের প্রশাসন কম বিস্তৃত ছিল। আর প্রাচীন যুগে তার বিস্তার রীতিমত কম ছিল বলে অনুমান করা চলে। সেই যুগে লোক-জীবনের বৃহদংশই ইতিহাসে উল্লিখিত রাজাদের প্রশাসনিক আওতার বাইরে তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, নিজস্ব প্রশাসন নিয়ে জীবন যাত্রায় অগ্রসর হয়েছে। সেই জীবনে ট্রাইবের বৈশিষ্ট্যই বেশি হয়ে থেকেছে। এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তারই রেশ বেশ কিছু লক্ষ্য করা যায় এবং লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ট্রাইবগুলির প্রভাব বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। কিভাবে এর প্রভাব পড়তে পারে—তার কারণ নির্দেশ করা হয়নি।

প্রাচীন ভারতে যে ফিউডাল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ শাসনে কখনই বিপুল এলাকাকে রাখা সম্ভব ছিল না। প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকাকে প্রশাসনিক দৃঢ়জালে আবদ্ধ রাখা হত। আশে পাশের ট্রাইবগুলির প্রভাবে যাতে বিদ্রোহ না দেখা দেয়, সেজন্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কিভাবে ট্রাইবগুলিকে ধ্বংস করতে হবে—তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকা থেকে সীমাবদ্ধ রাজস্বের সুযোগ এবং সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে করদ রাজ্য সৃষ্টি করা ছিল অপরিহার্য। চূড়ান্ত কঠোর শোষণ সম্ভব ছিল না, ছিল না কঠোর দাসপ্রথা গড়ে তোলার অবকাশ। কেননা বিশাল এই ভূখণ্ডে পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্র ছিল প্রচুর। নিজের অস্তিত্বের তাগিদেই তাই সাম্রাজ্যের কলেবর বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন ঘটত। বিপরীত দিকে, বিভিন্ন ট্রাইব তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বাধীনভাবে নতুনতর সমাজবিকাশের সুযোগ পেয়েছে। নতুন নতুন অখ্যাত রাজারা হতিহাসে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এমনই সব ট্রাইবের বিকাশের ফলে। আর বিশাল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যগুলিও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বার বার। বিশাল সাম্রাজ্য নিজের ভার রক্ষা করতে পারেনি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে বার বার বিদ্রোহ ঘটেছে। এই কেন্দ্রিকরণ এব বিকেন্দ্রিভূত হবার প্রবণতাই ভারত ইতিহাসের প্রাচীন পর্বের মূলদ্বন্দ্বের স্বরূপ হয়ে থেকেছে। তার ফলে স্বতন্ত্র বিকাশের অবকাশ থেকে গেছে অনেক বেশি।

ভারত ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে। গুপ্ত-

সাম্রাজ্য বাংলায় কতদূর প্রসারিত হয়েছিল—তা জানা যায় নি। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ ক্রিয়াটি এই প্রত্যন্ত প্রদেশে যে অত্যন্ত বেশি রকমে দেখা দেবে—এটাই স্বাভাবিক। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মা কেউই এ অঞ্চলে শাসন বিস্তার করতে পারেন নি। —দীর্ঘকাল ধরে কোনও কেন্দ্রিয় শাসন যে এখানে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি—তার কারণ ট্রাইব থেকে ব্যক্তিসম্পত্তির সমাজ-বিকশিত হবার জন্য সময় লেগেছে। ক্রমাগত দ্বন্দ্ব এবং পশ্চাদপসরণ এর বড কারণ। সে যুগের কোনও রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রবক্তা এই সময় কালটি মাৎস্য ন্যায়ের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এ যুগের ঐতিহাসিকরাও শব্দটির মোহে আচ্ছন্ন হয়েছেন বলে মনে হয়।

এই সময়ে ট্রাইবগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে—পশ্চাদপসরণ ঘটেছে, ঘটেছে কৃষির উন্নতি এবং ব্যক্তি সম্পত্তির বিকাশ এবং তার ফলে দেখা দিয়েছে অন্যতব সমাজব্যবস্থা। জরৎকারু বা বচাই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পুনর্জীবিত হলেও লখীন্দরকে ছয়মাস পরে পুনর্জীবিত হতে দেখা যাচ্ছে। ঘটনাটি নিতান্তই নিরর্থক নয়। সম্পূর্ণরূপে কেউ কাউকে গ্রাস করতে পাবেনি। কেননা গঠনোন্মুখ এই ব-দ্বীপ এলাকায় পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্র ছিল প্রচুর। নতুন নতুন এলাকায় জনপদ গডে তুলতে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি গডে তোলার এবং সমাজ বিকাশের নতুন ধাপে অগ্রসর হবার অবকাশ ছিল। কেন না পলিমাটির এই দেশে মাটিতে সোনা ফলত।

একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। বরেন্দ্রভূমির পুণ্ড্রবর্ধন একসময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে পুণ্ড্রবর্ধন নামকরনটি সম্ভবত পৌণ্ড্র জন-গোষ্ঠীর নাম অনুসারেই হয়েছে। স্বভাবতই অনুমান করা চলে এই এলাকায় একসময় পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে অতুল সুর মশাই যখন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিকপরিচয়'এ বাংলার একটি সুন্দর নৃতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা করেছেন, তখন সেই মানচিত্র অনুধাবন কালে এই এলাকায় পৌণ্ড্রদের অনুপস্থিতি সহজেই নজরে পডে। তঁার মতানুসারে যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য, সেই এলাকাটি সেই গোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। কিন্তু সে কথা মেনে নিলে তাঁর মানচিত্র অনুসারে দক্ষিণবঙ্গ বা প্রাচীন বঙ্গালই পৌণ্ড্রদের আদি বাসভূমি বলে চিহ্নিত করতে হয়। সে ক্ষেত্রে পুণ্ড্রবর্ধন নামটিকে পৌণ্ড্রদের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। আব পশ্চাদপসরণের অনুমান

প্রকল্পটি মেনে নিলে বলা যায়, সুদূর অতীতে কোনও একসময় পৌণ্ড্রা তাদের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করে 'বঙ্গাল' এলাকায় সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় হিউ এন সাঙের বিবরণ অনুসরণ করে 'বাঙালীর ইতিহাস' —আদিপর্বে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, সম্ভবত পদ্মা তখন ভয়ঙ্করী প্রমত্তা ছিল না। এক জনগোষ্ঠীর পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে তা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল। তাঁরা কিছুটা পূর্বদিকে বাস করতেন। (এই হিসাব দেশ বিভাগের আগেকার।) কিন্তু প্রাচীন যুগে বোধ হয় এত পূর্বদিকে তাঁদের বাস ছিল না। পৌণ্ড্রদের আগমনের ফলেই তাঁদের পূব দিকে সরে যেতে হয়েছিল। এই অঞ্চলের মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং বিকাশ যে অতীতে স্বীকৃত ছিল এঁদের প্রতিপক্ষদের উক্তি থেকে তা অনুমান করার সুযোগ আছে। সরহপাদের চর্যায় (৩৯ নং চর্যা) আছে, 'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গল তোহার বিণানা।' অর্থাৎ—'বঙ্গদেশ থেকে জায়া গ্রহণ করার ফলে তোর বিজ্ঞান নষ্ট হল।' ভুসুকুপাদের চর্যাতেও (৪৯ নং চর্যা) পাই, 'আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী।' অর্থাৎ, 'ভুসুকু আজ বাঙালী হলাম। চণ্ডালীকে নিজ ঘরনী করলাম।' বঙ্গাল দেশ সম্পর্কে এইসব উক্তি থেকে খুব একটা শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায় না। বরং তাদের সংস্পর্শে নিজের বিজ্ঞান নষ্ট হয়—এই উক্তি থেকে উক্ত জনপদবাসীর স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এলাকাটিতে চণ্ডালদের বাস যে কত প্রাচীন, তারও সাক্ষ্য পাওয়া গেল।

উচ্চবর্গীয় ফিউডাল প্রথা (কোশাম্বী বর্ণিত feudalism from above. যার বৈশিষ্ট্য —নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার) ধর্মপাল এবং দেবপালের সময়ে বাংলা থেকেই কিছুটা আবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু পালবংশের সূত্রপাত যাকে কেন্দ্র করে, সেই গোপাল ছিলেন নির্বাচিত নেতা বা রাজা। সম্ভবত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারাই ট্রাইব প্রথা ভেঙে এই রাজা নির্বাচন করেছিলেন। আবার এই নির্বাচনের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় ট্রাইব প্রথার রেশ। যে ভাবেই হোক, গোষ্ঠীগুলির ট্রাইব মনোভাবকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন ধর্মপাল এবং দেবপাল। কিন্তু তাঁদের অধিকার বাংলার অভ্যন্তরে কতদূর বিস্তৃত ছিল, সে সন্দেহ থেকেই যায়। পরবর্তীকালে বিকেন্দ্রিকরণের ধাক্কা শুরু হতে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, দিব্যক, ভীম কর্তৃক রাজক্ষমতা দখল এই গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের

কথাকে, 'ইতিহাসের রাজাদের' শাসনের স্বল্প বিস্তারকে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। রামপাল 'নিজস্ব' এলাকা কৈবর্তদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য যা করেছিলেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি "প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র অর্থদান করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। রামচরিতে এইসব রাজা সামন্তদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে তদানীন্তন বাঙলা ও বিহারের রাস্ট্রতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" (রাজবৃত্ত, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব) এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য -কেই তুলে ধরে। সেন রাজাদের আমলের উচ্চকোটির মানুষদের রক্ষণশীলতা, আত্মরক্ষার যে প্রয়াস, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রাণপন প্রচেষ্টা—এসব কিছু অন্যতর গোষ্ঠীর নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে না, বরং বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে।

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধ-জৈনধর্মের উপর। এই ধর্মগুলি যে বাংলায় তান্ত্রিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল—সে কথাও নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এই ধর্মগুলি বাঙালী ধর্মচেতনার প্রতিনিধি হতে পারে না। বৌদ্ধ-জৈনধর্ম্ম অবলুপ্ত প্রায়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লৌকিক দেব-দেবী নির্ভর এবং জনসংখ্যার বৃহদংশ মুসলীম ধর্ম্মগ্রহণ করেছে—ঐতিহাসিকদের দেওয়া কোন সূত্রই এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।

হলায়ুধ প্রভৃতি যতই যজ্ঞের ধূমে গৃহে পরিপূর্ণ করুন, সেন আমলের আগে আমরা পাই না। পরবর্তীকালেও জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন এরকমের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ কেউ যতই মেতে থাকুন না কেন, বাংলার মাটিতে তা কোনও দিনই শিকড় গাড়তে পারেনি। পাল রাজারা তো কোনধর্ম্মকে রাজধর্ম করবেন তা স্থিরই করতে পারেন নি। প্রথম দিকের পালরাজারা দেখেছিলেন বৌদ্ধধর্মের গৌরব। কিন্তু রাজশক্তিকে সমর্থনের ক্ষমতা এই ধর্মের কমে এসেছিল। রক্ষণ-শীলতা আরও বেশী করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পাল রাজাদের দ্বিধা ছিল— কোন ধর্মকে বিশেষ করে আঁকড়ে ধরবেন, বৌদ্ধধর্ম না ব্রাহ্মণ্যধর্ম। দেখা যায়, দুটি ধর্মকেই তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই দ্বিধাকে উদার মনোভাব বলে উচ্ছ্বসিত হবার কোনও অবকাশ নেই। সেন রাজাদের বেলায় দ্বিধার

কোনও সুযোগ ছিল না। রক্ষণশীলতার বর্ম ছাড়া তাঁরা অগ্রসর হতে পারতেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী পেশ করেছেন। কিন্তু লোকসমাজে অন্যতর ধর্ম্মচেতনা কাজ করেছে। গোষ্ঠীমনোভাব, ট্রাইব-চেতনা তাঁদের ধর্মীয় আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ধর্মের (religion) চেয়ে রীতি-অনুষ্ঠান (ritual) ছিল সেযুগের লোকজীবনের বড় আশ্রয়। তার ফলে আজও 'গ্রাম্য' দেব-দেবীর এত বেশি প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবশেষ কে তারই আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। লোকজীবনের ইতিহাস চর্চায় এই লোকধর্মের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান তাই একান্ত প্রয়োজন। আর সেজন্যে বর্তমানের প্রচলিত রীতি অনুষ্ঠানের অবশেষগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করে উজান ঠেলে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন।

সাহিত্যের ভাষা হিসাবে সেযুগে রাজানুগৃহীত ব্যক্তিরা সংস্কৃত এবং অবহট্‌ঠ ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। লোকজীবনে যে সমস্ত রীতি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গান বা কাহিনী প্রচলিত ছিল, তার লিখিত রূপের কোনও প্রয়োজন ছিল না। যুগে যুগে তার সঙ্গে নতুনতর গান এবং কাহিনী যুক্ত হয়ে বিরাট ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। সেখানেই নিহিত থেকেছে তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি। তার লিখিত রূপের প্রয়োজন পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। ততদিনে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারক রাজন্যবর্গের বিলাস বৈভবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সেই সংস্কৃতির উপরতলার ঢেউ মিলিয়ে যাবার পর রাজানুকূল্যের অভাবে বাঙালীর সংস্কৃত এবং অবহট্‌ঠ ভাষার কৃত্রিম রচনাগুলিও বন্ধ। কেউ কেউ খেদের সঙ্গে এই যুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত রচনার অভাব ছিল বলে সমষ্টিজীবনে সৃষ্টির অবকাশ ছিল না—এ দাবী করা চলে না। সে সময়ে বাংলার লোকজীবনে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি চলছে—এ কথা মনে করলে ভুল হবে। সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আলোচনা করতে হবে। 'অন্ধকার যুগ' ছিল কিনা— এ প্রশ্নের চেয়েও জরুরী প্রশ্ন—কেন পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েই কানা হরিদত্ত বা বিজয়গুপ্ত অথবা বিপ্রদাস পিপিলাই মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করলেন।

(মনসামঙ্গলকাব্যের প্রথম কবি সম্পর্কে পণ্ডিত মহলের যে বিতর্ক সে বিষয়ে দুএকটি কথা বলে রাখা ভাল। ডঃ সুকুমার সেন বিপ্রদাস পিপিলাইকেই প্রথম কবি বলে উল্লেখ করে তাঁর কাব্য অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।

বিজয়গুপ্তের কাব্য সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কথা তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঠিক উল্টোটাই দাবী করেছেন। সন তারিখযুক্ত প্রাচীনতম মনসামঙ্গল কাব্য হিসাবে বিজয়গুপ্তের কাব্যকে মেনে নিয়ে তিনি বিপ্রদাস পিপিলাইএর কাব্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে কানাহরিদত্তের রচনা বিজয়গুপ্তের রচনার চেয়ে একশবছর বেশি পুরোনো হওয়াটাই সম্ভব। আবার নারায়ণদেবের বংশলতিকা ধরে তিনি দেখিয়েছেন—নারায়ণদেবও পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি এবং বিজয়গুপ্তের চেয়েও পুরোনো তাঁর রচনা। ডঃ সেন অবশ্য কানা হরিদত্ত এবং নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলে দাবী করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল—বিপ্রদাস পিপিলাইএর পুঁথি পাওয়া গেছে চব্বিশ পরগণায়। বিজয়গুপ্ত বাখরগঞ্জের মানুষ। ডঃ ভট্টাচার্যের অনুমান কানা হরিদত্তও তাই। আর নারায়ণদেবের পূর্বপুরুষের নিবাস রাঢ় দেশ হলেও তিনি মৈমনসিংএর লোক। সময়ের হিসেব নিয়ে তর্কবিতর্ক হলেও স্থানের মানচিত্র নিয়ে মতানৈক্য নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় এলাকার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য মুকুন্দরামের অনেক পরবর্তী রচনা এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যগুলি (তন্ত্রবিভূতির কাব্য ছাড়া) অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। মৈমনসিং-এর আর একজন বিখ্যাত কবি দ্বিজবংশী বিজয়গুপ্তের প্রায় এক শতাব্দী পরে কাব্য রচনা করেছিলেন এবং মৈমনসিংএর ঐতিহ্য তাঁকে পুষ্ট করেছে। তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতী সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছিলেন। বিপ্রদাস পিপিলাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। মনসামাহাত্ম্য তাঁর যুগে এমনভাবে ব্রাহ্মণকুলে স্বীকৃত হয়েছিল কিনা—সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের শেষ সুক্তটিতে সকলে একসঙ্গে চলার, সকলের একমন্ত্র হবার কামনা উক্ত হয়েছে। সন্দেহ করা হয়, এই সুক্ত রচনাকালে সকলের একসঙ্গে চলা, সকলের একমন্ত্র হওয়া অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলির ট্রাইব-বৈশিষ্ট্যগুলি তখন নষ্ট হবার পথে। তার ফলে এমন একটি সুক্ত রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী কি তার কিছু আগে মনসামঙ্গলের লিখিতরূপ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাংলার লোকসমাজের ট্রাইব-বৈশিষ্ট গুলির বেশ কিছু নষ্ট হতে চলেছে—এ অনুমান ভুল হবে না। কিন্তু তখনও গায়েনের ভূমিকা এমন কিছু কম নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল, ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল—এসবগুলি

সম্পর্কে এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কোনও কবির রচনাকাল নির্ণয় করে তাঁর কাব্যে কেবলমাত্র কাব্য-রচনাকালের সমাজচিত্রই চিত্রিত হয়েছে—এই অনুমান সঠিক হতে পারেনা। সেই সময়ের চিত্র কিছু কিছু চিত্রিত হলেও এইসব কাব্যে বেশি পরিমাণে ধরা পড়বে তার অনেক আগের ইতিবৃত্ত। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে সেই ধরণের কিছু চিত্র উদ্ধার করার চেষ্টার আগে কেন পঞ্চদশ শতাব্দীই মনসামঙ্গল কাব্যের জন্মকাল হল—সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের প্রশাসন আগের চেয়ে আরও বিস্তারলাভ করেছিল। বহু জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় মুসলীম ধর্ম গ্রহণ করেছিল—এই অনুমান-প্রকল্প দিয়েই এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। মুসলমান ধর্মের সমানাধিকার, রাজশক্তির ছত্রছায়া এবং বিরোধীশক্তির প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা—এইসব কারণেই বহু জনগোষ্ঠী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। (মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে বর্তমান লেখকের সীমিত যে ধারণা তাতে মনে হয় এই ধর্মের মধ্যে ট্রাইব সুলভ সংহতির দিকটাই বেশি।) অস্ত্রের জোরে বহিরাগত 'তুরুক'দের পক্ষে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ সম্ভব ছিল না। ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহলে এই ধর্ম এমন ব্যাপকতা লাভ করতে পারত। বাংলার মুসলমান নৃপতিদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, বাঙালী সংস্কৃতিকে উৎসাহদান লক্ষ্যণীয়। আর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, বাংলার লোক-সংস্কৃতির অনেক বেশি রক্ষিত হয়েছে বাঙালী মুসলমান সমাজে।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে যে জনগোষ্ঠী মুসলমান ধর্মের আশ্রয় নেয়নি, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরোধ দেখা দিলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষেরা মুসলমান বিরোধী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। এই দ্বন্দ্বে অন্তত একটি ক্ষেত্রে মনসা-পূজারী জনগোষ্ঠী জয়লাভ করে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিল। এই দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে মনসামঙ্গলের কাব্যরূপ। মনসা পূজারীদের সংস্কৃতির ধারা হয়ত মনসাপূজার ক্ষীণধারার মধ্যে টিকে থাকত। হয়ত বা তাও হারিয়ে যেত অন্য কোনও দেবীর সঙ্গে মিশে গিয়ে। জীবনধারার নানা সংঘাতে এমনই ঘটেছে নানা দেবদেবীর ক্ষেত্রে। কিন্তু মধ্যযুগে দুই জনগোষ্ঠীর সংঘাত মনসা পূজারীদের সংস্কৃতি ধারাতে যে নতুন বেগ সৃষ্টি করল—তা থেকেই গড়ে উঠল মনসামঙ্গলের লিখিতরূপ। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসটি ধরে রাখা হয়েছে হাসন হোসেন বা কাজীর পালার মধ্যে।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এই হাসান হোসেন পালাটি একটি বড অংশ জুড়ে রয়েছে।

"দক্ষিণে হোসেন হাটি গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥

কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালী রীত॥"

এদের মধ্যে 'তকাই নামে মোল্লা কেতাব ভাল জানে।' এই তকাই একদিন গঙ্গাতীরে যাবার সময় ঝড বাদলে বিপাকে পড়ে বনের মধ্যে ঘর দেখে সেখানে আশ্রয় নিতে গেল। সেখানে রাখালেরা মনসাপূজা করত।

"স্বভাবে রাখাল জাতি মনে বড রঙ্গ।
ঢাক ঢোল বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ॥
ঘরমধ্যে ঘট গোটা সারি সারি সাজে।"

মনসার পূজো দেখে তকাই ক্ষেপে গেল। কিন্তু রাখালদের সঙ্গে একক লডাইয়ে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। বহুকষ্টে মুক্তিলাভ করে—

"কাজীরা দুইভাই একত্র বসিছে।
কান্দিতে কান্দিতে মোল্লা গেল তার কাছে॥"

সব শুনে কাজীরাও ক্ষেপে উঠল।

"হারামজাদ হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥"

অধিকার বিস্তারের নমুনাটি এখানে লক্ষণীয়। যাই হোক, সাজসজ্জা করে হাসন হোসেন এই রাখালদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। যাত্রাকালে হোসেনের মা নিষেধ করল।

"সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম্মফলে।
বিবাহ করিল তারে ধরিয়া আনি বলে।
হিন্দুর দেবতা বুডি ভাল মত জানে।"

কিন্তু তার নিষেধে কেউ কর্ণপাত করল না, অভিযান শুরু হল। মনসার ঘর ভেঙ্গে তার ভিটের মাটি কেটে ফেলা হল। তাড়া করে সব রাখালদের ধরে আনা হল। আর তারপরই শুরু হল মনসার রোষপর্ব। 'বিঘাতিয়ার' আক্রমণে জোলাপল্লী উৎখাত হল। আক্রমণ শুরু হল হোসেন হাটিতে।

"নাগ ফেরে ঘরে ঘরে যারে খায় সেই মরে
হোসেন হাটি হৈল ছারখার।"

কাজীরা দুইভাই কোনমতে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করল।

"মায়া পাতিয়া নাগ লুকাইল তখন।
জল হইতে দুইভাই উঠিল তখন॥
জল হইতে উঠি কাজি ভাবে অপমান।
রাখাল সঙ্গে বাদ করি হারাইলাম পরাণ॥
এক গোটা ভূত খাইল বিষত প্রমাণ।
সেই করিল মোর এত অপমান॥
এখনই পূজিব পদ্মা বিলম্ব নাহি আর।
কার ঠাঁই পুছিব মুই পূজার সমাচার॥"

এরপর পূজাপদ্ধতি জেনে দুইভাই সাড়ম্বরে মনসার পূজো করল।

"খই দই রচনা আছিল ঠাঁই ঠাঁই।
ভক্তিভাবে পূজা করে বিষহরি আই॥
মহিষ ছাগল আনি ভরিলেক বাড়ী।
নাপিত আনি কাজি মুড়িলেক দাড়ি॥
প্রথমে পূজিল ঘট ভক্তি করি আজি।
ব্রাহ্মণে পূজে ঘট প্রণাম করে কাজি॥"

এইভাবে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দুই সম্প্রদায় আরও কাছাকাছি আসতে পারল।

যে 'বিঘাতিয়া' সাপের কথা বলা হ'ল, তারা কি আক্রমণকারী মনসা-পূজারী? আক্রমণের রীতি দেখে সে কথাই মনে হয়। বিজয়গুপ্তের আমলেই ঘটনাটি অনেক পুরোনো ইতিহাস হয়ে গেছে। ততদিনে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারকরা ট্রাইবাল সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নেবার মত করেছে। পূজারী হিসাবে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি থেকেই তা বোঝা যায়। আর তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আক্রমণ-কারীরা সাপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

মনসামঙ্গলকাব্যের নবতম রূপের পিছনে এই হল দ্বন্দ্ব-ইতিহাসের পটভূমি। প্রশ্ন জাগে, মনসাপূজারীরা কি গোপালক জাতি ছিল? রাখালবালকরা ঘর তুলে মনসার ঘট পূজো করছিল বলে উল্লেখ আছে। শঙ্কর গারুড়ির শিষ্যদের কাছে মনসা গোয়ালিনী সেজে দই বিক্রি করেছিলেন। এ থেকে গোপ গোষ্ঠীর মধ্যে মনসার পূজো প্রচলিত থাকার কথা অনুমান করার সুযোগ আছে। তবু কিন্তু মনসাকে গোপগোষ্ঠীর দেবতা বলে মনে করা যায় না। সাপের ওঝাদের মন্ত্রগুলিতে দেখা যায় কালীয় সাপের বিষে কৃষ্ণের জর্জরিত হবার কথা, রাধার সর্পদংশনের কথা উল্লিখিত আছে স্বতন্ত্রভাবে। হয়ত রাষ্ট্রবিপাকের কোনও এক পর্যায়ে দুটি স্বতন্ত্রগোষ্ঠী খুব কাছাকাছি এসেছিল। হাসন হোসেন বা কাজির পালার আগেই রাখালদের মধ্যে মনসার পূজোর কথা বলা হয়েছে। প্রথমে রাখালরা মনসাকে পূজো করতে চায়নি। কিন্তু পরে মনসার আশ্রয় নিতে তারা বাধ্য হয়েছিল। বনের প্রান্তদেশে রাখালদের বা গোপসম্প্রদায়ের বাসস্থান থাকলেও মনসাপূজারীদের বাস ছিল সম্ভবত বনের আড়াল দেওয়া কোনও একটি স্থানে। প্রতাপাদিত্যের বাবা হরিরায় এমনভাবেই জঙ্গলের আড়াল নিয়ে নগর-পত্তন করেছিলেন বলে জানা যায়। এরকম রীতি আগেও প্রচলিত ছিল, এমন অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না। মনসাকে শিব বনবাসে দেবার পর সেখানে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে মনসা নতুন নগরপত্তন করিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

॥ ৪ ॥

মনসা মঙ্গলের 'দেবখণ্ড' সবচেয়ে উপেক্ষিত অংশ। সৃষ্টিকথা, দেবীদের পরস্পর সংঘর্ষ—ইত্যাদি কোনও ব্যাপারেই মঙ্গল কবিরা ব্রাহ্মণ্যপুরাণকে অনু-সরণ করেন নি। উচ্চকোটির প্রতিনিধি হিসাবে সংস্কৃতজ্ঞ অনেক কবিই সাদৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণ্যপুরাণ কাহিনী লোকপুরানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা। তার ফলে লোকজীবন থেকে খুব একটা আপত্তি ওঠেনি। এজন্যে কোনও লৌকিক দেবদেবীর লৌকিকত্ব দূর হয়ে যায় নি। সুতরাং মনসামঙ্গলের 'দেবখণ্ড' যার মধ্যে প্রাচীনতর ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে, তা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু সমালোচকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দেবখণ্ডকে পুরোপুরি আজগুবি বলেই বাতিল করে দিয়েছেন। চাঁদ-

বেনে-লক্ষীন্দর-বেহুলা কাহিনী যতই করুণরসের সৃষ্টি করুক—ঐতিহাসিদের কাছে দেবখণ্ডের গুরুত্ব বেশি।

মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কাব্যে সৃষ্টি-কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে নানা রকমের প্রভাব কাজ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু মনসার জন্ম সম্পর্কে সকলেই একটি বিষয়ে একমত —মনসা শিবের কন্যা এবং তিনি অযোনী-সম্ভবা। তা থেকে মনে হয়, মনসাই ছিলেন আদিদেবী। মনসা পূজারী গোষ্ঠীর সঙ্গে শিবপূজারী গোষ্ঠীর সংঘর্ষের কাহিনীই সবচেয়ে প্রাচীন সংঘর্ষ হিসেবে মনে রাখা হয়েছে। এই সংঘর্ষে কেউ কাউকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারেনি। বিবাহ —অর্থাৎ অবাধ মিশ্রণ—সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যখন এ ধরণের মিশ্রণ অস্বীকৃত হয়, তখন গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মোটামুটি নিঃসংশয় হওয়া যায়। শিব পূজারী গোষ্ঠীর হাতে একসময়ে কিছুটা বিপর্যস্ত হলেও মনসা-পূজারী গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়নি। আর সংগ্রাম করার পর দুই গোষ্ঠী কিছুটা কাছাকাছি এসেছিল। শিবও সবিশেষ শক্তিশালী বলে স্বীকৃত হলেন। তাঁকে পিতার অধিকার দেওয়া হল।

শিব-মনসা পিতাপুত্রী সম্পর্ক দেখে বোঝা যায়, কৃষি-ভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মনসাপূজারী গোষ্ঠী তখনও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যই বেশি ধরে রেখেছে। তখনও মনসা কৃষির দেবী নন—ট্রাইবের প্রজননের দেবী। কৃষি দেবী হিসাবে—তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে কিছু পরে।

একটি আপাত অসঙ্গতি থেকে এই শিব-মনসা সংঘর্ষের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় দেখি—শিবচণ্ডীর পুষ্পবনে বেড়াতে গেলেন। সেখানে কামার্ত হয়ে শিব 'শ্রীফল বৃক্ষে দিল কোল।' তারপর ঘটনার ধারা বেয়ে মনসা জন্ম নিলেন পাতালপুরে। এরপর পুষ্পবনে মনসাকে একাকিনী দেখে শিব মোহিত হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত মনসা শিবকে আত্মপরিচয় দিয়ে নিরস্ত করলেন। সমস্ত ঘটনাটি একদিনের কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটে গেল। বিজয়গুপ্তের মত কবি কি করে এই অসঙ্গতি মেনে নিলেন, তা বোঝা শক্ত। মঙ্গলকাব্য গান করা হত। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আপত্তি থাকলে গায়েনের পক্ষ থেকে নিশ্চয় সংশোধন করে নেওয়া হত। কিন্তু কি কবি কি গায়েন, কি শ্রোতা, কেউই এই আপাত অসঙ্গতির ব্যাপারে মাথা ঘামান নি। মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও ছিল না। প্রাচীনকালের এমন এক ঐতিহ্য এর মধ্যে নিহিত ছিল—যার সম্পর্কে প্রশ্নই ওঠে নি।

মনসা-চণ্ডী দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গটি দেবখণ্ডের অন্যতম অংশ। শিব মনসাকে ঘরে এনে চণ্ডীর ভয়ে লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে চণ্ডী যখন মনসাকে আবিষ্কার করলেন তখন

"খল খল হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
চোপড়ে চাপড় মারে দেয় চুন কালী॥
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর॥
বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে জগতের মাতা॥"

গঙ্গা এলেন মনসার সমর্থনে। কিন্তু চণ্ডীর সঙ্গে কলহে শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান নিয়ে তিনি চলে গেলেন। নিরুপায় মনসা তখন

"চণ্ডীর প্রহার আর সহিতে না পারি।
দেবমূর্তি এড়িয়া পদ্মা নাগমূর্তি ধরি॥
সংসার সাক্ষী করে আপনার মনে।
পদ্মার নিকট ঘোনাইতে না পারে কোন জনে॥

অবশেষে

অতিকোপে পদ্মাবতী করে ধড়ফড়।
চণ্ডীর হৃদয়ে দিল বজ্রের কামড॥
পদ্মার কামড়ে চণ্ডীর প্রাণে লাগে ব্যথা।
উহু উহু করিয়া পড়ে কার্তিকের মাতা॥
বৈরী নিপাতিয়া পদ্মা নেহালে কৌতুকে।
কাল দন্ত উগারিয়া বিষ থুইল ঘা মুখে॥

এরপর শিব ফিরে এসে মনসাকে অনুরোধ করলেন চণ্ডীকে পুনর্জীবিত করতে। মনসাও সে অনুরোধ রক্ষা করলেন। পরবর্তীকালেও বিরোধ কম হল না। এই বিরোধে শিব কিন্তু চণ্ডীর পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং মনসাকে বনবাসে রেখে এলেন। সেই বনবাসে মনসার সহচরী হলেন নেতা। সেখানে বিশ্বকর্মার সহায়তায় মনসা গড়ে তুললেন নতুন জনপদ।

চণ্ডী শিবের পত্নী। এই চণ্ডীর সঙ্গে হিমালয় দুহিতা পার্বতীকে এক করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কালকেতু এবং ধনপতি উপাখ্যানের চণ্ডী অর্বাচীন জাত্‌কুলহীন এক দেবী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। চেষ্টা হয়েছে ওরাওঁদের দেবী চণ্ডীর সাথে তাঁকে এক করে দেখানোর। কিন্তু চণ্ডী উপাসক জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত। তীব্র সংঘর্ষ চণ্ডী উপাসক এবং মনসা উপাসক গোষ্ঠীকে কিছুটা কাছাকাছি এনেছিল। সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে মনসাপূজারী গোষ্ঠী জয়লাভ করেছিল। বর্ণনা তাই এখানে বিস্তৃত। কিন্তু সংঘর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ে মনসা-পূজারীরা পরাস্ত হ'ল। মনসার কান্নাকাটি থেকে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এই পরাজয়ের তিক্তস্মৃতি বিস্তারিতভাবে ধরে রাখা হয়নি। মনসা-পূজারীরা পশ্চাদপসরণ করে নতুন জনপদ গড়ে তুলল। শুরু হল মনসার নতুন রূপ। সম্ভবত এরপরই তিনি ধীরে ধীরে কৃষির দেবীতে রূপান্তরিত হলেন।

চণ্ডী গঙ্গা বিরোধটি তীব্র হয়ে না উঠলেও বিরোধটিকে উপেক্ষা করা যায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একজায়গায় মনসা এবং গঙ্গাদেবী এক হয়ে গেছেন। পদ্মা নামটি কি তাহলে পদ্মানদীর সঙ্গে যুক্ত? তাই যদি হয়, তাহলে সমস্ত লোকপুরাণটি এক নতুনতর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এব্যাপারে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। পদ্মবনে পদ্মার জন্ম। কোনও বিশেষ জলাশয়কে কি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পদ্মার সঙ্গে কি তার যোগাযোগ আছে?

সমুদ্রমন্থন কাহিনীটিও প্রায় সমস্ত কাব্যেই আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে বলা হয়েছে, শিবের আদেশে দ্বাদশ আদিত্য সমুদ্র শুষ্ক করে ফেলে। অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে, কামধেনুর বৎস মনুরথ ক্ষীরোদ সমুদ্র শুষে নেয়। মনে হয় কোনও এক খরার কঠোর স্মৃতি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে চাঁদের বাগান ধ্বংস হওয়া এবং চাঁদের ছয় পুত্রের ধ্বংস হওয়ার কাহিনীর মধ্যে এমন এক খরার ইতিহাস প্রতীকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। দুটি চিত্র একই খরার স্মৃতিচিত্র না হয়ে দুটি স্বতন্ত্র খরার চিত্ররূপও হতে পারে। অনুমান করা যায়, এরপর প্রবল বর্ষণই হয়েছিল। শিব এবং চন্দ্রধর (দুটি নামই সমার্থক। এমনও হতে পারে, দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর দুটি গোষ্ঠী আবার কাছাকাছি এসেছিল, তখন মনসাপূজারীরা সংঘর্ষে জয়লাভ করেছিল।) দুজনেই প্রবল বর্ষণে বিপদের মুখে পড়লেন। শিবকে বিষপান করে অচেতন হতে হল এবং চন্দ্রধর সাতালী পর্বতে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে লোহার বাসরঘরে তাঁর

পুত্র লখীন্দর সর্পদংশনে প্রাণ হারালেন। দুজনেই উদ্ধার পেল মনসার চেষ্টায়।

তনুসন্ধানের আরও একটি দিক আছে। মনসা-নেতা প্রসঙ্গ আগেই কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। নেতা চিত্রিত হয়েছেন মনসার সঙ্গিনী হিসাবে। নেতা মনসার মত তেমন সক্রিয় নন। তিনি যেন মনসার ছায়া। বাংলার থানগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই রকম দুটি করে দেবতা বহু জায়গায় জোড় বাঁধার মত করে রয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এর মধ্যে একটির সক্রিয়রূপ, অন্যটি কিছুটা নিষ্প্রভ। আধুনিক কালে দেবী হয়ে ওঠা বনবিবির সঙ্গেও আছেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় তাঁর ভাই সাজঙ্গুলী। ধন্বন্তরী প্রসঙ্গ আগেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে। মনসাকে সক্রিয় হয়ে ওঠার আগে ধন্বন্তরীকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় দেখা যায়, শীতলা এবং বনবিবি একই জায়গায় অবস্থান করছেন। এককালের অতি জাগ্রত দেবী শীতলা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। আর জঙ্গলগামী মানুষদের কাছে একমাত্র দেবী হয়ে উঠেছেন বনবিবি।

অন্যতর একটি সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। প্রতিটি জন-গোষ্ঠীর পক্ষে বর্ষকালপঞ্জী (calender) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা জড়িত হয়ে আছে। চন্দ্র অথবা সূর্যকে কেন্দ্র করে এই বর্ষকাল-পঞ্জী তৈরী হয়। বর্তমানে পঞ্জিকাতে এই দুই রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেই যুগে এই মিশ্রণ সম্ভব ছিল না। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ষকালপঞ্জী থাকাটাই ছিল রীতি।

শিব উপাসকরা চান্দ্রবর্ষপঞ্জী অনুসরণ করতেন, যার জন্য চন্দ্রধর নামটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শঙ্কর গারুড়ি—শঙ্কর নামটিও শিবের সমার্থক। এই শঙ্করের মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়েছে ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে মঙ্গলবারে। আবার বেহুলা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

বারমাসে বার ব্রত অমাবস্যা করে কত।

—এখানে অমাবস্যা কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ মনে করা যেতে পারে। অবশ্য বেহুলার আচরণের মধ্যে কিছুটা চান্দ্র এবং সৌরবর্ষকালপঞ্জীর মিশ্রণ ঘটেছে—বলা যেতে পারে। কিন্তু বিজয়ী মনসাপূজারীরা তাদের সৌর বর্ষপঞ্জীর কথাই বসিয়ে দিয়েছেন বেহুলার মুখে—এমন সন্দেহ করা অসঙ্গত হবে না। বেহুলা

যখন ছয়মাসের পথ অতিক্রম করেছেন—তখন সৌর বর্ষপঞ্জীর অনুসরণ করা হয়েছে। সূর্যের উত্তরায়ণ—,দক্ষিণায়ণের ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে বলে মনেহয়। এই সৌরবর্ষপঞ্জীর উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণই কি দেবতার দ্বৈতসত্তারূপে চিত্রিত হয়েছে।

॥ ৫ ॥

বাংলার প্রাচীনতম লোকপুরাণ সম্পর্কে নতুনতর কিছু আলোচনার সুযোগ যাতে সৃষ্টি হয়, তারই জন্য কিছু অনুমান-প্রকল্প এই আলোচনা উপস্থিত করা হল। অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন আরও নতুন দিক উন্মোচন করতে সাহায্য করবে, ইতিহাস সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই আলোচনার ইতি টানা হল।

লোকপুরাণের শিক্ষা

-বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলার অনেক ঘটনাই আছে আজকে আর ঘটবে না। অল্প কয়েকমাস আগে এ পৃথিবীতে এসেছে বলে মামাতো, পিস্‌তুতো, খুড়তুতো ভাই বা বোনকে দাদা বা দিদি বলে ডাকতে বাধ্য করানোর বেলায় গুরুজনদের প্রচেষ্টা কতই না দেখেছি! স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুটা মেনে নিলেও ঝগড়া লাগলে দাদা, দিদি ডাকা অর্থাৎ তখন বড় বলে মেনে নেওয়া—এক মান সম্ভ্রমের ব্যাপার হয়ে দাড়াত। তখন বাবা, মা, কাকা সকলের নানা রকম উপদেশ শুনতাম বড় বলে মেনে নেওয়ার যৌক্তিকতায়। কেহ হয়তো বলতো,—'আপনাকে বড় বলে বড সে—ই নয়......বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ঝগড়ার উত্তপ্ত সময়ে এ উপদেশ তপ্ত তেলে বারিবিন্দুর মত ছিট্‌কে বেরিয়ে যেত। সাম্য অবস্থা যখন আসতো অর্থাৎ কয়দিন বাদে তখন হয়তো মা প্রসঙ্গ-ক্রমে অন্য কথার সাথে বলতো—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে বড়—একবার এর মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। নানান্ মুনির নানা মত। একবার মুনিরা সরস্বতী নদীতে উৎসর্গ কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে প্রশ্নটি উঠলো কে বড়। প্রাজ্ঞ মুনিরা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে এ তিনজনের কাছে পাঠিয়ে যাচাই করতে চাইলেন কে বড়? ভৃগু প্রথমেই স্বর্গে পিতা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। অনুমতি না নিয়েই ব্রহ্মার সভায় প্রবেশ করলো। এতে ব্রহ্মা অত্যন্ত চটে গেলেন এবং ভৃগুকে বের করে দিলেন। তারপর ভৃগু কৈলাসে শিবের কাছে গেলেন। শিবও ভৃগুর উপর ক্রোধান্ধ হল এবং ভস্ম করে দিতে চাইলেন। কিন্তু দুর্গার সানুনয় প্রার্থনায় ভৃগুকে প্রাণে মারলেন না—তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ভৃগু বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু তখন ঘুমিয়ে। ভৃগু ঘুমন্ত বিষ্ণুর বুকে সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিলেন। বিষ্ণু জেগে বুঝতে পারলেন যে অসময়ে ঘুমান অন্যায় হয়েছে। তিনি ভৃগুর কাছে এ অন্যায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন এবং লাথি চালনায় ভৃগুর পায়ে ব্যাথা লেগেছে অনুভব করে পদসেবা করতে লাগলেন। বিষ্ণু বল্লেন যে, এ লাথি মারার দরুণ বিষ্ণু আজ পাপমুক্ত।

মুনিরা ভৃগুর কাছে এ বিবরণ শুনে একবাক্যে বিষ্ণুকে তিনজনের মধ্যে বড় বলে মেনে নিলেন। সেদিন মনে এ প্রশ্ন জাগেনি বিষ্ণু আছে কি নেই। শুধু নিশ্বাস বায়ুর দীর্ঘায়ত এক শব্দ অন্তঃকরণে বিষ্ণুকে বড় বলে গ্রহণ করলো। মানুষ ও সমাজ থাকলে ধৈর্য, বিনয়, সহিষ্ণুতা থাকবে এবং তা-ই হবে উচ্চ বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির চরম পরাকাষ্ঠা। মনুষ্যেতর জীব থেকে মানুষের পার্থক্য-ই হল তার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক সেদিন পূর্বের অনেক গ্রহণ করতে না পারা মুহূর্তে নিতে পারলো। —যে মুহূর্ত পরিণত বয়সে পাওয়া দুর্লভ। তা-ই শুরুতে লিখেছি 'আর ঘটবেনা'। যাক্ মায়ের সেদিনের গল্প পরিণত বয়সে এসে জানলাম যে ভাগবত পুরাণের কাহিনী। তা-ও নিতান্ত চলার পথে যেতে যেতে। কিন্তু সেই ধূ ধূ করা ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণায় বুঝলাম এ কাহিনীর গভীরতা কত বেশী ও কত ব্যাপ্ত। যে তাপ উষ্ণতা বাড়ায়না অথচ অবস্থার পরিবর্তনে (কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাসীয় ইত্যাদি) প্রয়োজন তাকে লীন তাপ বলে। ছোটবেলার সে গল্প এবং পরিণত বয়সের জানা 'ভাগবত পুরাণ' এক লুকানো তাপশক্তি এ সুদীর্ঘ বছরগুলিতে আমারও কিছু অবস্থান্তর ঘটিয়েছে। কঠিন থেকে তরল ইত্যাদির মত চুলচেরা সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। কেননা আমার শরীরের শবব্যবচ্ছেদের কাজ আমাকেই করতে হবে এটা চালু করার ঔদ্ধত্য রাখিনা। দার্শ-নিকদের ভাষায় Integrity of Soul—কি জানার প্রেরণা অনুভব করি। অর্থাৎ ছোটবেলার সাথে সেতুবন্ধের মত লোকপুরাণ এক বিরাট সংহতি গড়ে তুললো। মানুষ, সমাজ, নৈসর্গিকতা এ সবকিছুরই এক সাম্য বা সংহতির চিন্তা আজ আমার কাছে এক গভীর প্রেরণা। ল্যাবোরেটরির চারি দেওয়ালের মধ্যে বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। বৃহত্তর সমাজই ল্যাবোরেটরি। বিরাট সংহতি গড়ে তোলার চিন্তা তখনই সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। দুর্লঙ্ঘ্য প্রকৃতিকে ভেঙে টুকরো করে মানুষ ও সমাজের উপকারী উপকরণ সংগ্রহে ফলিত বিজ্ঞান বা ল্যাবো-রেটরি বিজ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও প্রয়োজন। প্রয়োজন মানুষ ও তার অন্তর্মনের দ্বন্দ্বে মনোবিজ্ঞানের। লোক-পুরাণের কাহিনী এ তিন দ্বন্দ্বেই উত্তরণের পাথেয় রচনায় আমাদের আত্মীয়। ইতিহাস-আশ্রিত ঘটনা দিনক্ষণ, স্থানের সঠিকতা জোগায় ও শারীরিক অস্তিত্ব ঘোষণা করে। কিন্তু লোকপুরাণ তা জানায় না। জীবন ও সমাজের একটি মূলসুর বেধে রেখেছে। সাত রাগরাগিনীর ওলট পালট ও সংমিশ্রণে বিভিন্ন

রাগরাগিনীর সৃষ্টি। লোকপুরাণের কাহিনীও বিভিন্ন সাজে আজও আমাদের মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা' কবিতায়—'খোকা মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আমি কোথা থেকে···'। শিশু জানে না বেদ, পুরাণ ইত্যাদি। কিন্তু দিনমনি অস্তাচলে গেলে বিরাট অন্ধকারের বিভীষিকা শিশুকে মায়ের কোলে টেনে আনে। বিরাট অন্ধকারে যখন সীমাহীন বিস্ময় তখনই এ প্রশ্ন জাগে। এ প্রশ্ন জাগে আজকের বৈজ্ঞানিকেরও। কিন্তু দার্শনিকের ভাষায় বলতে হয় যে, এ বিশ্ব এক বিরাট গ্রন্থ যার প্রথম ও শেষ পাতা হারিয়ে গেছে। এ হারিয়ে যাওয়া প্রথম পাতা বৈজ্ঞানিকেরা 'হারিয়ে গেছে' জেনে খুঁজছে। শিশু হারিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা বোঝে না তবু জানতে চাইছে। ঠিক যেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। পুরাণও শিশু ও বিজ্ঞানীর আগেই সে সুর বেঁধে রেখেছে। ধাবমান অশ্বের গতি ও শব্দ ইতিহাসের দোর্দন্ড প্রতাপ রাজার রাজ্য জয়ের উত্থান-পতন ঘোষণা করে। কিন্তু পরাজিত রবার্ট ব্রুসের অন্ধকার গুহায় ধৈর্য ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার প্রতীক্ষা—আর এক শক্তির প্রতীক। উদ্ধত দেবদত্তের আস্ফালন গৌতম বুদ্ধের নীরব অভিব্যক্তির মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল—'লও তুমি শাক্য রাজ্য··· এ হংস আমার আমি দিব না কখন'। এ স্থিতধি শক্তির আধার লোকপুরাণের কাহিনী। আজকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের উজানে পা বাড়িয়ে। কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্ব চিন্তা সেই পুরাণের মধ্যেই সুর বেঁধে রেখেছে। কি তার আগে বেদ উপনিষদেও আছে। এ নিয়ে বহুরকম আখ্যান আছে তার মধ্যে একটি হল—মহাকাল (শিব) সৃষ্টির তাগিদে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাঁ হাতের তালু মন্থন করে এক ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করলো। তা ক্রমশঃ বড় হয়ে একটি সোনার ডিমে পরিণত হল। মহাকাল ডিমটিকে দুটি ভাগে ভাগ করলো। উর্দ্ধাংশ দিয়ে স্বর্গ এবং নিম্ন অর্ধাংশ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করলো। কেন্দ্রস্থলে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা। তারপর বিশ্ব সম্প্রসারণশীল হতে লাগলো। একটা ছোট বীজ (ব্রহ্মাণ্ড) থেকে এ বিরাট বিশ্ব। বিজ্ঞানীরাও সৃষ্টিতত্ত্বে এই একই সম্প্রসারণশীল মতবাদে বিশ্বাসী। কোটি কোটি ছায়াপথ ও তাদের অগণিত নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ বিপুল বেগে মহাশূন্যে চারিদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের স্থিতিশীল সৃষ্টির তত্ত্ব (Steady State Theory) আর যুক্তির কাছে সায় দিচ্ছে না। তদুপরি কোয়াজার্স নামক নক্ষত্রগোষ্ঠীর পরিচয় বিজ্ঞানীদের

এ মতবাদে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কোয়াজার্স'গুলো মহাশূন্যের শেষ সীমান্তে। পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব বারো শ কোটি আলোকবর্ষ। ঔজ্জ্বল্য একলক্ষ সূর্যের সমান।

এই দুই মতবাদের মধ্যে রয়েছে—অবিরাম পরিবর্তন ও নিত্য গতিশীলতার মন্ত্র। একটি ঘটনার সাথে অপর ঘটনার সম্পর্ক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নয়, ঘটনাগুলির পরিবর্তন ও বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত। এঙ্গেলস 'প্রকৃতির ডায়ালেক্‌টিক্‌স' (ভূমিকা পৃঃ ১৮) বইতে বলেছেন, "সমস্ত প্রকৃতি, ক্ষুদ্রতম জিনিস থেকে বৃহত্তম জিনিস পর্যন্ত, বালুকার কনা থেকে সূর্য পর্যন্ত আদ্য জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত অনন্ত সত্তাতে আবির্ভাব ও তিরোভাব একটানা প্রবাহ, শ্রান্তিহীন গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব।"

মহাকালের সৃষ্ট বুদ্‌বুদ পরিমাণ সৃষ্টি করলো মহাবিশ্ব। পরিমাণ থেকে গুণগত পরিবর্তন। পদ্ধতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের (দ্বন্দ্ববাদ) প্রাথমিক নিয়ম। দ্বান্দ্বিক চিন্তা স্বনামে আত্মপ্রকাশ না করলেও পদ্ধতি যে পুরাণ স্রষ্টাদের মধ্যে কাজ করেছে এটা সঠিক। চিন্তারাজ্যের মধ্যে অগোচরে যে আধুনিক পদ্ধতি কাজ করছে সেটাই আসল শিক্ষা। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়েও এই সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানই মেলে, কৃষ্ণের মুখে শোনা যাচ্ছে ঃ

"প্রকৃতিরূপা যোনীতে আমি গর্ভাধান করলে সবভূতের প্রাণলাভ ঘটে। সর্বযোনীজাত প্রাণীরই প্রকৃতি হলেন মাতা, পিতা স্বয়ং আমি।"

[শ্লোকসংখ্যা ঃ ৩, ৪]

তুলসী নিয়ে বিভিন্ন লোকপুরাণে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। একটি কাহিনী অবশ্যই হৃদয়াবেগ সঞ্চারী ঃ তুলসী একজন নারী। কঠোর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায় এবং বিষ্ণুর স্ত্রী হওয়ার বর প্রত্যাশা করে। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী এ ঘটনা জানতে পেরে তুলসীকে অভিশাপ দেয়। এ অভিশাপে তুলসী গাছে পরিণত হয়। এ ঘটনায় বিষ্ণু খুবই ব্যথিত হ'ন। তিনি তুলসীর সান্নিধ্যে থাকার জন্য শালগ্রাম শিলা হলেন। ঘটনাটা এক অত্যুজ্জ্বল প্রেমের নিদর্শন। অবশ্য সামাজিক—আর্থনীতিক পরিচয় এ প্রেমে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবেনা যে অনুকূল সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবেশ থাকলেও আজ নর-নারীর প্রেম প্রায়শই কামবাসনা ও সামাজিক প্রতিপত্তি চরিতার্থ করার মধ্যে পর্যবসিত হয়। সমাজ পরিবর্তন

হবে এবং সমাজ বিপ্লবও হবে। কিন্তু কতকগুলি ঘটনা যান্ত্রিক পরিবর্তনে পা দিতে পারেনা। নরনারীর সম্পর্ক তার মধ্যে একটি। এ সম্পর্কের মাধুর্য, সুষমা ও পবিত্রতা যে কোন সমাজের গর্বের বিষয়। আজকাল প্রতিদিনের সংবাদ নারী নির্যাতন। আর কি কোনও নারী শুনবে না সন্ন্যাসী উপগুপ্তের সান্ত্বনা বাক্য —'...আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা' অতীতের টান এতই শিথিল যে সমাজ এগিয়ে চলেছে আলোর রোশনাই দেখে। মনের মণিকোঠায় আলো না জ্বালিয়েই।

অনুরূপ প্রেমের ঘটনা পাওয়া যায় কামদেবের স্ত্রী রতির জীবনে। স্বামীর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের আশা নিয়ে শিবের কাছে গেলেন এবং দুর্গাকে কার্যোদ্ধারের জন্য সানুনয় অনুরোধ জানালেন। দুর্গা জানালেন সম্বর রাক্ষসের বাড়ীতে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন নাম নিয়ে জন্মগ্রহন করবে। সেখানে রতি তার স্বামীকে ফিরে পাবে। তখন রতি সম্বর রাক্ষসের বাড়ীতে দাসীর কাজ করে স্বামীকে পুনরায় পেলেন। এ ঘটনাটি বা বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা হওয়া নিশ্চয়ই অলৌকিক এবং অতিলৌকিক। কিন্তু মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—সেটাই বিচার্য।

ছোটবেলা বিদ্যাসাগরের দয়ার ও দানের কথা পাঠ্য বইতে পড়েছি। নিজের পরণের কাপড়টুকু দান করে দরিদ্রের সেবা করেছিলেন। সেই থেকে বিদ্যাসাগর যেন কিংবদন্তীর এক দানবীর নায়ক। স্মৃতির মণিকোঠায় খুব সহজেই আসন করে নিয়েছে। জীবনের আদর্শের প্রতীক হলেন বিদ্যাসাগর। সে সময়েই শুনতাম গুরুজনদের ধমকানি। কেউ যদি নায্য দামের বদলে বেশী দাম দিয়ে কিছু কেনে। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠতো—'পয়সা কি বেশী হয়েছে?' 'এ যে দাতাকর্ণ দেখছি!' তখন দাতাকর্ণ বুঝতাম না। বুঝতাম বিদ্যাসাগরের দান। পরিণত বয়সে এসে পুরানের গল্পে জানলাম শিবি, কর্ণ ও দধীচির সুমহান ত্যাগ ও আদর্শ। এটা নিশ্চয়ই ধারণা করা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগরকে পুরাণের দানবীর নায়কেরা নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছে। সকল উত্তরসূরীর পূর্বসূরী থাকে। পুরাণ হল পৌরাণিককালের গল্প বা আখ্যান। তবু জীবিত ও কাছের। এ ঘটনা দানের মহিমাবিস্তারে একাল সেকালের সেতুবন্ধ। আরও মজার যে পুরাণে সাত্তিক দানকেই মহত্তর করা হয়েছে। তামসিক ও রাজসিক দান দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে হৃদয়সম্পর্ক স্থাপনে অপারগ। এ জাতীয় দানের

মধ্যে রয়েছে নাম কেনার তাগিদ এবং নিজের যশোবৃদ্ধির কৃত্রিম প্রয়াস। খুব পরিষ্কার যে সম্পদের সমবণ্টন তখনও ছিল না যেমন আজকে নেই। ফলে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণকারী আজকেও নাম কেনার তাগিদে দান করে—যে দানে হৃদয়ের যোগ থাকে না। শুধু দান নয় সদ্‌গুণাবলী ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তির প্রস্ফুরণ পুরাণ কাহিনীতে বহু পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে দানকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল। এ সব রকম দানই যে এক গভীর নীতিবোধ থেকে—এটাই খুব উৎসাহব্যঞ্জক। বৃহত্তর অর্থে দান বলতে বুঝায় সমষ্টির উপকারে কূপখনন, পুকুর তৈরী ইত্যাদি। ব্রহ্মপুরাণে দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুরাণে সত্য এক বিশেষ ধর্ম। সত্যপথই সমাজকে সুসংহতরূপে গড়ে তোলে। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও ভালবাসা স্থাপন করে। পুরাণের নীতিবোধ ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতির প্রতীক। হয়ত রবীন্দ্রনাথের 'Universal man'—এর ধারণা এ নীতিবোধ থেকেই উদ্ভূত। 'The Religion of man'—এ বলেছেন, "whatever name or logic may give to the truth of human Unity, the fact can never be ignored that we have our greatest delight when we realize ourselves in others, and this is the definition of love. This love gives us the testimony of the great whole, which is the complete and final truth of man. It offers us the immense field where we can have our release . ..., where the largest wealth of the human soul has been produced through sympathy and co-operation, through disinterested pursuit of knowledge . ..... , through a strenuous cultivation of intelligence for service that knows no distinction of colour and clime. The spirit of Love dwelling in the boundless realm of the surplus, emancipates our consciousness from the illusory bond of separateness of self, it is ever trying to spread its illumination in the human world. This is the spirit of Civilization.

ইতিহাসের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মে এখন আর লোকপুরাণ সৃষ্টি

হতে পারেনা। সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে পুরাণের যে লক্ষণ ও নিয়ম লিপি-বদ্ধ আছে সে ধারা গুপ্তযুগের প্রথম দিকেই পুরাণ রচয়িতারা আর পালন করেন নি। ফলে পুরাণ রচনার কাল সেই সময় পর্যন্তই। রচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। প্রকৃতি লোকের কাছে এতই দুজ্ঞে'য় ও অলঙ্ঘ্য ছিল তখন যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগাতে দেবদেবী ও অলৌকিক ও অতিলৌকিক ঘটনার সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় প্রকৃতির দুজ্ঞে'য়তা রহস্যের বিষয় নয়। অবিরাম একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জয় করার। এই জয়ের তাগিদে ও ইচ্ছাশক্তির পূরণ বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট পথেই ধাবিত হবে। চলিষ্ণু সমাজে এখানেই বৈচিত্র্য। পুরাণ সৃষ্টির কালে পুরাণকারেরা সমাজের চাহিদার রূপরেখা নির্ণীত করেছিলেন যে পথে আজ তা হবার নয়। পুরাণকারেরা সমাজের প্রয়োজনে বহু পুরাণের লেখার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছেন—চাহিদা পূরণের জন্য। যেমন তান্ত্রিকমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে তার চাহিদা বেড়ে যায়। বহু পুরাণের নূতন সংযোজনা হয়েছিল। নাম ঠিক রেখে বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন এনেছিলেন। অর্থাৎ পুরাণ সেদিন স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছিল। বৈদিক যুগের শেষ পর্ব থেকেই এদেশে নূতন নূতন পুরাণ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। এর অন্যতম কারণ যে দেবদেবীর সাথে অসুর বা রাক্ষসের যে দ্বন্দ্ব সে সময়কার মানুষ সেটাকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ বলে উৎসাহ বোধ করতো। আজ লোকপুরাণ অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য। কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ রচনায় অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ না থাকলে সমাজ ছিন্নমূল হয়ে পড়বে। লোকপুরাণ ভবিষ্যৎ পথের জন্য নিশ্চয়ই অমূল্য স্মৃতি। এ বিষয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ তারিখের Statesman কাগজে Damodar Agarwal লিখিত Hindi writer To-day শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে যে উদ্দাম গতিশীলতা ছিল এ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে তা ভাঁটার মুখে। কারণ বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন, 'To be enduring, literature has to peg itself on some myth. Hindi has been unfortunate in this respect, divorced as it is from the past. It has denied itself continuity with the rich myths of the Ramayana and the Mahabharata and the ritual folk lore of the country. Nor has it ever endeavoured to fathom the

treasure-trove of the Bible or the rich traditions of the Greek and Roman mythologies.'

লোকপুরাণের অবস্থান ও অনুধ্যান সুনিশ্চিত করার কর্তব্য নিশ্চয়ই সামাজিক প্রয়োজনে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এ প্রসঙ্গে একটু টেনে আনছি। চলমান মহাকাশযানে যে কোনও দুইটি বিন্দুর দূরত্ব এ পৃথিবীর তুলনায় কম। অর্থাৎ সেই মহাকাশযানে যদি একটি Scale এবং একটি ঘড়ি রেখে দেওয়া যায় তবে পৃথিবী থেকে দূরবীনে দেখলে দৈর্ঘ কম অনুভূত হবে এবং ঘড়ি স্লো যাবে। যদি মহাকাশযানটি ক্রমশঃই পৃথিবী থেকে দূরে যেতে থাকে তাহলে আরও কমতে থাকবে এবং ঘড়ি আরও স্লো হতে থাকবে। আজকে কোয়াজাস[৫] মহাবিশ্বের প্রান্তদেশবর্তী বস্তু। তার পরেও যে অসীম দূরত্ব রয়েছে সেই মহাদূরত্বে মহাকাশযানটি নিয়ে গেলে দূরত্ব শূন্য হবে এবং সেখানের একবছর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছরের সমান। লোকপুরাণ হয়ত অজানা প্রান্তদেশের আগামী দিনের সম্পদ যার মধ্যে স্বল্পকালের বিচরণ আমাদের লক্ষকোটি বছরের সম্পদ জোগাবে।

প্রসঙ্গ মিথ ঃ স্বদেশ—একাল—আধুনিক মানুষ

ক্ষেত্র গুপ্ত

॥ ১ ॥

এক. একটা ছিল দ্বীপ। কোথাও আর কিছু ছিল না। কেউ ছিল না। আকাশ থেকে একদিন খসে পড়ল এক মেয়ে। তার দুটি ছেলে হল। ত্‌সেন্তসা আর তয়েসকারে। যমজ ছেলে। ত্‌সেন্তসার জন্ম হল স্বাভাবিক ভাবে। তয়েসকারে গর্জন করতে করতে লাথি মেরে মায়ের বুক-পিঠ ভেঙে চৌচির করে বেরিয়ে এল। মা মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দিন যায় মাস যায় বছর যায়। যমজ ছেলে বড হল আর লেগে গেল পৃথিবী গড়ার কাজে। ত্‌সেন্তসা নিবিষ্ট মনে কাজ করে। উর্বর জমি। মিষ্টি ফল। সবুজ উপত্যকা। তারপরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তয়েসকারে তখন লেগে যায় কাজে। শ্রান্তি ভুলে ভীষণ খাটতে থাকে। উর্বর জমিকে সে মরুময় করে তোলে। ত্‌সেন্তসা যদি ঠাণ্ডা জলের নদী বানায় তো তয়েসকারে তাকে বিধ্বংসী বন্যায় ফাঁপিয়ে তোলে। ফুল ফোটায় ত্‌সেন্তসা, তয়েসকারে বোঁটাভর্তি কাঁটা গজিয়ে রাখে, গাছ ভরে দেয় টকো কষা বিষাক্ত ফলে। মসৃণদেহ মাছ সৃষ্টি করেছিল ত্‌সেন্তসা, তায়েসকারে তার শরীর ঢেকে দেয় কর্কশ আঁসে। এভাবেই সৃষ্টি চলছে —সৃষ্টির মধ্যেই চলছে অনাসৃষ্টি।

উত্তর আমেরিকার একটি রেড ইণ্ডিয়ান মিথ। পূর্বাঞ্চলের বনভূমির কৃষিজীবী অধিবাসী হুরন, ইরোকুওইস, উইনদত প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে প্রচলিত। আদিম মানুষের সরল অভিজ্ঞতায় শুভ আর অশুভ একই মাতৃজঠরে জাত যমজ সন্তান, অচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্যও।

দুই. মেক্সিকোর মায়া উপজাতির একটি প্রধান মিথ গড়ে উঠেছিল দেবসর্প কোয়েৎজালকোয়াত্তেল-এর সঙ্গে দুষ্ট যাদুকর তেজকাৎলিপোকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আদিম এক মানবগোষ্ঠীর কল্পনায় ঐ দেবশত্রু বহুরূপ দানবটির যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা অসাধারণ। তাকে শুধু মূর্তিমান পাপ বলে সরিয়ে রাখা চলবে না, সে হল অপরিচিত জড জগতের সামগ্রিক বিভীষিকা

বা বিস্ময়। অনন্ত বৈচিত্র্যময়, নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বেরই অন্য নাম তেজকাৎলি-পোকা বিশেষজ্ঞ বলছেন,

> He was god of sin but also of feasting. He rewarded good men and brought diseases upon the evil......He could at a glance pierce stones and trees and even the hearts of men, so that it was possible for him to read our innermost thoughts. It was said that he had only to think of something and he invented it forthwith. Men, it was said, were mere actors on a stage whose play were designed to entertain Tezcatlipoca.

মানুষের অস্তিত্বের এবং মানবচিত্তের অনন্ত রহস্যভেদের ইচ্ছায় শুভাশুভ নিরপেক্ষ এই জটিল দেবকল্পনা।

তিন. পলিনেসিয়ায় হাওয়াই অঞ্চলে সুপরিচিত একটি মিথ আগ্নেয়গিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবী পেলেকে নিয়ে। ধ্যানের মধ্যে একদিন পেলের আত্মা দেহ ছেড়ে বহুদূর এক জনপদে গিয়ে হাজির হল। বসন্ত উৎসবে বাঁশির সুরে নাচ চলছিল। তরুণ দলপতি লোহিআউয়ের সঙ্গে নাচে যোগ দিল পেলের আত্মা, অবশ্য এক সুন্দরী যুবতীর দেহ ধরে। চলে আসার আগে লোহিআউকে বলে এল তাকে নিতে দূত পাঠাবে। অনেক কাল কেটে গেল। অবশেষে পেলের পাঠানো দূতীর সঙ্গে নানা বিপদ ডিঙিয়ে লোহিআউ এসে পৌঁছল সেই আগ্নেয় পাহাড়ের কাছে, যেখানে পেলের অধিষ্ঠান। প্রেমিকের আগমনে উল্লসিতা পেলে তার অগ্নিশিখাময় বাহুগুলি বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল লোহিআউকে—দগ্ধ ভস্ম প্রেমিককে আপনার জঠরে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল পেলে।

উপরে তিনটি মিথের উল্লেখ করা হল। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর নানা

তাৎপর্য ধরা পড়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীর কাছে এই জাতের কাহিনীগুলি বিস্ময়কর মনে হবে অন্য কারণে।

পাপপুণ্য-সদসৎ-শুভাশুভ বিষয়ক মূল্যবোধগুলিকে আমরা অনেককাল লালন করে এসেছি। মানুষের-ইতিহাসের প্রবাহ কল্যাণমুখী—এ আস্থায় অবিচল থেকেছি। প্রেমকে, নারীকে রোমান্টিক সৌন্দর্যে আদর্শায়িত করেছি। তারপরে রেনেসাঁ থেকে শিল্পবিপ্লবের কাল পর্যন্ত গড়ে-ওঠা এই সব আশার ভবিষ্যতের মানবমহিমার আলো নিভে আসতে থাকে প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় য়ুরোপে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে এদেশেও। আজ অবশ্য মিথের আদিম মানুষের মতো অসহায় চোখে বিশ্ববিধানের মুখোমুখি সে দাঁড়ায় না, কিন্তু নিরুপায় দৃষ্টিতে বিশ্বের মানবিক বিধানের সামনে সে পুরোনো মূল্যবোধের পোশাক খুলতে থাকে। প্রেম ও মৃত্যু, নারী ও নিয়তি একাকার হয়ে যায় (পেলের মিথের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়)।সৃষ্টির মূলে শুভ ও অশুভের সমান সক্রিয়তা (সাদৃশ্য : ত্‌সেস্তসা-তয়েসকারে মিথ) অনুভব করে এবং মানবস্বভাব ও ভাগ্যের উৎসে যদি কোন শক্তি থাকে তবে তার হওয়া সম্ভব মায়াদের পুরোনো দেবতা তেজকাৎলিপোকার মতো এমন সাদৃশ্যবোধও মনে জাগতে পারে। মানে আধুনিক মন ঐ মিথগুলি পড়লে চমকাবে মিল দেখে। অবশ্যই এই মিল মোটেই সরলরেখা নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রভাবের ফল। এবং সব পার্থক্যের গোড়ায় আস্থা এবং অনাস্থা—সে দূরত্ব দুস্তর।

॥ ২ ॥

সব দেশের সব মিথ সমবয়সী না হলেও, তারা যে অনেক পুরোনো দিনের তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে আধুনিক মানুষের মনে, তার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এইসব পুরোনো মিথ কি এতটুকু বেঁচে আছে, ব্যবহৃত হচ্ছে, স্বীকৃতি পাচ্ছে—তাৎপর্যমণ্ডিত বলে? যাঁরা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক, তাঁরা ছাড়া তার কেউ কিছু মাত্র গুরুত্ব দিয়ে ভাবে মিথের কথা, না ভাবার প্রয়োজন আছে?

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার মন্থর, এলোমেলো এবং অতিমিশ্র। গ্রামে এখনও হেল্‌থ-সেন্টারের শল্যচিকিৎসা আর ওঝার ঝাড়ফুঁক পাশাপাশি চলছে। ক্ষেত্রস্বামী লোকদেবতার পুজো দিয়েও জৈবসারের খোঁজে

বি-ডি-ও অফিসে ধর্ণা দিচ্ছে লোক। অতি বৃদ্ধা পিতামহীর মুখে এখনও কচিৎ চাঁদের মা বুড়ির গল্প শোনা যায় বা সমুদ্রমন্থনের পালায় রাহুকেতুর চন্দ্রসূর্য গেলার কাহিনী, পাঠশালায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বইয়ে বালক পড়ে অন্য চাঁদের কথা, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের অন্য গল্প।

মোটকথা—যারা জানে না, তারা মিথে বিশ্বাস করে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যদিও বারবারই চিড় ধরে তাতে, সংশয় জাগে; আর যারা জানে, তাদের নতুন বৈজ্ঞানিক আস্থা। এদেশে এই দুই শ্রেণীর দূরত্ব ঘোচে নি এখনও, তবে কমে আসছে—কি হারে সে তথ্য সংকলিত হয় নি।

যদি সারা দেশের, অঞ্চলগুলির জনসংখ্যার হিসেব নেওয়া যেত, মিথগুলির প্রধান বর্গ অনুযায়ী,—বিশ্বাসী, অংশত বিশ্বাসী, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে যারা মোটে ভাবে না, সংশয়ী, অবিশ্বাসী,—এই ভাবে তাহলে একটা সত্য ছবি মিলত। অবশ্য আমাদের পূর্ব প্রকল্প বা হাইপোথিসিস—ঝোঁকটা অবিশ্বাস দিকে এবং সেটা বড় ওজনের। নিচের তুলনামূলক ছকটা লক্ষ্য করা যাক—

কোন বর্গের মিথ	বিশ্বাসী	অংশত বিশ্বাসী	প্রশ্নহীন	সংশয়ী	অবিশ্বাসী	কোন দিকে ঝোঁক
বিশ্বসৃষ্টি - মানবসৃষ্টি.	ক — —	ক — —	ক	ক —	ক	অবিশ্বাস
দেবতা	ক	ক	ক —	ক —	ক —	বিশ্বাস
ভূত-প্রেত-দৈত্য	ক —	ক	ক —	ক	ক	অবিশ্বাস
পশুপাখি-গাছপালা	ক — —	ক — —	ক	ক —	ক	অবিশ্বাস
জল-মাটি-আগুন	ক — —	ক — —	ক	ক —	ক	অবিশ্বাস
কৃষি	ক — —	ক — —	ক	ক —	ক	অবিশ্বাস
মৃত্যু-পরলোক	ক	ক	ক —	ক —	ক —	বিশ্বাস

ক-এর সংখ্যাগত মূল্য আমাদের জানা নেই, তাছাড়া ক একটি স্থির সংখ্যা না-হওয়াই সম্ভব। আমি এই ছকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তুলনা করতে চেয়েছি মাত্র। সে উদ্দেশ্যে ক-কে একটি মানক হিসাবে ব্যবহার করেছি। আর একটা কথা, এই ছক কোন সিদ্ধান্ত নয়, একটি সম্ভাবনা—একটি পূর্বপ্রকল্প বা হাইপোথিসিস। ব্যাপক ও বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব সমীক্ষায় যদি অন্য তথ্য পাওয়া যায়, আমাদের এ-ছক, এ-সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে নতুন যুক্তির খোঁজে বেরুতে দ্বিধা করব না।

এ-রকম একটা অর্ধ-গাণিতিক[1] সূত্র বের করা সম্ভব—

ক. অনুন্নত কৃষি-নিভরতা $\propto$ বিশ্বাস

কৃষিতে যন্ত্রাদির ব্যবহার $\propto \frac{1}{\text{বিশ্বাস}}$

খ. নগর ও শিল্পাঞ্চল থেকে দূরত্ব $\propto$ বিশ্বাস

নগর ও শিল্পাঞ্চলের নৈকট্য $\propto \frac{1}{\text{বিশ্বাস}}$

গ. রাজনীতি-অসম্পৃক্তি $\propto$ বিশ্বাস

রাজনীতি-সম্পৃক্তি $\propto \frac{1}{\text{বিশ্বাস}}$

ঘ. অশিক্ষা $\propto$ বিশ্বাস

শিক্ষা $\propto \frac{1}{\text{বিশ্বাস}}$

[এই ধারায় আরও কিছু 'ভেরিয়েসেন'-সূত্র বের করা যেতে পারে।]

অর্থাৎ অনুন্নত কৃষির উপরে নিভরতা যেখানে যত বেশি, মিথে বিশ্বাসও ততই বেশি, কৃষিতে যন্ত্রাদির ব্যবহার যত বাড়বে মিথে বিশ্বাস তত কমবে। অথবা অশিক্ষা যত বাড়বে তত বেশি মিথে বিশ্বাস, শিক্ষা বাড়বে যেমন-যেমন মিথে বিশ্বাসও তেমনি কমবে। গাণিতিক প্রমাণ দেবার উপায় নেই, কারণ সংখ্যা-তত্ত্বের অভাব, তবে যুক্তির তর্জনি ঐদিকেই।

---

১. অর্ধ-গাণিতিক কারণ এই Variation সুনির্দিষ্ট অঙ্কের হিসেবে হবে না—হবে অনেকটা সাধারণ আনুপাতিক ধরনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করার মতো, কোন কোন জনগোষ্ঠীতে বেশ পুরোনো সময় থেকে মিথের আবৃত্তি সর্বরোগহর ও সুস্বাস্থ্যের কারণ—এমনি লোকাচার ও বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান মিথলজির বিশেষজ্ঞ কোর্ত্তি বারল্যাণ্ড বলছেন,

> ...linking of the myths with healing ceremonies were probably the major factor in preserving them.—[North American Indian Mythology. Cottie Burland. Paul Hamlyn. London etc. 1970]

মিথ প্রভাবের যুগেই তাতে পূর্ণ আস্থার ভেতরে ভেতরে স্খলন দেখা দিচ্ছিল, এই রিচ্যুয়ালের উদ্ভাবনার সেটি প্রধান কারণ বলে মনে হয়। একালে, শিক্ষা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির ফলে অবিশ্বাস তো সর্বব্যাপী হবারই কথা।

মিথের তুলনায় রিচুয়াল বা ধর্মীয় লোকাচারের প্রত্যক্ষ প্রভাব (অংশত) এদেশে অনেক বেশি। জন্ম-বিয়ে-মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচারগুলি, সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে আচরিত না হলেও, আর তাদের জটিলতা অনেকটা কমে গেলেও, আধুনিক শিক্ষিত জনের জীবন থেকে এখনও মুছে যায় নি। মিথ ও রিচ্যুয়ালের তুলনামূলক সজীবতা অবশ্য অন্য আলোচনার বিষয়।

॥ ৩ ॥

আধুনিক শিক্ষিত মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে মিথ

১. নৃতাত্ত্বিক চর্চার প্রয়োজনে

২. শিল্পসাহিত্যে—

 ক. মানস-সংযোগের উপায় হিসেবে

 খ. উপাদান রূপে

বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে।

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের চর্চায় আদিম মানবগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ভিত্তি আবিষ্কারে

মিথ নিয়ে গভীর পর্যালোচনা বেশ কিছুকাল চলছে। ঐ সব ক্ষেত্রে ঐ পর্যা-লোচনার ফলকে কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে তাদের জীবন ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নে। যে সব গোষ্ঠী ইতিহাসের স্রোতে সমগতিতে ভাসমান নয়, জীবন ছোট বদ্ধ হ্রদের মতো শীতল, তাদের জেনে বুঝে তবে তাদের জাগাবার পথ করে নিতে হয়। এ কারণেই সমাজতাত্ত্বিকেরাও নৃতাত্ত্বিক মিথ-বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্যিকেরা যখন গ্রীক বা রোমক পুরাণ নিয়ে গল্প-নাটক লেখেন, লেখক-পাঠকের কাছে তা আর একটা শৈল্পিক উপাদান—পুরোনো উৎস থেকে পাওয়া এইমাত্র। দুই হাজার বছরে খ্রীষ্টান ধর্ম তার জট মন থেকে উপড়ে ফেলতে খুব সাহায্য করেছে। অন্য সব কারণ তো আগেই বলেছি। এ দেশে কিন্তু ধর্মগত ভাবে ক্লাসিক্যাল মিথের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেনি। [খাঁটি মিথের সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তা নানাভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।] আমাদের পুরাণাশ্রিত নাটক প্রায়ই ছিল ভক্তিধর্মের আকর। যখন অন্য মনো-ভাবের বাহন—বিদ্রোহীচেতনার বা জাতীয়তাবোধের, তখন কিন্তু সাধারণ পাঠক -দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেসনের বাড়তি একটি মাত্রা যুক্ত হতে পারে এই প্রত্যাশাও লেখকের মনে সক্রিয় থেকেছে। মধুসূদন রামায়ণী বিষয় নিয়ে লিখে-ছিলেন কারণ ঐ হিন্দু ক্লাসিক্যল পুরাণ তার শিল্পীসত্তার 'ডিপ স্ট্রাকচার'—এমন সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন—তা তো ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষার সমজাতীয় সন্ধান। কবি রামায়ণের ভাবানুষঙ্গ-রূপানুষঙ্গের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন, যেমন হোমর বা কালিদাস থেকে উপমা চয়ন করেছিলেন বা শব্দচয়নে সতর্কভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছেন ঐতিহ্যে-স্মৃতিতে জমে-ওঠা রঙের গন্ধের মেজাজের আবহ।

কোন নাট্য বা ফিল্মপরিচালক যদি জনসাধারণের মধ্যে চলিত মিথের (যা আজ বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে জড়িত) ব্যবহারে তাঁর শিল্পের আভিজাত্যিক দূরত্বকে ঘোচাতে চান তো বলব সেটা একটা শিল্পপ্রকরণ। যেমন দেখছি গ্রোটোস্কির থিয়েটারে। চিত্রী বা কবিও একম কিছু করতে পারেন। তাঁর অভিপ্রায় কতটা সফল হবে—তার চেয়েও বড় কথা 'ঐ অভিপ্রায়' যাতে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য একটা স্বাদে ধরা পড়ল। নতুন আয়তি আনল। শুধু মিথ ব্যবহারের দৌলতে আধুনিক

শিল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মনের সামীপ্য পাবে—একথা মানা শক্ত। তবে নব্য শিল্পী ও পুরোনো জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক আত্মীয়তা ঘটাতে মিথের কুশল প্রয়োগ কিছু কার্যকর হতে পারে বৈকি।

তারাশঙ্কর যখন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কি 'নাগিনী কন্যার কাহিনীতে' বা 'কামধেনু'র মতো গল্পে মিথের ব্যবহার করেন, তার কিছুটা কি গল্পাকারের নিজের তৈরি করা নয়। কতটুকু বানিয়ে তোলা, কতটা ঐতিহ্যে পাওয়া মিথ-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তার খবরের অপেক্ষায় থাকব। (কাহার বাউরী বা পোটো যেমন বাস্তব জনগোষ্ঠী, বিষবেদেরা ঠিক তেমনি নয়—ওরা অনেকটা লেখকের নানা উপাদান মিশিয়ে গড়ে-তোলা, এ বিষয়ে তারাশঙ্করের নিজেরসাক্ষ্য আছে।) তবে এই শিল্পপ্রয়াসের লক্ষ্য মিথাশ্রয়ী জনগোষ্ঠী নয় —তারা উপন্যাসে গল্পে পড়বে তাদের জীবন এমন প্রত্যাশা লেখকের ছিল না। পড়তে জানে এমন পাঠকদের কাছে ঐ কাহারেরা বা পোটোরা অনেক সত্য হয়ে উঠবে মিথের ব্যবহারে, আর লেখকের জীবন-ব্যাখ্যাও নিশ্চয়ই তাৎপর্যবহ হতে পারবে খাঁটি মিথ আধুনিক লেখকের মননে কতটা বিকৃত হল—বদলাল তারই মাধ্যমে।

আধুনিক, অবিশ্বাসী আর সংশয়ী আমাদের কাছে মিথ বাস্তবতার উপাদান মিথপ্রাণ আদিম গোষ্ঠীগুলিকে বুঝবার, এবং কাব্যে-শিল্পে ব্যবহার্য অনুষঙ্গগর্ভ উল্লেখ। তার চেয়ে বেশি কি ?

———

আদিম সমাজ-মনন ও সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ

—দিব্যজ্যোতি মজুমদার

নিম্ন প্রস্তরযুগের একেবারে শেষের দিকে মানব সমাজের চিন্তা-চেতনায় বিপ্লব ঘটল। এর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই পশুর সঙ্গে মানুষের বিস্তর ব্যবধান ঘটে গিয়েছে। মানুষ তার সামনের পা-দুটোকে মুক্ত করতে পেরেছে, সেই কুশলী পায়ে অস্ত্র ধরতে শিখেছে। পশুর অবস্থা থেকে মানুষকে মানুষ করে তুলেছিল হাতিয়ার। কোন্ হাতিয়ার কিভাবে ব্যবহার করলে শত্রুর বিরুদ্ধে সুবিধা হবে,—সে চিন্তা তাকে উন্নত করে তুলছিল। এই হাতিয়ার আর মানুষ, কে আগে উদ্ভূত হয়েছিল এ তর্ক শুধুই তর্কের খাতিরে। আসলে, কোনোকালে মানুষ ছাড়া হাতিয়ার ছিল না, হাতিয়ার ছাড়া মানুষ ছিল না। পা-দুটো মুক্ত হতেই সে পাথর কিংবা গাছের ডাল তুলে নিয়েছে অন্যের বিরুদ্ধে। পাথর বা গাছের ডালের কোনো কিছু করবার ক্ষমতা নেই, সে হাতিয়ার নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে মানুষ তাকে কাজে লাগালো, সেই মুহূর্তে সে হাতিয়ার হয়ে উঠল। তাই হাতিয়ার আর মানুষ একই সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে, একের সঙ্গে অন্যে তীর-ধনুকের সম্পর্কে জড়িত।

দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় মানুষ মানুষ-হয়ে উঠেছে—শ্রমের ভূমিকাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরে। এই ব্যাপারে তার দুটি অঙ্গ ছিল অনন্য সহায়ক। তার দুটি হাত। এই হাত অন্য বস্তুকে ধরতে পারত, নিক্ষেপ করার কাজে ছিল সুপটু, দশটি আঙুল যাদুকরের মত সক্রিয় ছিল। এই হাত হল সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, মানবসভ্যতার মূল উৎস।

এই নিম্ন প্রস্তর যুগেই মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল। প্রকৃতির ওপর প্রথম আংশিকভাবে হলেও প্রভুত্ব করবার সূচনা হল। মানবসমাজে বিপ্লব ঘটল। হাতিয়ার শ্রম ও আগুন মানুষকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। মানুষের সংস্কৃতির জন্ম হল। কিন্তু কিভাবে?

হাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শুধুমাত্র হাতই মানুষকে মানুষ করে তোলেনি। প্রকৃতি এবং বিশেষ করে জৈব ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রকৃতি কার্য-কারণের এমন একপেশে ও সরলীকৃত সমাধান দিতে পারে না। এক জটিল সম্পর্কের পদ্ধতি গুণগত পরিবর্তন

আনতে সহায়ক হল। এ এক নতুন গুণ। এর ফলে বিভিন্ন পরস্পর অনুবর্তী ফলাফলের উদ্ভব ঘটল। গাছের বাসা ত্যাগ করার পরে মানুষের দেহের পরিবর্তন ঘটল, মানুষের দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটল, আগের তুলনায় ঘ্রাণশক্তি কমে গেল, চোখ দুটির অবস্থান বদলে গেল, চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা গড়ে উঠল, দেহ সোজা খাড়া হয়ে উঠল, এবং ঋজু দেহের ফলে মস্তিষ্কের গঠন উন্নততর হল। আগুনের ব্যবহারের ফলে খাদ্যের অভ্যাসে পরিবর্তন এল, মানুষের জীবন-ধারণের পরিবেশ সম্পূর্ণ পালটে গেল। এই সব মিলিয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠল। তবু হাতই প্রত্যক্ষভাবে চূড়ান্ত ও স্থিরনিশ্চিত অঙ্গ। হাত মানুষের যুক্তিকে মুক্ত করতে সমর্থ হল,—এবং মানবিক চেতনার উৎসার ঘটাল। মানুষ জন্ম থেকেই হাতিয়ার তৈরি বা ব্যবহারের গুণ নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়নি। তাকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটা শিখতে হয়েছে, বার বার ভুল করে চেষ্টা করে হাতিয়ার তৈরি শিখতে হয়েছে। প্রতিটি মানুষেব এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই সংস্কৃতির বীজ লুকিয়ে বয়েছে। বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে যে শ্রম কাজ করেছিল, সেই শ্রমই তাকে সভ্যতার প্রতিটি সিঁড়ি ডিঙোতে সাহায্য করল। হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে, আগুন আয়ত্তে আসার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক নতুন জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠল।

উদ্দেশ্যের দ্বারাই কর্মপদ্ধতি স্থিরীকৃত হতে লাগল,—এর থেকে জন্ম হল মনের। আর এই মনের জন্ম, চেতনার উৎসার থেকেই মানুষের নবজন্ম ঘটল। দীর্ঘকাল ধরে এবং শ্রমসাধ্য পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মানসিক গঠন দৃঢ় হল। সচেতন অস্তিত্বের অর্থই হল সচেতন কর্মধারা। এই চেতনা থেকেই মানুষ বুঝতে শিখল কোন্ হাতিয়ার বেশি কার্যকর, কোন্ পরিবেশ সংগ্রামের অনুকূল, কোন্ সম্পর্ক তার গোষ্ঠীকে বিপদমুক্ত করতে সাহায্য করবে। বস্তু থেকেই সমস্ত চৈতন্যের জন্ম হল, বস্তুর কল্পনা বাদ দিয়ে চেতনা গড়ে উঠতে পারে না। আগে বস্তু, পরে চৈতন্য। সমস্ত কল্পনার পেছনে রয়েছে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু। সৃষ্টিশীল চেতনার উদ্ভব ঘটল সেইদিন যেদিন মানুষ পাথর ভেঙে নতুন অস্ত্র তৈরি করল (এতদিন সে প্রকৃতির বুক থেকেই অস্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত পাথর সংগ্রহ করত), তাকে নানা আকৃতি দিল, হাতিয়ারকে তীক্ষ্ণ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করল, আগুনে পুড়িয়ে গাছের ডালকে আরও শক্ত অস্ত্রে পরিণত করল।

যদিও শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের মতই প্রাচীন, তবু এই সময়কালে শিল্প-সংস্কৃতি

এক বিশিষ্ট রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠল। যে মানুষ সমস্ত রাত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকত,—আগুনের ব্যবহার জানার পরে রাত তার কাছে আর বিভীষিকাময় রইল না, রাতের সময়টুকুতেও সে সৃষ্টিশীল কাজে ব্যাপৃত রইল। জীবনে সময় অনেক বেড়ে গেল, নিশ্চিন্ত পরিবেশ তাকে উন্নত ভাবনায় ভাবিত করে তুলল। তখন থেকে নিত্য নতুন জিজ্ঞাসা তাকে উতলা করল,—কেন কেন কেন?

এই 'কেন'র উত্তর থেকেই আদিম মৌখিক সাহিত্যের জন্ম। পশুর সঙ্গেই মানুষের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সব ব্যাপারই পশুর ওপর নির্ভর করতে হয়। 'কেন' উত্তরও তাকে পশুর মাধ্যমেই প্রথম প্রকাশ করতে হয়েছিল। পশুর সার্বিক প্রভাব, কর্মে-চিন্তায়-আচারে পশুর প্রাধান্য, পশুপাখিকে কোনো সময়েই কর্মী ও সদ্য চেতনাসম্পন্ন রসজ্ঞ মানুষ অস্বীকার করতে পারে নি। তারা নিপুণভাবে পশুকে দেখেছে ও তার প্রভাব নির্বিবাদে জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সে যখন 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়ে গল্প বলতে লাগল, তখন স্বাভাবিকভাবেই অবচেতন অবস্থায় পশুপাখিই হল তার গল্পের বিষয়বস্তু। পশুকে অস্বীকার বা বা উপেক্ষা করবার কোনো উপায়ই সে সমাজে ছিল না। তাই লোকসাহিত্যের আদি সৃষ্টি হল পশুকথা। তার সংস্কৃতিকে আদিম মানুষ প্রথম রসসিক্ত আকারে প্রকাশ করল এইসব পশুকথার মাধ্যমেই। সমাজ ও পরিবেশ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই, এই মৌখিক পশুকথা রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনকে যারা ঘিরে ছিল, গল্পেও তারা মিছিল করে এল।

'কেন'-র উত্তর খুঁজতে মানুষ আদিমকালে লোকপুরাণ সৃষ্টি করেছিল, সেই আদিম লোকপুরাণেও পশুপাখিরই প্রাধান্য। সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণও তার ব্যতিক্রম নয়। আর পশুপাখিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিবিষয়ক যেসব লোকপুরাণ আজও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত সংহত সমাজে পাওয়া যায়, সেগুলিই আদিমতম লোকপুরাণ। এ বিষয়ে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। সৃষ্টিবিষয়ক সেই আদিম লোকপুরাণের মানসিক উৎসভূমিটি সম্পর্কে অবগত হলেই রহস্য পরিস্ফুট হবে। লোকপুরাণের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ।

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আজকের তানজানিয়া। ঔপনিবেশিক আমলে ছিল ট্যাঙ্গানাইকা ও জানজিবার। এখন মিলিত নাম তানজানিয়া। কাছাকাছি এলাকা হল কেনিয়া, উগাণ্ডা, রুয়াণ্ডা-উরুনডি, মোজাম্বিক প্রভৃতি। শ্রী ও শ্রীমতী এল. এস. বি. লিকে এই তানজানিয়া এলাকা থেকে মানুষের আকৃতির প্রাচীনতম

জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। এর ফলে নৃতাত্ত্বিকেরা আজ স্থির-নিশ্চয় হয়েছেন যে, মানুষের প্রথম উদ্ভব ঘটে আফ্রিকায়। সম্প্রতি আলেক্সি ওকৃলাদ্‌নিকভ আলতাই পার্বত্য এলাকার গোরনো-আল্‌টাইস্‌ক্‌ শহরের মধ্যভাগে খননকার্য চালিয়ে আশি লক্ষ বছর আগেকার প্রস্তরের হাতিয়ার ও কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী পেয়েছেন। ইউরো-এশিয়ায় আদিমতম মানুষের এটাই প্রাচীনতম নিদর্শন। তাই অনেকে বলছেন, মানুষের আদিম পূর্বপুরুষ সাইবেরিয়া ও আলটাই অঞ্চলেও বাস করতেন। মানুষের বসতির এই ব্যাপ্তি হয়তো ছিল, কিন্তু সেসব এলাকায় সে সংস্কৃতির জীবিত কোনো ঐতিহ্য নেই, যা রয়েছে আফ্রিকায়।

ঔপনিবেশিক শোষণের লীলাভূমি আফ্রিকায় ইউরোপীয় দেশসমূহ তিনশো বছর ধরে আর্থিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু এই জাতিসমূহের মহান উন্নত বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলে তেমন কোনো আঘাত করতে পারেনি। জীবনের বিনিময়ে তারা তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অনবদ্য সে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের আদি উৎস আবিষ্কার করতে হলে তানজানিয়া সহ আফ্রিকার ঐতিহ্যমণ্ডিত আদিবাসী সমাজের লোকপুরাণের সন্ধান নিতেই হবে।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের মধ্যে আমরা পাই,—দেবতার জন্ম, পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, আকাশ-সাগর-নদী-বিলের জন্ম পর্বত-অরণ্য-বৃক্ষের সৃষ্টি, স্বর্গ-মর্ত-নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্রের উদ্ভব, মানুষ-পশুপাখি-কীটপতঙ্গের জন্ম, আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-রীতিনীতি ইত্যাদির আবির্ভাব।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গে দেবতা খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই দেবতারা এই পৃথিবীরই অধিবাসী। কেউ থাকেন কৈলাশে, কেউ অলিম্পাস পর্বতে, কেউ দূরের ঐ পাহাড়ে যেখানে মেঘ এসে মিশেছে। কেউ আকাশে ও স্বর্গেও থাকেন, কিন্তু সেস্থানও ধরাছোঁয়ার মধ্যেই, কেননা দেবতারা মানুষের মধ্যে নিত্য যাতায়াত করেন। মানুষ ছাড়া তাদের চলে না, বা চলা সম্ভব নয়। আর এই দেবতারা আসলে মানুষেরই প্রতিরূপ। এই দেবতারা দারুণ ঈর্ষাপরায়ণ, নীচতা-ক্ষুদ্রতা-হীনতা এদের চরিত্রের সঙ্গে মিশে রয়েছে, এরা প্রবল কামপরায়ণ, ব্যাভিচার প্রতিদিনের ঘটনা, এরা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, সামান্য ত্রুটিতেই অগ্নিশর্মা হয়, এরা কারণে-অকারণে স্তুতি পছন্দ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কোনো হীন কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। মানুষের কাছে এরা নানাভাবে ঋণী থাকে, কিন্তু মানুষের ওপরে প্রভুত্ব করে।

দেবতাদের স্বভাব এরকম হল কেন? মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে দেবতা ও ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছিল সেই আদিম অবস্থায়। দেবতা ঈশ্বরের চেয়ে প্রবীণ। মানুষ বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা থেকে দেবতার জন্ম দিল। বস্তু থেকেই তার চৈতন্যের উদয়। তাই বস্তুর পেছনে যে-শক্তিকে সে কল্পনা করল তা হল বস্তুরই প্রতিরূপ। তাই প্রয়োজনের দেবতারাও হলেন মানুষেরই প্রতিরূপ। সমাজে সে যা-যা ঘটতে দেখছে, যে যে স্বভাবের মানুষ দেখছে,—সবই দেবতায় আরোপ করছে। এই প্রথম অবস্থায় দেবতার কল্পনায় ভাঁাত ছিল না, সহজ মনের স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রেণীর প্রয়োজনেই পুরোহিত ও সামন্তপ্রভু দেবতা ও মানুষের মধ্যে মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল,—প্রয়োজন হল ভীতি-সঞ্চারের। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক অবিচারকে পাকাপোক্ত করতে সাধারণ মানুষের মনে দেবতা বিষয়ে ভীতি জন্মানোর দরকার ছিল। আর ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা আরও পরবর্তীকালের। ঈশ্বর নিরাকার, স্বয়ম্ভু, আদি সৃষ্টিকর্তা, অলক্ষ্যে সমস্ত কিছুর নিয়ামক। এই ভাবনা অনেক পরিশীলিত, সূক্ষ্ম, মার্জিত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে কোনো লোকপুরাণ গড়ে ওঠেনি। লোকপুরাণের সকলেই সেইসব রক্তমাংসের দেবতা। এই দেবতাদের উদ্ভব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলেছেন সি. এম. বাওরা,—Gods and men live in a single world. A people gets the gods which it deserves. এই পর্বে মানুষের সঙ্গে দেবতার অসমতা একমাত্র শক্তির ক্ষেত্রে। এমন কোনো কাজ নেই যা দেবতারা পারে না,—একই পৃথিবীর প্রাণী হয়েও মানুষ এইখানে পরাজিত। মানুষ এই শক্তিই কামনা করত, প্রকৃতি ও পশুজগতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে সে অকল্পনীয় শক্তিধর হতে চাইত। সেই পবিত্র কামনা তারা দেবতায় আরোপ করে কিছুটা শান্তি পেত। অবশ্য দেবতার প্রতি এই শান্তিভাব বজায় রেখেও সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলেছিল। তাই আজ সে সভ্যতার এই স্তরে পৌঁছতে পেরেছে। সেই পুরনো কালে দেবতার শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে নিজের মধ্যে আশীর্বাদ-স্বরূপ সেই শক্তিকে কামনা করত। বাস্তব পৃথিবীতে নিজের নিষ্ঠা-শ্রম ও অধ্যবসায়ে সে সেই শক্তি লাভ করতে পেরেছিল।

লোকপুরাণের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। আবার সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে এর প্রাধান্য অত্যধিক। আর সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে সেইকালের সামাজিক রীতিনীতি-আচার-আচরণ ও ভাবনা প্রতীকের মাধ্যমে

লুকিয়ে রয়েছে। এই প্রতীকের উদ্‌ঘাটন ছাড়া সেকালের সামাজিক মননের পরিচয়ও পাওয়া যাবে না।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের উদ্ভব কিন্তু স্রষ্টার আনন্দানুভূতির প্রকাশ নয়। প্রাণের আনন্দের ফলে এসবের জন্ম হয়নি। নানা জটিল প্রাকৃতিক ঘটনা-প্রবাহ, জীবনযুদ্ধের জটিলতা প্রাক্‌-বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষকে বড়ই নাজেহাল করে তুলেছিল, তাদের যুক্তি ও মনন সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারঙ্গম ছিল না,—এই অনভিব্যক্তির যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। সাধারণ যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানার্জন যখন ঘটেনি, অথচ প্রাথমিক মননের উৎসার ঘটেছে, সেইকালে চিত্রময় বিচিত্র প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পেছনে একটি ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিল। তার চারপাশে যেমন ঘটনা অরণ্যে-পর্বতে-আকাশে ঘটে যাচ্ছে, তার পেছনের কোনো কারণই সে বুঝতে পারছে না। এই মুহূর্তেই জন্ম হল সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের। আর ঐসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই এদের সৃষ্টি। যে ব্যাখ্যা সেকালের মানুষ দিল, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে তার অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিধি। ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তির চেয়ে বেশি রয়েছে ভাবাবেগ, ব্যাখ্যার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কে বিবৃতির প্রভূত ঘাটতি রয়েছে, সেটা প্রকাশ করবার মত মানসিক গঠন তখনও গড়ে ওঠেনি। সে তখন এক ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য ধরনের অভিজ্ঞতার যোগসূত্র ঘটিয়ে একটি ঐক্য ও সাদৃশ্য আনার চেষ্টা করেছে। এর ফলে সে মানসিক একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছে, যে কাল্পনিক সমাধান সে আবিষ্কার করেছে তার ফলে ঘটনাগুলোকে দৃঢভাবে মোকাবিলা করার শক্তি পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করবার মানসিক বল সংগ্রহ করেছে। যে ঘটনাগুলি একেবারে আকস্মিক ও সম্পর্কচ্যুত বলে মনে হত, তাদের মধ্যেকার সাদৃশ্য ও ঐক্য তাকে সবল করে তুলেছে।

এই কারণেই স্বাভাবিকভাবেই আদিমতম ধর্ম এই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। কেননা, আদিম সমাজের ধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে জানা, প্রকৃতির ওপর নির্ভর করা। তাই প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের মধ্যেই ধর্মীয় বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে। এই মানসিকতা থেকে সেই মানুষ জেনেছে সবকিছুই মূর্ত, বাস্তব এবং অবিভাজ্য, অবিভক্ত ব্যক্তিসত্তা। এই ব্যাখ্যা থেকে সে তার উৎকণ্ঠাগুলিকে রূপ দিয়েছে। সে জেনেছে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিটি প্রান্তে দেবতা ও আত্মা সক্রিয়। সে অনুভব করেছে এদের কাছে তার প্রার্থনা-কামনা

পৌঁছে দিতে হবে,—আর এই পৌঁছবার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠল সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণ। এই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণই জানা বিষয়ের সঙ্গে অজানা ঘটনাসমূহের সংযোগ ঘটাল, মানুষের মতো ঐসব পারিপার্শ্বিক অতিপ্রাকৃত বিপর্যয়-সমূহ ও ঘটনাবলীর মধ্যে যে সীমারেখা গড়ে উঠেছিল তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করল। মানসিকভাবে সে এসবের সমাধান জেনে সাহসী হল। তাই এইসব গল্পকাহিনীও তার সামাজিক জীবনকে শুধুমাত্র প্রভাবিত করল না, তার মনে 'কেন' এই প্রশ্ন থেকে উন্নততর মননশীলতার জন্ম হতে লাগল। সব কিছুকে তাদের অবস্থান অনুসারে ব্যাখ্যা করবার এই প্রবণতা মানবসমাজে নবদিগন্ত খুলে দিল।

সৃষ্টিবিষয়ক প্রতিটি লোকপুরাণের সঙ্গে এককালে একটি করে লোকাচার সম্পৃক্ত ছিল। আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছেন এমন আদিবাসী সমাজে তার দেখা মিলবে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজও সৃষ্টিবিষয়ক নানা কাহিনী শোনা যাবে, কিন্তু সেই লোকাচারটির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকাচারটি তো কাহিনীর চাইতেও পুরনো, যেখানে ধর্মীয় আচার ছিল জীবনের সঙ্গে যুক্ত, যখন ব্যাখ্যা খুঁজবার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। তখন ভাবাবেগেরই শুধু প্রাবল্য ছিল, লোকাচারটিই তাদের সন্তুষ্ট করে রেখেছিল। আমরা যদি সেই মূল লোকাচারটির সন্ধান পাই, তাহলে কিভাবে লোকপুরাণটির উৎসার ঘটল তাও জানা যাবে। আবার অনেক সময় লোকপুরাণের মধ্যেই লোকাচারটির বিবরণ থাকে। কিন্তু কালের পরিবর্তনে মানুষের মানসিক উত্তরণ ঘটে যায়, তাই আদিম লোকাচারটিই যে বর্তমান লোকপুরাণের মধ্যে বজায় রয়েছে এমন ধারণা করাও বোধহয় বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিযুক্ত নয়। তবু কোনো এক কালের অনেক সামাজিক রাজনীতি ও লোকাচারের নিদর্শন নানা কাহিনীতেই পাওয়া যায়।

সৃষ্টিবিষয়ক লোকাচার আজও যেসব সমাজে রয়েছে সেখানে এই অনুষ্ঠানে পশুবলির নিয়ম রয়েছে। আবার অন্য অনেক অনুষ্ঠানেও পশুবলির চলন রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর যে প্রান্তেই এই পশুবলি দেওয়া হোক না কেন, দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয় পশুর মাথাটি, মাংসল অংশটি মানুষ নিজের প্রয়োজনে রাখে। কিন্তু এই রীতি কেন? অনেকে নানাধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এর ব্যাখ্যা অবশ্যই পালটেছে। মাথার মধ্যে প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে বলেই একেই দেবতার কাছে দেওয়া হয়,—পরবর্তীকালের এই ব্যাখ্যা সমাজে প্রচলিত হয়। কিন্তু আদিম-কালে এই রীতিটি মানুষ জীবনের তাগিদে প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেন এই উৎসর্গ?

আদিম সমাজে ছিল ভয়াবহ খাদ্যাভাব।. একটি পশুকে শিকার করা বড় সহজ ছিল না। আর সেকালে দেবতাকে উৎসর্গ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু দেবতার প্রতি ভীতি জন্মায় নি। সেইকালে হাড় এবং চর্বি কিংবা পশুর মাথা যা খাদ্যের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়,—তাই উৎসর্গ করা হত। সামান্য মাংসও বাজে খরচ করা সম্ভব নয়, আর দেবতা ত প্রত্যক্ষভাবে কিছুই খান না। তাই এই সবচেয়ে খারাপ অংশটি উৎসর্গ করা হত। সময় বয়ে গেল, মূল কারণটি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল। আর এই লোকাচারটিকে কেন্দ্র করে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কাহিনীও পরবর্তীকালে গড়ে উঠল।

এই কাহিনীটি আমরা পাই গ্রীক কবি হেসিওডের গ্রন্থে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষদিকে হেসিওডের আবির্ভাবকাল। তার থিওগোনি গ্রন্থে এই বিবৃতি রয়েছে: টাইটান প্রমিথিউস জিউসের পক্ষ হয়ে লড়াই করলেও কোনোকালে জিউসকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন নি। কেননা, জিউস ছিলেন স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। প্রমিথিউস ছিলেন মানবিকতা সম্পন্ন ও উদার। একবার প্রমিথিউস দেবরাজ জিউসকে একটি ষাঁড় উৎসর্গ করলেন। প্রমিথিউস ষাঁড়ের হাড়গুলো চর্বিতে ঢেকে জিউসকে দিলেন। ওপর থেকে দেখে মনে হল বুঝি সবচেয়ে ভালো অংশ তাকে দেওয়া হল। জিউসকে প্রতারিত করা ও প্রতিশোধ নেওয়াই প্রমিথিউসের উদ্দেশ্য। জিউস সেটা গ্রহণ করলেন, মুহূর্তেই তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারলেন, কিন্তু তবু অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে তিনি সেটি গ্রহণ করলেন। আর তখন থেকেই সবচেয়ে বেশি হাড়যুক্ত অংশটি দেবতাব কাছে উৎসর্গের রীতি প্রচলিত হল।

গল্পটি যেভাবেই লোকপুরাণ হয়ে উঠুক না কেন, এর উৎস যে বহু প্রাচীনকালে তা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে খুঁজে বের করা যায়, আর এইভাবে একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সন্ধান মেলে। দেহের খারাপ অংশটি উৎসর্গ করার পেছনের কারণটি যখন অদৃশ্য হল, অর্থাৎ যখন কৃষিব মাধ্যমে আগের তুলনায় বেশি খাদ্য সংগৃহীত হতে থাকল, তখন সেকালের মানুষের মনে একটু ভীতি জন্মাল, দেবতাকে এই খারাপ অংশ দেবার জন্য কষ্টও হল। কিন্তু রীতিটি ত চলছেই। তখনই একে যুক্তিপূর্ণ করে তুলবার জন্য একটি লোকপুরাণের জন্ম হল। সৃষ্টিসম্পর্কিত লোকপুরাণের সঙ্গে এই বলিপ্রথা এক হয়ে মিশে গিয়েছে।

মহাভারতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্তটির মধ্যেও আগের সামাজিক চিত্রের সঙ্গে পরবর্তীকালের সংঘাত বাধার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। একসময় লোকসমাজে প্রয়োজন ছিল

জনসম্পদ, পশুসম্পদ ও শস্যসম্পদ। সেইকালে কুমারীর সন্তান হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সমাজ এই সম্পদকে চাইত বলেই কোনো অন্যায়ের প্রশ্ন তখন ওঠেনি। কিন্তু মহাভারতের আমলে কিংবা পরবর্তী কোনো কালে যখন কুমারীর সন্তানধারণের বিষয়টি নিন্দনীয় উঠে উঠল, তখনই একটি আরোপিত কল্পনা জুড়ে দিতে হল। কিন্তু তবু মহাভারতে সবটুকুই কিন্তু লুকোনো গেল না।

সূর্য এসে কুন্তীকে বললেন, 'তুমি ভীত হবে না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার ভোগবিলাস পূর্ণ কর।' কুন্তীকে সম্মত করে তার সঙ্গে সহবাসে প্রবৃত্ত হলেন। সূর্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হলেন। এটা সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। সূয তো দেবতা, কিন্তু এই পৃথিবীরই একজন। কিন্তু পরবর্তীকালে সূর্যের বরের কল্পনা করতে হলো, দৈহিক মিলনের মধ্যে অপার্থিব সম্পর্ক স্থাপন করতে হল। লজ্জাবশত পুত্রকে পরিত্যাগ করতে হল,—এই সামাজিক বিধি পরবর্তীকালে আরোপিত। সূর্যের মুখ দিয়েও বলাতে হল, 'হে বরবর্ণিনি! আমি বলছি, আমার প্রসাদবলে এতে তোমার কোনো দোষ হবে না।' কুন্তী যে কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধে সূযদেবের প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন নি—সেটাও পরবর্তীযুগের চিন্তা। মেরির কুমারী গর্ভে যীশুর জন্মবৃত্তান্তও এই একই কারণে অপার্থিব রূপ লাভ করেছে।

তবে প্রাচীন যুগে আদিম মানুষ ব্যক্তির জন্মরহস্যের কাহিনী-বর্ণনার প্রতি তেমন উৎসুক ছিল না। গোষ্ঠীগতভাবে সৃষ্টি বর্ণনা করাই ছিল তাদের অভিপ্রেত। তাই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ আজও যেখানে পাওয়া যাবে সেই আদি ভূমি আফ্রিকার দিকে তাকানো যাক। এগুলো প্রাচীনতম নিদর্শন বলেই অত্যন্ত সহজ সরল, কাহিনীর জটিলতা অনুপস্থিত। আর এগুলি প্রাচীনতম বলেই পশুপাখির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে।

এখানকার গল্পগুলোতে একটি বিষয় আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। তা হল, প্রথম থেকেই একজন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ধরে নিয়েই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণগুলি গড়ে উঠেছে। একেবারে কিছু ছিল না, সবকিছুই শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই ধরণের সূক্ষ্ম চিন্তার দেখা পাওয়া যাবে না। এর ফলেও আদিমতম চিন্তার রেশ যে এগুলোর মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ মেলে।

আফ্রিকার ইয়াও আদিবাসী সৃষ্টিপুরাণে আছে, একেবারে আদিকালে কোনো মানুষ ছিল না, ছিলেন শুধু মুলুংগু আর তার লোকজন। এই লোকজন হল পশুপাখি। তারা মহাসুখে এই পৃথিবীতে বাস করতেন। কিন্তু পরে জন্মালেও

মানুষ ছিল সবচেয়ে দুষ্টু। তারা আগুন জ্বালিয়ে পশুদের বনের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করল। আর মুলুংগুও টিঁকতে পারল না পৃথিবীতে। মানুষের অত্যাচারে সেও আকাশে আশ্রয় নিল। মানুষ এমনই ছিল শয়তান। এখানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মানুষের চরিত্রের স্বরূপটি অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে। আদিম সৃষ্টিকর্তাও মানুষের কাছে পরাজিত।

জাম্বেজি নদীর ওপর অংশে থাকেন বারোত্‌সে আদিবাসী। তারা বলেন, সৃষ্টির আদিতে সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন নিয়াম্বি। তিনি সৃষ্টি করলেন পশু, মাছ, পাখি। তখনও তিনি তার স্ত্রী নাসিলেলে-কে নিয়ে পৃথিবীতেই বাস করেন। এই নিয়াম্বির সৃষ্ট একটি জন্তু অন্যদের তুলনায় একেবারে আলাদা। তার নাম কামোনু। নিয়াম্বি যা করেন, কামোনু তাই নকল করে। নিয়াম্বি যখন কাঠের কাজ করেন, সে-ও তাই করে। লোহার কাজ করেন নিয়াম্বি, কামোনুও তাই করে। এই কামোনু হল মানুষ। কিছুদিন পরে নিয়াম্বি কামোনুকে ভয় পেতে শুরু করলেন। একদিন কামোনু বর্শা দিয়ে একের পর এক হরিণ মারতে শুরু করল। নিয়াম্বি ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'এরা তোমার ভাই, এদের আর কখনো হত্যা করো না।'

তবু সে কথা শোনে না। তাকে এক দ্বীপে নির্বাসন দিলেন। সেখান থেকেও সে চলে এল। তখন নিয়াম্বি তাকে চাষ করবার জন্য একখণ্ড জমি দিলেন। কামোনু সব কিছু জেনে ফেলছে, তাকে আরও ভয় পেতে শুরু করলেন নিয়াম্বি। এবার নিয়াম্বি পালালেন অন্য দ্বীপে। সেখানেও কামোনু উপস্থিত। সে নৌকো বানাতে জানে। শেষে নিয়াম্বি এক বিশাল পর্বত সৃষ্টি করে তার চূড়ায় বাস করতে লাগলেন। সেখানেও উঠবার কৌশল কামোনু আবিষ্কার করে ফেলল। ইতিমধ্যে কামোনুর মত অসংখ্য মানুষ জন্মাতে জন্মাতে পৃথিবী ভরে গেল।

শেষকালে নিয়াম্বি পাখিদের পাঠালেন দেবতার শহর লিটোমা-র সন্ধান নিতে। পাখিরা ব্যর্থ হল। শেষকালে তিনি মাকড়সার দ্বারস্থ হলেন। মাকড়সা জাল বুনে আকাশে তুললেন নিয়াম্বিকে। নিয়াম্বি আকাশে উঠেই মাকড়সার চোখ উপড়ে নিলেন, সে আর কোনোদিন আকাশের পথ দেখতে পেল না।

কামোনুও ছাড়বার পাত্র নয়। সব মানুষকে জড়ো করে সে গাছ কেটে একটার ও পরে আর একটা সাজাতে লাগল কিন্তু এত ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ল তলার খুঁটি। কামোনু আর কোনোদিন আকাশের পথ খুঁজে পায়নি। তবু

প্রত্যেকদিন সকালে সূর্য ওঠেন, কামোম্ব তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজা এসেছেন।' অন্য সব মানুষ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে তাকে অভিনন্দন জানায়। আর আকাশে চাঁদ উঠলে তারা বলে, 'এ হলো নাসিলেলে, নিয়াম্বির বৌ।'

এখানেও মানুষের জয়। আফ্রিকার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সংগ্রামী মানুষ নিজেকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের পশুপালক অবস্থা থেকে কৃষিজীবী হওয়ার ইঙ্গিতটিও এর মধ্যে সুস্পষ্ট।

কংগোর ন্‌গোম্বে আদিবাসীরা মনে করেন, সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা মানুষের মতোই বাস করতেন। এই সৃষ্টিকর্তা হলেন আকোংগো। মানুষ খালি ঝগড়া করত। একদিন এমন ঝগড়া বেধে গেল যে আর কিছুতেই থামে না। আকোংগো বিরক্ত হয়ে মানুষকে ফেলে একা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। তখন থেকে আর কেউ তাকে দেখেনি। তাই আজকের মানুষ আর বলতে পারে না তিনি কেমন দেখতে।

মানুষের স্বভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই কাহিনীতে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ফসল নিহিত থাকে লোকগল্পগুলোর মধ্যে।

পৃথিবীতে মানুষ এল কিভাবে ? এই ন্‌গোম্বে আদিবাসী আর একটি লোক-পুরাণে বলছেন, পৃথিবীতে আগে কোনো মানুষ ছিল না আকোংগোর সঙ্গে আকাশে সুখে-শান্তিতে তারা বাস করত। কিন্তু সেইকালে সেখানে একটি নারী ছিল যে সবসময় সকলকে বিরক্ত করত।

অনেকদিন সহ্য করবার পরে আকোংগো একদিন একটা ঝুড়িতে চাপিয়ে সেই নারী, তার এক ছেলে আর এক মেয়েকে দড়ি দিয়ে নামিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। সঙ্গে একটা বাগান তৈরি করবার মত কিছু শস্যবীজ দিলেন। তারা বাগান তৈরি করে জমিতে অনেক ফসল ফলালেন।

একদিন মা তার ছেলেকে বললেন, 'আমরা মারা গেলে এইসব জমি দেখবে কে ? তোমার ছেলেমেয়ে হওয়া দরকার।' ছেলে বলল, 'আমার বৌ কোথায় ? এখানে তো শুধু আমরাই আছি।'

মা বললেন, 'তোমার বোন একজন নারী। তাকে বিয়ে কর, ছেলেমেয়ে হবে।'

ছেলে তো কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে মরে গেলে বাগান দেখার কেউই থাকবে না ভেবে বোনকে বিয়ে করল। তাদের ছেলেমেয়ে হল। এইভাবে পৃথিবীতে লোকবসতি বাড়ল।

এই লোকপুরাণের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের একটি সত্য নিহিত রয়েছে। পূর্বে ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। আজকের দিনে একটি পুরুষ একটি নারীকে বিয়ে করবে,—এর মধ্যে কেউই অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান না। কেননা, বর্তমানে এটাই সমাজরীতি। সেইকালেও ভাইবোনের বিয়েতে কেউ কিছু অস্বাভাবিক দেখে নি, কেননা সেটাই রীতি ছিল। ভাই যে মৃদু আপত্তি করল তা পরবর্তীকালে গল্পে আরোপিত হয়েছে। দশরথ-জাতকে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে, রামচন্দ্র নিজের সহোদরা ভগ্নী সীতার পাণিগ্রহণ করে কুলপ্রথা রক্ষা করলেন, রাজা হলেন। যেকালে এই রীতি ছিল সেকালে এর মধ্যে কদর্যতা অনুভব করবার কোনো অবকাশ ছিল না। পরে সমাজ-বিবর্তনের ধারায় পারিবারিক সম্পর্ক যখন উন্নত হল, মানুষের সম্পর্কগত মূল্যবোধ যখন পরিশীলিত হল তখনই এই ধরনের বিবাহবন্ধন সমাজ থেকে উঠে গেল। আর এখনও কি এ জাতীয় সম্পর্ক গড়ে উঠছে না? একটি সমাজে মাসতুতো ভাই কিংবা মামা অত্যন্ত নিকট সম্পর্কের, এত মধুর স্নেহ-শ্রদ্ধার পাত্র যেখানে, দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তাও কেউ করে না। কিন্তু অন্য একটি সমাজ-ব্যবস্থায় এই বিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক। মানসিকতার প্রশ্নই বড়।

যাইহোক লোকপুরাণের মধ্যে এইভাবে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রের সন্ধান আমরা পেয়ে যাই।

প্রাসঙ্গিকভাবে সৃষ্টিবিষয়ক একটি অতি-পরিচিত লোকপুরাণের উল্লেখ করতে হয়। আদম আর ইভ তো শাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীতে এলেন। তাদের ছেলেমেয়েরাই পৃথিবীর মানব-মানবী। এখানে প্রশ্ন থাকে, আদম-ইভের ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ ভাইবোনে বিয়ে না হলে, আদমের ছেলে বৌ কোথায় পেল, আদমের মেয়ে স্বামী কোথায় পেল? নিশ্চয়ই তাদের ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকেই স্বামী-স্ত্রী বেছে নিতে হয়েছিল? আসলে এভাবে পৃথিবীতে মানব-মানবী আসে নি। এসেছে কিভাবে তা আমরা চার্লস ডারউইনের গবেষণা থেকে জেনেছি। কিন্তু লোকপুরাণে এই ভাইবোনে বিবাহের পর পৃথিবীতে লোকবসতির কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে একটি সামাজিক সত্যকে অবশ্যই খুঁজে পাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে বাসুতো আদিবাসীদের লোকপুরাণে আছে, সেই প্রথম অবস্থায় হুভেয়ানে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পরে তিনি আকাশে রয়ে যান, পৃথিবীতে আর নামেন না।

সিয়েরা লিওনের মেন্ডে আদিবাসীরা দেবতাদের নামকরণের লোকপুরাণে

বলছেন, অনেক অনেক কাল আগে ন্গোয়া পৃথিবী এবং অন্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে তিনি সৃষ্টি করলেন একটি মানবপুরুষ ও একটি নারীকে। তারা ন্গোয়োর নাম জানত না, তাকে ডাকত মান্ডা-লো বলে। এর অর্থ—'সে হল আমাদের পিতামহ।' মানুষ সবসময় তার কাছে এটা-ওটা চাইত, তাই তিনি অনেক ওপরে সেই দূর আকাশে তার স্থান করে নিলেন। তখন থেকে মানুষ তাকে বলে, 'লেভে'। এর অর্থ অনেক উঁচুতে।

ঘানার আশান্তি আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সৃষ্টিকর্তা ওনিয়ানকোপোন পৃথিবীতে কিংবা আমাদের অতি কাছেই বাস করতেন। কিন্তু কয়েকজন বুড়ির অত্যাচারে তিনি দূর আকাশে চলে যান।

ঘানার ক্রাচি আদিবাসী লোকপুরাণে আছে, আদি স্রষ্টা হলেন উল্‌বারি। প্রথম দিকে উল্‌বারি আর মানুষ একসঙ্গে মাতা বসুমতীর ওপরে বাস করতেন। শেষকালে লোকের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে মানুষগুলো হাঁটাচলা করতে পারত না। তারা উল্‌বারির কাছে খালি নালিশ জানাত। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে দূর আকাশে চলে গেলেন। তখন থেকে মানুষ তাকে পুজো দিতে পারে, কিন্তু তার কাছে পৌঁছতে পারে না। এইভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

দাহোমের লোকপুরাণেও আছে, পুরনো কালে আকাশ থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারী আদ্‌জার সোমে এলাকায় নেমে আসে। তারাই পৃথিবীতে প্রথম পরিবার।

আমাজুলু আদিবাসীদের বিশ্বাসে, আন্‌কুলুনকুলু হল পৃথিবীর প্রথম মানুষ। তার আগেই পৃথিবী ছিল। তিনি পৃথিবীর বুকে একগুচ্ছ নলখাগড়া মধ্যে থেকে জন্মেছেন। আন্‌কুলুন্‌কুলু-র জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নলখাগড়া থেকে জন্ম হল সবজিনিসের, জন্তু-জানোয়ার, শস্য সবকিছুর।

প্রাচীনতম সৃষ্টিবিষয়ক যেসব লোকপুরাণের উল্লেখ করলাম, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই :

১) কাহিনীগুলি অত্যন্ত সরল, কোনো জটিলতা নেই।

২) আদিতে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন।

৩) সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন মানুষ, পশু, পাখি, অরণ্য, কখনও বা এই পৃথিবীও।

৪) তিনি বাস করতেন এই পৃথিবীতে।

৫) এখন তিনি পৃথিবীতে থাকেন না, থাকেন দূর আকাশে।
৬) মানুষের কাছে, মানুষের সঙ্গেই তিনি বাস করতেন।
৭) এখন মানুষের কাছে থাকেন না।
৮) আগে মানুষ তাকে দেখতে পেত, কথাবার্তা বলতে পারত।
৯) এখন শুধু পুজো দিতে পারে, মানুষ তাকে দেখতে পায় না, তার কাছে যেতে পারে না।
১০) সৃষ্টিকর্তা কখনও কখনও মানুষকে ভয় পেয়ে থাকেন।
১১) তিনি মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হন।
১২) মানুষের ভয়ে তিনি পৃথিবী ছেড়ে পালিয়েছেন।
১৩) মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন।
১৪) মানুষ স্বভাবতই বড় ঝগড়ুটে, বিরক্তিকর।
১৫) স্রষ্টার কাছে আকাশে মানুষ থাকতে পারেনি, নিজের দোষে স্বর্গ বা আকাশচ্যুত হয়েছে।
১৬) দুটি নরনারী পৃথিবীতে প্রথম এসেছে, পুত্রকন্যার সমস্যা সমাধান করেছে ভাইবোনের বিয়ে দিয়ে।

আমরা সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ সম্পর্কে সাধারণত যেসব ধারণা গড়ে তুলি, তার সঙ্গে এইসব আদিমতম লোকপুরাণের পার্থক্য রয়েছে। তার কারণ, আমরা ভারতবর্ষ ও গ্রীসের লোকপুরাণ সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল, যেসব ধর্ম অতি পরিচিত সেইসব ধর্মীয় লোকপুরাণে আমাদের অতি চেনা। কিন্তু আফ্রিকার এইসব সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণের মধ্যে দিয়ে আদিম সমাজমননের মূল ধারাটি না জানলে পরবর্তী ধারাকে অনুধাবন করা কষ্টকর হবে।

আদিম সমাজ-মননে কয়েকটি বস্তু খুব প্রাধান্য পেয়েছে, যেগুলি আমরা মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে পাই। আমাদের দেশে সাঁওতালী সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণেও তার উল্লেখ রয়েছে। তবে এসবই আরও কিছুকাল পরের লোকপুরাণ, আর এদের মধ্যে পরবর্তীকালের মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট।

যেসব দেশে মৌসুমীর প্রভাব বেশি, সমুদ্র-নদী যে এলাকায় বেশি, যে এলাকায় বর্ষাকাল দীর্ঘ হয়,—সেসব দেশে বন্যা ও সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ বেশি। আর এইসব দেশের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে জলজ প্রাণী মাছ ও কচ্ছপ এবং জলাভূমির

প্রাণী শুয়োরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো অবশ্য প্রাচীন টোটেম পূজার স্মৃতিও বহন করছে।

ডিম আর একটি বস্তু যা সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে লক্ষ্য করা যাবে। ডিমের বিবর্তনটি প্রাচীন মানুষের কাছে ছিল বিস্ময়। ডিম তো একটি জড় পদার্থ। সে নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে না। ডিম ফাটালেও কোনো জ্যান্ত বস্তু বের হয় না, বের হয় কিছু তরল পদার্থ। অথচ কিছুকাল মায়ের বুকের তলায় থাকার পর তার থেকে একটি সজীব প্রাণ ফুটে বেরোয়। অথচ খোলসের মধ্যে দিয়ে কিছুই তো প্রবেশ করানো হয়নি। জীবতত্ত্বের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল বলেই মানুষকে বিস্মিত করেছে। আর এই বিস্ময় থেকে, এবং পাখিসম্পদ আহার হিসেবে পাওয়ার অভিজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা থেকে জন্ম হল ডিমকে কেন্দ্র করে কিছু প্রাচীন লোকপুরাণ।

এমন কি অনেক পরবর্তীকালের ভারতীয় মহাভারতেও আছে, প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভু মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ মনু জন্মলাভ করেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঞ্জাত হল। অণ্ড বা ডিম মানুষের বিস্ময়কে কতদূর নিয়ে যেতে পেরেছিল যার ফলে সে বলতে পারে যে অণ্ডই সমস্ত বস্তুর বীজভূত একটি বস্তু।

অধুনা সৃষ্টিবিষয়ক যেসব লোকপুরাণ সংগৃহীত হয়েছে এবং যেগুলি বেশি পরিচিত তার আদি পিতা বোধহয় হিব্রু লোকপুরাণ।

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে ছিল জলময় বিশৃঙ্খলা। সৃষ্টির দায়িত্বভার অর্পণ করা হল ইলোহিমের ওপর। ছটি ভাগে ভাগ করা হল, প্রতিটি কাজ একদিনে সারতে হবে। সৃষ্টির বিষয়টি এইভাবে ঘটল : ১) আলোক ২) আকাশ ৩) শুকনো জমি—পৃথিবী। সমুদ্র থেকে পৃথিবী আলাদা হয়ে গেল ৪) গাছপালা ৫) আকাশের বস্তুসকল,—সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি ৬) পাখি, মাছ,—তারপরে পশু ও মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে।

এই লোকপুরাণেরই আর একটি ভাষ্যে আছে, বিশ্বসৃষ্টির আদিতে ছিল জলশূন্য অকর্ষিত ভূমি, কোনো গাছপালা ছিল না। সৃষ্টির দায়িত্বভার অর্পণ করা হল ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ ইলোহিমের ওপর। কিন্তু কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হল না। এইভাবে

সৃষ্টিকার্য ঘটল : ১) মানুষ, ধুলোমাটি থেকে সৃষ্টি হল ২) ইডেনের উদ্যান ৩) সব ধরণের বৃক্ষ, জীবন-বৃক্ষ, জ্ঞানবৃক্ষ,—এই জ্ঞান ভালো ও মন্দের মিশ্রিত রূপ ৪) পশু, পাখি (মাছের কোনো উল্লেখ নেই) ৫) নারী,—মানুষ থেকেই জন্ম।

আদিম লোকপুরাণের মধ্যে যে সরল কাহিনীবিন্যাস পেয়েছি, এই সময় থেকেই তা জটিলতর হতে শুরু করল। সরল অবস্থা থেকে এই জটিলতায় আসতে সমাজ-মননকে নিশ্চয়ই অনেক কাল অনেক ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সেইভাবে লোকপুরাণগুলিকে পরম্পরায় আজও সাজানো হয়নি, আর সবগুলিকে এখনো সংগ্রহও করা যায়নি। কিন্তু জটিলতর রূপের যে ধারা তার সন্ধান অবশ্যই আমরা পেতে পারি। লোকপুরাণগুলির কাঠামোগত দিক নিয়ে পাশ্চাত্যে যেসব কাজ হয়েছে তার অধিকাংশই কাঠামোগত বিশ্লেষণ নিয়ে। সমাজমনের পরিচয় জানার তাগিদ উনিশ শতকে অনুভূত হয়েছিল, কাজও হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে কাঠামোর প্রতি বেশি দৃষ্টি পড়েছে। আর আমাদের দেশে লোকপুরাণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী কাজের নেহাতই অভাব।

অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, মেসোপটেমিয় ও সুমেরিয় লোকপুরাণই পরবর্তীকালে রূপ বদলে ক্লাসিকাল লোকপুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে যে ধরণের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব পরিচিত, সেরকম কোনো লোকপুরাণের নিদর্শন যে আদিম অবস্থায় ছিল না তার কিছু প্রমাণ আগে দিয়েছি।

সুমেরিয় যেসব প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমরা জেনেছি, সুমেরিয় সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ তিনটি অংশে বিভক্ত : বিশ্বসৃষ্টি, বিশ্বে শৃঙ্খলা ও মানুষের জন্ম। সমুদ্রই হল আদি মাতা, তিনি জন্ম দিলেন আকাশ ও পৃথিবীর। এই আকাশ বা স্বর্গই হল দেবতা আন, আর পৃথিবী হল দেবী কি, —তাদের মিলনে সৃষ্টি হল বায়ুদেবতা এন্‌লিল-এর, তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে আলাদা করে দিলেন। তারপর বিশ্বে এল শৃঙ্খলা, তার গঠন সুষ্ঠু হল। এই অবস্থার বিবরণ বেশ জটিল। শেষ পর্যায়ে লাহার এবং আশানান্ লোকপুরাণ শেষ হয়েছে মানুষের সৃষ্টিতে। মানুষের সৃষ্টি হল দেবতাদের সেবা করবার জন্য।

কেন সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণগুলি জটিল হয়ে উঠছে, কারণ সমাজের কাঠামো, সম্পর্ক, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন পদ্ধতি সবই জটিলতর রূপ নিচ্ছিল। আর তাই সমাজ-মানসিকতার স্পষ্ট-চিত্র ফুটে উঠছে এইসব লোকপুরাণে।

প্রাচীন মিশরের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে সূর্যদেবতা আটুম-রে হলেন আদি উৎস। নীলনদীর সঙ্গে এই লোককাহিনী যুক্ত। কৃষিভিত্তিক সমাজের মূলটি তখন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে, লোকপুরাণের মধ্যেও প্রাথমিক বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছে। তাই সূর্যদেবতা, বৃষ্টিদেবতা, অগ্নিদেবতা সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে প্রাধান্য পেতে শুরু করলেন। আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

জটিল একটি সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের উল্লেখ করছি, যার মধ্যে দিয়ে একটি বিস্ময়বোধ কিভাবে যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানার্জনের পথে অগোতে চেষ্টা করছে তা জানা যাবে। মানুষের মনন কিভাবে বিবর্তিত হচ্ছে তার প্রমাণ মিলবে।

সময়ের আদিতে কোনো দেবতা, কোনো মানুষ ছিল না। বিশ্ব ছিল বিশৃঙ্খলায় ভরা। সমস্ত জায়গায় জল, বায়ু ও ঘূর্ণায়মাণ মেঘপুঞ্জ বাষ্পাকারে ঘুরে বেড়াত। কোনো বিশেষ আকার তাদের নেই। বিশাল শূন্যতার মাঝে কোনো জীবজন্তুই ছিল না।

তখন এক সর্বশক্তিমান আত্মা এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। আজকে আমরা যে বিশ্বকে দেখি তা গঠিত হতে শুরু করল। সমুদ্র, নদী ও সরোবরের জলরাশি একটি বিশেষ জায়গায় স্থান করে নিল, স্থলভূমিকে আর প্লাবিত করল না। উত্তুঙ্গ পর্বত শান্ত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার সুউচ্চ চূড়া মেঘের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য। নিচের অংশটির নাম হল পৃথিবী।

বাষ্পীয় পদার্থসকল দূরীভূত হল, মাটি থেকে পর্বতের চূড়া পর্যন্ত নির্মল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল আকাশে দেখা দিল চন্দ্র ও অসংখ্য তারকা। তারপরে এল আর একটি চঞ্চল বস্তুপিণ্ড, তার নাম সূর্য। সে পথ-পরিক্রমা করে আকাশপথে, তার পথচলায় ভাগ হয়ে গেল দুটি সময়: উজ্জ্বল আলোকস্নাত দিন আর অন্ধকার ভীতিপ্রদ রাত্রি।

এবার জন্মাল ঘাস, তারপরে গাছপালা, ফুল। এরা পৃথিবীকে রঙে রঙে সাজিয়ে তুলল। নদী-সরোবর-সাগরে নানারঙের বিচিত্র মাছ সাঁতার দিয়ে আনন্দে মেতে উঠল। নানাধরনের জন্তু-জানোয়ার, ছোটবড় পশু স্যাঁতসেঁতে বনভূমিতে ঘুরতে লাগল। সবশেষে এল মানুষ।

আদিম মানবমনন বিবর্তনের পথে এইখানে এসে দাঁড়াল, তার চিন্তা-চেতনার এই স্তরের পরিচয় মিলবে সৃষ্টিবিষয়ক ক্লাসিকাল লোকপুরাণে।

বিজ্ঞানীরা যেমন করে বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে মাটি-পাথর-গাছের শেকড়ের স্তরগুলি সরিয়ে সরিয়ে জীবাশ্মের সন্ধান করেন, তেমনি লোকপুরাণের বাইরের আপাত-অবিশ্বাস্য অতিপ্রাকৃত অপার্থিব কাহিনীর আড়ালে যে সমাজমনন ও বিশেষ-কালের রীতিনীতি লুকোনো রয়েছে তাকে উদ্ধার করাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় কাজ। মানুষের সামাজিক ইতিহাস লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে যতদিন না লোক-পুরাণের মর্মবস্তু উদ্‌ঘাটিত হয়।

লোকপুরাণ ঃ রূপ ও আঙ্গিক

—সনৎকুমার মিত্র

এক. মিথ্ কি ?

ইংরেজীতে মিথ্ [myth] বলে একটি সুপরিচিত শব্দ আছে। এর বুৎপত্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে মনে করা হয়েছে যে : এই মিথ্-এর মূলে রয়েছে mu বা muth—যার অর্থ কথা বা মুখের কথার মাধ্যমে যোগাযোগ করা ['...in connexion with speech or communication by word of mouth.']। অনেক তর্ক পেরিয়ে এই তত্ত্ব কেউ কেউ স্বীকার করেছেন যে এই মিথে শব্দের আদিতে আছে 'muthos' [গ্রীক্] 'mouth' [ইংরেজী], 'mund' [জার্মান] 'mentum' [ল্যাটিন] ইত্যাদি। এবং এর তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যাখ্যা ও পরিধি নিয়ে বহু এবং দীর্ঘকালব্যাপী মতান্তর হওয়ার পর মোটামুটি ভাবে যে মৌল সিদ্ধান্তে এসে সবাই স্থির হতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই : ক. মিথ্-এ একটি গল্প আছে বা কাহিনীই মিথের প্রাণ ['A myth is a tale'...]। খ. মৌখিক ঐতিহ্য অর্থাৎ অনন্ত কালসমুদ্রে মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়ানোই এর বৈশিষ্ট্য ['an oral communication']। তাই কেউ কেউ একে Verbal art বলতে চেয়েছেন। গ. লোক-সংস্কৃতির [Folklore] কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন এর গায়েও আঁকা রয়েছে। যেমন : ১. মিথ্ কার দ্বারা, কবে, কোন তারিখে রচিত হয়েছিল তা বলা যায় না ['...evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations']। 'ব্যক্তি ও বংশ-পরম্পরায় ক্রমবিকাশ লাভ করে, ইহা কদাচ বিশেষ কোনো সময়ে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট হয় না'। ২. এ-হচ্ছে collective creation, কখনও কোনো একজনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকলেও তা কালের বিবর্তন ধারায় সমষ্টির—গোষ্ঠীর বা সমগ্র মানব জাতির সম্পত্তিতে পরিণত হয় বা হয়েছে। ৩. একে 'হয়ে ওঠা' সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ৪. নিরন্ত পরিবর্তনশীল, বিবিধবর্ণে রঞ্জিত। এবং ৫. সম্প্রসারণশীল, পরিবর্জন-পরিবর্তন-পরিমার্জনসহ এবং ভ্রাম্যমাণ। ঘ. মিথ্ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, সেই কবে কোন আদিমকালে—যেদিন অপরিণত বুদ্ধি মানুষ সৃষ্টির মধ্যে রহস্য ভেদ

করবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলো। অর্থাৎ এর গল্পগুলি সেই কৌতূহলের কথিত বা বাণীরূপ। ঙ মিথ্-এর গল্প-সৃষ্টিতে যে কল্পনা কাজ করেছে তা একদিকে যেমন আদিম, অন্যদিকে তেমনি প্রাক্-বিজ্ঞান সময়ের বৈজ্ঞানিক ভাবনা-জাত ['·· the science of a pre scientific age']। চ. মিথের গল্প-কথা সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থাৎ আজকের সমুন্নত বিজ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে গাল-গল্প বা আষাঢ়ে গল্প হিসাবে পরিগণিত হলেও প্রাচীন বা সেই সব আদিম মানুষের কাছে মিথ্ ছিলো 'সত্য ইতিহাস', 'পবিত্র-কাহিনী' ['·· myth means true story' a story that is a most precious possession, because it is sacred·· ']। ছ. মিথ্ সব সময়েই কোন না কোন, কিছু না কিছুর সৃষ্টির কথা বলে ["Myth, then, is always an account of a 'creation' ;]। যেমন, কিভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হলো। কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হলো ; কেনই বা তার মৃত্যু হয় [অর্থাৎ 'মৃত্যু'র অর্থ কি ?]। পশু-পাখী-জীব-জন্তুর আকার আকৃতি, কাজ-কর্ম, স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণ ও হেতুগুলি কি ? বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংঘটন ও ঘটনার তাৎপর্য কি ? ইত্যাদি। জ. মিথ্ হচ্ছে দেবতা-নির্ভর অলৌকিকতা-মূলক এবং বহুক্ষেত্রে রূপকাশ্রয়ী একটি গল্প-কাহিনী। ছ. মিথ্ কোন না কোন ধর্মমতের অঙ্গীভূত ['myths are the embodiment of dogma']। ঞ. সাধারণত পবিত্র ['usually sacred']। ট. মিথ্ কাহিনীর চরিত্রগুলি সাধারণত মানবীয় হয় না ['usually not human beings']। ঠ. অধিকন্তু, অধিকাংশ মিথ্-ই নিদানতাত্ত্বিক ['More-over, most myths, if not all, are ætiological']। ড. মোটামুটি ভাবে মিথ্ হচ্ছে : 'পুরাকাহিনী [এঁর মতে মিথের বাংলা প্রতিশব্দ] যতই প্রাচীন এবং অবিশ্বাস্য হউক না কেন, ইহার ঘটনারাশি পুরাকালে প্রকৃতই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আদিম ও লোকসমাজ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে সৃষ্টির কিভাবে উদ্ভব হইল, কিভাবে জীবের জন্ম হইল, দেবদেবীগণই বা কিভাবে উদ্ভূত হইলেন, ধর্মবিশ্বাসেরই বা কিভাবে সৃষ্টি হইল, তাহাই কাহিনীর আকারে বর্ণনা করা হয়। অলৌকিক চরিত্রই এই সকল কাহিনীর নায়ক-নায়িকা, অলৌকিক আচরণ তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ ; স্বর্গ-অন্তরীক্ষ-মর্ত্য-পাতাল ইহার ঘটনা স্থান।' কিন্তু এত কিছু বলার পরেও মন্তব্য করা যায় যে, মিথ্-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন,—বিশেষ করে সর্বজন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা। কারণ, মিথ-এর কায়া নির্মিত হয়েছে চরম মিশ্রিত নানা সাংস্কৃতিক উপাদানে, ফলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই মিথ্-এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলে।

দুই. মিথ্-এর আত্মীয়গণ :

মিথের জন্ম-বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বিশেষত্ব এবং অপরাপর কয়েকটি প্রবণতার জন্য এ কয়েকজন নিকট আত্মীয় লাভ করেছে,—যাদের সঙ্গে একে কখনও মিশিয়ে ফেলা হয়, কখনও বা একটা সমান্তরাল ও সমধর্মী সম্পর্ক বজায় রেখে লোক-সমাজেও চলতে থাকে।

১। মিথ্-এর সব চেয়ে নিকট আত্মীয় হচ্ছে লেজেণ্ড [Legend]। সংস্কৃতি চর্চাকারিগণ। মনে করেন যে মিথ্ ও লেজেণ্ডের মধ্যে সব সময় সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। ['The line between myth and legand is often vague']। তবুও একটা বিভেদ উভয়ের মধ্যে আছে। এই ভেদরেখা ও পার্থক্য সম্পর্কে নানা দেশীয় ও সুবিস্তৃত আলোচনার নির্যাস নিষ্কাশিত করে লোকসংস্কৃতিবিদ্ বলছেন: 'পুরাকাহিনী কিংবা myth-এর সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, দেব-দেবী ও অন্যান্য অলৌকিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া পুরাকাহিনী রচিত হয়, কিন্তু লৌকিক কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া legend বা ইতিকথা রচিত হয়।...পুরাকাহিনী [myth]-র সঙ্গে ইতিকথা [legend]-র অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনীর চরিত্রগুলি নির্বিশেষ, কিন্তু ইতিকথার চরিত্রগুলি এক একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। ইতিকথার চরিত্রগুলি একদিন যে এই সমাজেরই মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমাজের দশজন লোকের মতই আচরণ করিতে গিয়া অসাধারণত্ব দেখাইয়া গিয়াছে, সমাজ মন তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তাহাদের চরিত্রের মধ্য দিয়া যে অতিমানবত্বের [super-man] ভাবই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা যে একদিন সমাজের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল, তাহা ইতিকথার মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। পুরাকাহিনী ও ইতিকথার মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনীর মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপ-ব্যাখ্যা [misinterpretation]-ই শুনতে পাওয়া যায়, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্লেষণই ইহরে প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ইতিকথার উদ্দেশ্য তাহা নহে—ব্যক্তি বিশেষের অলৌকিক চরিত্র-মহিমা কিংবা জাতির কোনও বীরত্বমূলক কাহিনী বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরাকাহিনী ও ইতিকথার এই যে পার্থক্যের কথা বলিলাম, তাহা যে

সর্বদাই খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, তাহা নহে।...কিন্তু বাহির হইতে ইহা যতই অস্পষ্ট হউক, ইহাদের উভয়ের আভ্যন্তরীণ মৌলিক পার্থক্যের বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।' এই পার্থক্য নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে : ক. সত্য-কাহিনীর মত করেই লেজেণ্ড বলা হয়ে থাকে ['The Legend is told as true,'] খ. লেজেণ্ডের পবিত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা গুণ অধিক গুরুতর ['.. they are usually secular rather than sacrcd.']।

২। এরপর মিথের যে সব আত্মীয় আছে তাদের মধ্যে টেল বা লোককথার [Folktale] সঙ্গে আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতাও কিছু কম নয়। কোন কোন সমালোচক বলতে চেয়েছেন যে, যে সমস্ত সমাজে আজও মিথ-এর প্রচলন আছে সেখানে একে 'সত্যি কথা' ['true stories'] বলা হয় এবং নীতিগল্প ও কথাকে 'মিথ্যে কথা' বলে ["..fables and tales, which they call 'false stories'.]। এই সব সমালোচকেরা মিথ্-এর থেকে টেল্ এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে লেজেণ্ড ও টেল-এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলেছেন। কেননা, তাঁরা বলছেন : 'সত্যকথা' বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে আলোচনা করে, এর পাত্র-পাত্রীরা হচ্ছেন দৈবী, অতিলৌকিক, স্বর্গবাসী, অথবা নাক্ষত্রিক ['...all those deal with the beginnings of the world ; in these actors are divine beings, super natural, hevenly, or astral'.]। অপরপক্ষে, 'মিথ্যেকথা'র বর্ণনীয় বিষয় হচ্ছে জাতীয় বীরদের দুঃসাহসিক কাজ, ধীরোদাত্ত এক যুবক যে জনগণকে দৈত্য, দুর্ভিক্ষ, দৈব পীড়ন থেকে রক্ষা করে, এবং অপরাপর উপকারাত্মক কাজকর্ম করে থাকে ['...Which relates the marvellous adventures of the national hero, a youth of humble birth who became the savior of his people, freeing them from monsters, delivering them famine and other disasters, and performing other noble and beneficent deeds']।

আমরা পরে কয়েকটি কাহিনী উদ্ধৃত করে মিথ্, লেজেণ্ড ও টেল্-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণপূর্বক বোঝাবার চেষ্টা করবো। আসলে আমাদের চারপাশে সাধারণ মানুষ-জীবজন্তু প্রভৃতিকে নিয়ে যে 'রচা'-গল্প শুনতে পাই—যার মধ্যে দেবত্ব, অলৌকিকত্ব বা কোন কিছুর জন্মকথা নেই তাকেই আমরা টেল্ বা লোককথা বলতে পারি। জনৈক আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্ এ-বিষয়ে সংক্ষেপে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলছেন : 'মিথ্ মূলত ধর্ম ও দেবতাকে

নিয়ে তৈরী ; টেল্-এর মধ্যে মানুষ এবং তার সামাজিক সংস্কারই প্রধান'। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যটিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারি যে আমরা যেভাবে জীবন-যাপন করি, যাদের নিয়ে জীবন-যাপন করি, এই জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা মুখে মুখে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে তাদের নিয়ে যে 'রচা'-গল্প তাকেই টেল বলা যায়। ['Prose narratives that are regarded as fiction are called folktales. They usually recount the adventures of animals or humans,…']—এ অবশ্যই মৌখিক ও জনশ্রুতিমূলক। এ-কথা বলার পর স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে এর সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকদের রচিত [যেমন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়] গল্প-কাহিনীর পার্থক্য কোথায় ? এই পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে : '...কোনও মৌলিক বিষয়বস্তু ইহার উপজীব্য হইতে পারে না। আধুনিক কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এইখানেই ইহার মৌলিক পার্থক্য। আধুনিক ছোট-গল্প কিংবা উপন্যাস লেখকের নিজস্ব মৌলিক কল্পনার ফল ; ইহার বিষয়, চরিত্র, পরিবেশ প্রত্যেকটি উপকরণই লেখকের নিজস্ব উদ্ভাবিত ; কিন্তু একটি মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক [traditional] ধারা অনুসরণ করিয়া লোক কথা সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কতকগুলি অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন থাকে, তাহা দ্বারাই ইহারা কালজয়ী হইয়া অমরত্ব লাভ করে'।

৩। স্বাভাবিকভাবেই মিথ্-এর সঙ্গে পুরাণের একটা আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কথা উল্লেখিত হতে পারে। আমরা এর পরের অনুচ্ছেদেই মিথ্-এর বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণের যৌক্তিকতা বিচারের সময়েই মিথ-এর সঙ্গে পুরাণের আত্মীয়তা বা তাদের মধ্যকার পার্থক্যটি আলোচনা করেছি।

৪। 'এপিক' বা মহাকাব্য-এর সঙ্গেও মিথ্-এর একটি আত্মীয়তাসূত্র রচনা করার চেষ্টা সর্বত্রই দৃশ্যমান। এ-কথা ঠিক যে, যে-কোন মহাকাব্যের সঙ্গেই,—তা-সে আদিমহাকাব্যই [Epic of growth] হোক, আর সাহিত্যিক মহাকাব্যই হোক [Literary Epic],—মিথ্-এর কাছে তার একটি উত্তমর্ণাত্মক সম্পর্ক আছে। পণ্ডিতেরা সব ধরণের মহাকাব্যের অন্তরে মিথ্-লেজেণ্ড ও টেল-এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এবং বিবর্তিত অস্তিত্ব অনুভব করে থাকেন। এমন কি আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক এবং পারমাণবিক যুগের শিল্পী-সাহিত্যিকরাও মিথ্-এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বা বিবর্তিত

উপকরণকে আপনার মনের মাধুরি মিশিয়ে নিজের মত করে প্রয়োগ করে থাকেন। কেন এই মিথ্-এর প্রতি আকর্ষণ? এ-সম্পর্কে জনৈক আধুনিক সমালোচক বলছেন : "আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক, আধুনিক যন্ত্রযুগে অবিশ্বাস্য ; অথচ আবহমান কাল ধরে মানব চেতনায় বদ্ধমূল ঐ মিথ-পুরাণের কাহিনীর আশ্রয়ে তার রসধারাকে তথ্য থেকে নিষ্কাষণ করে নিয়ে,—আধুনিক একজন কবি ও সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব কালের কাহিনীকে একটি দেশ-কালাতীত বিশ্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলতে চান, তাঁর কালের নরনারীর 'সুপ্রত্যক্ষ' জীবনকে 'একটি সুবিশাল' মিথিক ও পৌরাণিক 'রঙ্গভূমি'র মধ্যে স্থাপন" করে 'একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব' দান করতে চান। যে-কাজ তাঁর স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতো না ['পুরাণকথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে']।

এর পরেও যাদের সঙ্গে মিথ্-এর সম্পর্কের কথা মনে পড়বে তারা পূর্বকথিত আত্মীয়গণের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত,—অর্থাৎ তারা মিথ্-এর প্রতি-আত্মীয় বা অনু-আত্মীয় , অর্থাৎ 'সয়ের বয়ের বকুলফুলের ··' ।

তিন. মিথ্-এর বাংলা প্রতিশব্দ :

এতক্ষণ আমরা মিথ্ [Myth] এই ইংরেজী শব্দটিকেই আমাদের লেখায় ব্যবহার করে এসেছি। কিন্তু আমি মনে করি যে, মিথ্-এর বিষয়-প্রকরণ-পাত্র-পাত্রী এবং সর্বোপরি চেতনা ইত্যাদি কোন কিছুই আমাদের কাছে বহিরাগত নয়, —ট্র্যাজিডি, রোমান্টিক বা লিরিকের মতো ; তাই এর একটি দেশীয় এবং সর্বজন গ্রাহ্য প্রতিশব্দ তৈরী হওয়া উচিত এবং তৈরী করা এমন কিছু কঠিনও নয়। কিছু শ্লাঘার সুরে জনৈক আধুনিক সমালোচক যেহেতু বলেছেন : "···আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মিথের বিষয়গত এবং প্রকরণগত ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা আমার পূর্বে সম্ভবত আর কোনো লেখক করেননি "[ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার লোকসাহিত্য' : ১ম খণ্ড : ৩য় সং ১৯৬২ : গ্রন্থটির কথা বোধহয় এঁর মনে নেই]। 'মিথের' প্রতিশব্দরূপে বহুল প্রচলিত 'পুরাণ' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও আমি আমার গ্রন্থের শিরোনামায় উদ্দেশ্য-মূলকভাবেই মূল 'মিথ' শব্দটি প্রয়োগ করেছি···ইদানীং সমালোচনার ক্ষেত্রে 'পুরাণের' পরিবর্তে মূল 'মিথ' শব্দটির কিছু কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে শব্দটি এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমার ব্যবহারের পর যদি

'ক্লাসিক', 'রোমান্টিক' প্রভৃতির মতো 'মিথ', 'মিথক্যাল' প্রভৃতি শব্দও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক হবে।"—তথাপিও আমরা তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পূর্বকথিত কারণেই একমত হতে পারছি না। কেন তা আলোচনা করে আমরা 'মিথ-এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দটি গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

বাংলা লোক-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব বলতে চান : '...ইংরেজিতে তাহাদিগকে myth বলে—বাংলায় তাহা **লৌকিক পুরাণ*** অথবা পুরাকাহিনী বলিয়া অনুবাদ করা যায়। কিন্তু লৌকিক পুরাণের পুরাণ কথাটি কাহারও মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে ; কারণ, পুরাণ শব্দ দ্বারা অনুরূপ সংস্কৃত রচনা বুঝায় ; অতএব এই শ্রেণীর বাংলা রচনা পুরাণ সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত না করিয়া একটি স্বতন্ত্র শব্দ দ্বারা অভিহিত করাই সঙ্গত—এই সম্পর্কে পুরাকাহিনী শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুরাকাহিনী শব্দটির আর একটু সুবিধা আছে ; ইংরেজি myth-এর সঙ্গে legend কথাটি প্রায়ই যুক্ত হইয়া থাকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অর্থের খুব বেশি পার্থক্য নাই—সামান্য পার্থক্য আছে মাত্র। পুরাকাহিনী শব্দটি দ্বারা ইংরেজি myth এবং ইতিকথা শব্দটির দ্বারা ইংরেজি legend শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে , কারণ, myth শব্দের পুরাণত্ব যেমন পুরা কথাটির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইবে, তেমনই legend কথাটিরও অর্থ কথা শব্দটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবে'।

এ-রকম বলা সত্ত্বেও আমারা কিন্তু Myth-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'পুরা'-কাহিনী'-কে গ্রহণ করতে দ্বিধা করি। কারণ, একথা ঠিকই যে : myth-এ কাহিনী আছে ; এবং তা-পুরাতনও, কিন্তু তার 'লোক' [Folk]-এর স্বভাব চরিত্র ও লক্ষণটি সম্পূর্ণতই বাদ হয়ে গেছে। Myth-এর মধ্যে যে 'লোক-সংস্কৃতি' [Folklore]-র উপাদান-বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই বর্তমান আছে তা আমাদের এই আলোচনার 'এক' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এমন কি ওপরে রেখে আসা উদ্ধৃতির মধ্যে স্থূলাক্ষর ব্যবহার করে দেখিয়েছি যে, উক্ত শ্রদ্ধেয় লোক সংস্কৃতিবিদ্ myth-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লৌকিক পুরাণ' ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক নন। তবুও তিনি নতুন একটা প্রতিশব্দ কেন নির্বাচন করলেন।

এখন আমাদের আলোচ্য ১. 'মিথ্'-কে 'মিথ' শব্দে গ্রহণ না করে যেন বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক-পুরাণ' গ্রহণ করবো ? ২. কেন 'পুরাকাহিনী'ও গ্রহণ করবো না 'মিথ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ?

প্রথমতঃ 'মিথ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কেবল 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহার করলে 'মিথ' কথাটির সমগ্র তাৎপর্য আভাষিত হয় না। কারণ, ক. "পুরাণ শব্দের অর্থ পূর্বতন। তদনুসারে প্রথমে 'পুরাণ' বলিলে প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সম্বলিত গ্রন্থ-বিশেষ বুঝাইত।" মিথ্-এও আখ্যায়িকা আছে। মিথ-ও পুরাতন। কিন্তু তবুও মিথ 'পুরাণ' নয় কারণ, 'মিথ ও পুরাণের ঐ দুইটি লক্ষণে সামান্য-ধর্ম থাকলেও আমাদের অষ্টাদশ পুরাণ-এর [এবং তার সঙ্গে আরও অষ্টাদশ উপপুরাণের] যেটি লিখিতরূপ, তার চাইতে মিথের ধারণা আরও অনেক ব্যাপকতর ও প্রাচীনতর'। খ. বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি মহাপুরাণে পুরাণের যে পঞ্চবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা-হচ্ছে :

'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥'

—অর্থাৎ সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনসৃষ্টি ও লয়, দেব ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর-সকল অর্থাৎ কোন্ কোন্ মনুর কতকাল অধিকার এবং বংশানুচরিত বা সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে প্রথম তিনটি লক্ষণের সঙ্গে 'মিথ'-এর মিল রয়েছে, বাকি দুটির সঙ্গে গতানুগতিক ইতিহাসের ['.. .. of the five subjects proper to Purans the first three concern early religion and mythology and the other two deal with traditional history'.] ;—তাই 'মিথ' পবিপূর্ণ ভাবে পুরাণ নয়। গ. কিন্তু যেহেতু 'সৃষ্ট-প্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণ' ["Myth, then is always an account of a 'creation' ; it relates how someting was produced, began to be."] —সেহেতু 'মিথ'-এব প্রতিশব্দ হিসাবে পুরাণকে গ্রহণ করবো, একক ভাবে নয়, তার আগে 'লোক' [Folk] উপ-পদটি বসিয়ে। এই 'লোক' উপ-পদটি নেওয়ার তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে 'পুরাণ' পর-পদটি গ্রহণের সপক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখি। যেমন : ১. বলা হচ্ছে, 'Myth narrates a sacred history' এবং 'পুরাণে'র শেষ দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'traditional history'-র সম্পর্ক যখন রয়েছে তখন 'মিথ' 'পুরাণ' নয় কেন? কারণ, 'পুরাণে'র মধ্যে যে বংশানুচরিতের কথা আছে তার মধ্যে "আধুনিক য়ুরোপীয় অর্থে ইতিহাসের চেতনাটি অনুস্যূত হয়ে আছে ['পুরাণার্থ বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে পুরাণ প্রকৃত হিস্টরি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত বলিয়াই বিবেচিত'] ;......পাশ্চাত্ত্য

নৃতাত্ত্বিক ও অন্য মতাবলম্বী 'মিথ' ব্যাখ্যাতাগণ মিথকে খুব নিগূঢ় ভাবে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস বললেও—তাকে কাল-পরম্পরাগত মানব-ইতিহাস রূপে কখনো বিচার করেন নি। তাঁদের দৃষ্টিতে মিথ্ হলো সমগ্র মানবজাতির বা মনুষ্যত্বের আদি-ইতিহাস"। আসলে পুরাণের মধ্যে 'মিথ' ও 'ইতিহাস'-এই দুয়ের ভাগই রয়েছে জলে মেশানো চিনির মতো। অপরপক্ষে 'মিথ'-এর মধ্যেও রয়েছে পুরাণের 'পুনঃ পুনর্জায়মানা'-র সঙ্গে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা যা "opposed to 'reality'......'what cannot really exist'. তাই আমরা Myth-এর বাংলা প্রতিশব্দের অনুপদ হিসাবে 'পুরাণ' কথাটিকে গ্রহণ করলাম।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, 'মিথ'-এর প্রতিশব্দ গঠনে কেন আমরা পূর্বপদে লোকটি গ্রহণ করলাম। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ 'মিথ্ কি 'অংশের খ. এবং গ বিভাগে মিথ-এর মধ্যে ফোকলোর বা 'লোক-সংস্কৃতি'র উপাদান কতখানি আছে তা আলোচনা করেছি। তাই এখানে সে-সম্পর্কে আর পুনরুক্তি ঘটানোর প্রয়োজন নেই। ফলে, লোক-সংস্কৃতির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং পুরাণেরও কিছু বিশিষ্টতা তুল্যমূল্যরূপে এবং অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে বর্তমান থাকায় আমরা মিথ-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকপুরাণ'-কেই গ্রহণ করলাম। এবং এখন থেকে আমরা 'লোকপুরাণ' বলতে মিথ্-কেই বুঝবো।

চার. 'লোকপুরাণ'-এর শ্রেণী বিভাগ :

লোকপুরাণ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং করেছেন তাঁদের কাছে একে বিষয়বস্তুগত বা প্রকরণগত ভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগে করে দাঁড় করানো কঠিন কাজ বলে মনে হয়েছে। কারণ, ক. যাঁরা দেশে দেশে এবং কালে কালে প্রচলিত তুলনামূলক লোকপুরাণ নিয়ে চর্চা করছেন তাঁদের কাছে এই সমস্যা সবচেয়ে প্রধান এই যে অধিকাংশ লোকপুরাণগুলির একই উৎসক্ষেত্র অনুসন্ধান করা কতদূর সম্ভব, মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুগত্যই বা সেখানে কতদূর সক্রিয় এবং একই পরিবেশ বা উন্নয়নশীলতা সেখানে কতখানি কাজ করেছে? একই য়ুরোপ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকপুরাণদের চলাচল করতে না হয় অসুবিধা হয় নি; কিন্তু পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, সেই আদিমতম পৃথিবীতে—কত লোকপুরাণ পোষাক-আশাকের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে কি ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে তার রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয় আর একটা 'রচা'-কথা তৈরী করে ফেলি। কোন কোন

লোকপুরাণ এককভাবে কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপন উৎসমুখ খুঁজে পেয়েছে। অপরপক্ষে, আমরাও এও দেখেছি যে, মানব-অগ্রগতির বিভিন্ন লক্ষণগুলি লোক পুরাণসমূহের ওপর স্তর-বিন্যাস করে কিভাবে তাদের চেহারায় অপরিচিত বিমূঢ়তা সৃষ্টি করেছে। সেই কারণেই লোকপুরাণের শ্রেণী-বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এবং বহু বিভাগ উপবিভাগের অরণ্যে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। তথাপি বিশ্বাস, বিস্ময়করতা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি লোক-পুরাণ সম্পৃক্ত বিষয় অবলম্বন করে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কয়েকটি বিভাগে এদের বিভক্ত করা হলো :

১। **কালানুগতিক, প্রাকৃতিক ও ঋতু পরিবর্তন :** শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-বসন্ত ইত্যাদির আবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের বিশ্ব-পরিভ্রমণ, দিন-রাত্রি হওয়ার ব্যাপারটি সেদিনের আদিম মানুষের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে—এবং এদের নিয়ে অসংখ্য লোকপুরাণ রচিত হয়েছে। লোকপুরাণের জগতে চন্দ্র-সূর্য মানুষ হিসেবে পরিগণিত—এবং কোথাও কোথাও এদের মধ্যে প্রথমজন নারী আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন পুরুষ। এই বিভাগের লোকপুরাণগুলির সঙ্গে জাদু বিশ্বাসের ['often of a magical character'] একটা নিগূঢ় সম্পর্ক কোথাও লক্ষ্য করা যায়,—এবং তা শস্যের ফলন-জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। রাতের কালো আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রও লোকপুরাণ-কাহিনীর অন্তর্গত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঋতুর চক্রাবর্তন বিষয়ক লোকপুরাণগুলি আধুনিক বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, কারণ তাঁরা মনে করেন যে এগুলি বিশ্লেষণ করে কৃষি-সংক্রান্ত প্রয়োগ-কৌশলকে উন্নত করা সম্ভব হবে।

২। **অনন্যসাধারণ অথবা অনিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা :** সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটা, ভূমিকম্প ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন ধরণের লোকপুরাণ কাহিনীর প্রচলন দেখা যায়।

৩। **বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য :** এই বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হলো, এই কৌতূহল নিয়েও বিশ্বব্যাপী লোকপুরাণের জন্ম হয়েছে। এবং মনে হয় লোকপুরাণের বিভাগগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর কাহিনীগুলিই আদিতম।

৪। **ঈশ্বরগণের উদ্ভব রহস্য :** অমর লোকের অধিবাসীরা অ-মর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্ম-মৃত্যু আছে, আত্মীয়-পরিবার-পরিজন আছে এবং কোনও একদিন প্রলয়-প্রয়োধিজলে এঁদের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে,—এই সব বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে বহু লোকপুরাণ।

৫। **মানুষ ও জীব-জগতের সৃষ্টি রহস্য :** দু-ধরণের এই লোকপুরাণ কাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। এ-রকম বহু কাহিনীর দেখা যায় যাতে, একে অনায়াসেই অপরের দেহ ধারণ ও আচার-আচরণ অনুসরণ করছে। এমন বহু মানব-সম্প্রদায় আজও পৃথিবীতে সভ্যভাবে বসবাস করেও দৃঢভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের কুলকেতু [totem] হচ্ছে কোন বৃক্ষ বা জন্তু। অর্থাৎ তাঁদের জাতির আদি পুরুষ হচ্ছে হাঁস বা কচ্ছপ বা অন্য কিছু। যে কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই সম্প্রদায়ের জন্ম কথা বলা হয়েছে—তা নিঃসন্দেহে এক আদর্শ লোকপুরাণ। মানুষ ও পশু-পাখীর জন্ম-কথা নিয়েও অনেক-লোকপুরাণ তৈরী হতে দেখা যায়।

৬। **সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আবিষ্কার :** আগুন মানব সভ্যতার আদিমতম আবিষ্কার। এই আগুন কিভাবে পৃথিবীতে এলো, বা কে নিয়ে এলো তা-নিয়ে লোকপুরাণ বহু দেশেই রচিত হয়েছে। লোহা ইত্যাদি ধাতু কিভাবে আবিষ্কৃত হলো তার কাহিনীও লোকপুরাণের অন্তর্গত।

৭। **সুর-অসুরের বা দেব-দানবের যুদ্ধ বিষয়ক :** এই বিষয় নিয়েও অনেক লোকপুরাণ রচিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে এই ধরণের লোপুকরাণ রূপকার্থবাহী। আসলে জীবনে শিব ও অ-শিবের দ্বন্দ্বই, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বই রূপকাশ্রয়ে এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৮। **জন্ম ও মৃত্যু :** মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? তার আত্মা আছে কি না? মৃত আত্মার ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা, পরলোকের পরিচয়, জীবনকালে ভালো কাজ করার ফলে মরার পর সুখ ও স্বর্গ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু লোকপুরাণ রচিত হয়েছে।

এই যে আটটি বিষয়গত বিভাগ লোকপুরাণের করা হলো তা-কে আরও অনেকখানি সম্প্রসারিত করা যায়। যেমন, ঐতিহাসিক ঘটনামূলক। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে রচিত কাহিনীগুলিকে ঐতিহাসিক বা লোকপুরাণিক আখ্যা দিয়ে পৃথক করা কঠিন,—বলা যায় যে এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, লোকপুরাণের কাহিনীর অন্তর্গত কিছু বীর চরিত্র আছেন যাঁরা আদিতে ঈশ্বর ছিলেন,—এখন তাঁদের মানবী-করণ ঘটেছে ; [যেমন : কৃষ্ণ] আবার কিছু মানুষও ভক্তির আবেগে ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন [যেমন : চৈতন্যদেব বা যিশুখ্রীষ্ট]।

লোকপুরাণের এই বিষয়ানুগ শ্রেণী-বিভাগ কিন্তু চরম নয়। এ-কথা বড় জোর বলা যেতে পারে যে প্রায় অধিকাংশ বিষয়ই এর অন্তর্গত হয়েছে।

পাঁচ. লোক-পুরাণ সংগ্রহ : সংশয় ও প্রশ্ন :

ওপরে আমরা লোকপুরাণ কাকে বলে এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করে এসেছি। এখন আমার নিজস্ব কয়েকটি এবং প্রচলিত দু-একটি কাহিনী উদ্ধৃত করে এই সম্পর্কে উদ্ভূত কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

ক. চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয় কেন? খুবই পরিচিত এই কাহিনী। তবুও এটার একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাহু দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার পুত্র। মতান্তরে ঋষি কশ্যপ-সিংহিকার পুত্র। ইনি পিতা-মাতার চৌদ্দটি সন্তানের অন্যতম। সমুদ্রমন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন দেবগণকে সুধা বেঁটে দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে রাহু দেবতাব ছদ্মবেশ ধরে অমৃত খাওয়ার আশায় দেবতাদের সারিতে গিয়ে বসে পড়েন। চন্দ্র ও সূর্য এই ছদ্মবেশী রাহুকে চিনতে পারেন এবং বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাদের কাছে নালিশ করে দিলে, বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মুণ্ড কেটে ফেলেন ;—কিন্তু ততক্ষণ অমৃত রাহুর গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ; তাই তার মৃত্যু হলো না। এর পর থেকে রাহুর মাথার অংশটি রাহু নামে এবং দেহ অংশটি কেতু নামে পরিচিত হয়। মতান্তরে কেতু রাহুর আপন সহোদর বা সৎ ভাই। এবং এই থেকেই রাহুর সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের চরম শত্রুতা এবং সুযোগ পেলেই তিনি উভয়কে গ্রাস করে ফেলেন। কিন্তু যেহেতু রাহুর দেহ নেই—তাই চন্দ্র বা সূর্যকে গিলে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা রাহুর গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসে। এবং এতেই চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণ হয়।

এই কহিনীর মধ্য দিয়ে এক অদ্ভুত-ঘটন প্রাকৃতিক ঘটনাকে আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধিহীন মানুষ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এই কাহিনী-প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখা যেতে পারে। তা এই যে : ১। এই কাহিনীর পুরাণে উল্লেখ আছে [বিষ্ণু পুরাণ]। ২। কিন্তু পুরাণ অনেক পরবর্তী কালের সৃষ্টি, তাই তার আগে, আরও আদি-আদিমতম প্রাচীন কালে বিস্ময়াবিষ্ট আদি মানুষ কি ভাবে ঐ প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছে? একটু অনুধাবন করে গল্পটাকে পড়লেই বোঝা যায় যে গল্পটির একটি আদিরূপ আছে ; যাকে আমরা 'লোক' [Folk] রূপ বলতে পারি। এইখানে রয়েছে : প্রথমে, চন্দ্র-সূর্য-রূপ প্রচণ্ড শক্তিমান প্রাকৃতিক বস্তুর কেন এমন অবস্থা হয়? নিশ্চয়ই তার চেয়ে শক্তিমান কেউ তাকে আচ্ছন্ন করে—আদি-

মানুষের কাছে গিলে ফেলার কল্পনা সহজতর। এবং গিলে ফেললেও কিছুক্ষণ পরে কোন এক কারণে তাদের উগ্‌রে ফেলতে হয়। দ্বিতীয়ে, এই স্তর অতিক্রম করে এল দেবতা-সমুদ্র-মন্থন-ঋষি-পুত্র, অমৃতপান, মুণ্ডচ্ছেদন ইত্যাদি পৌরাণিক বা ধ্রুপদী যুগের [classical age] উচ্চতর কল্পনা। ৩। এই ভাবে আমরা একটি লোক-পুরাণকে ধ্রুপদী-পুরাণ হয়ে উঠতে দেখলাম। ৪। 'এই কাহিনীতে চন্দ্র-সূর্য এবং তাকে আচ্ছন্নকারী ছায়া দেহধারী প্রাকৃতিক বস্তুগুলি মানব-অনুরূপ জীব-সত্তায় পরিণত হয়েছে। ৫। কেবল বাংলাতেই এর অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়। অতএব আমরা পূর্বে রেখে আসা সংজ্ঞানুসারে একে একটি সার্থক লোকপুরাণ [Myth] হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

খ. দুর্গার দশহাত ও গণেশের কলাবৌ কেন: এই কাহিনীরও অসংখ্য পাঠান্তর আছে। তবে আমার নিজস্ব সংগ্রহ এই রকম: দুর্গামায়ের প্রিয় ও জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশ বিয়ে করতে যাচ্ছেন। বর-যাত্রায় কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ গণেশের মনে পড়লো যে তিনি হাতের জাঁতি ফেলে এসেছেন। মনে হওয়া মাত্রই গণেশ জাঁতিটি নেবার জন্যে বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ী ফিরে, ঘরে ঢুকে দেখেন যে তাঁর মা—দুর্গা দশ হাত বার করে গোগ্রাসে শোলমাছ পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত খাচ্ছেন। গণেশ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে মা-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা একি হচ্ছে'? দুর্গা প্রথমে খানিকটা থতমত খেয়ে, তারপর বললেন, 'দেখে যখন ফেলেছিস্, তখন বলি, তুই বিয়ে করে আসার পর যদি তোর বউ শাশুড়ীকে খেতে না দেয়, এই ভয়ে বউ বাড়ীতে আসার আগেই আশা মিটিয়ে চাড্ডি খেয়ে নিচ্ছি'। এ কথা শুনে গণেশ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন যে, তিনি আর কখনও বিয়ে করবেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি বিয়ে করতে বেরিয়েছিলেন, বাড়ীর বড় ছেলে, এবং প্রতিজ্ঞা করছেন যে আর কখনও বিয়ে করবেন না, সেহেতু তাঁর সঙ্গে একটা কলা গাছের বিয়ে দিয়ে সবদিক বজায় রাখা হলো। এই কাহিনীটির অন্যতর পাঠান্তর পাওয়া যায়।

এই কাহিনী সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন এই যে: এটি কি একটি বিশুদ্ধ লোক-পুরাণ [myth]? এর উত্তরে বলা যায় যে: ক. এর পাত্র-পাত্রী সকলেই দেবতা। খ. দুটি অতিমানবিক ব্যাপারের [দশ হাত ও কলা গাছ বৌ]-এর ব্যাখ্যা তৈরী করা হয়েছে। অতএব এদিক থেকে একে লোকপুরাণ হিসেবে গ্রহণ করা অসঙ্গত হবে না। আবার গ. এই কাহিনীটি একান্ত ভাবেই বঙ্গীয়। ঘ. এই কাহিনী খুব

একটা প্রাচীন নয়। ঙ. বাংলাদেশের স্থান ভেদে প্রাপ্ত পাঠান্তর এর ঘাতসহতা ও ভ্রাম্যমাণ গুণকে প্রতিষ্ঠিত করে একে লোককথা [Floktale]-র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। চ. এর মানবীয় রস বা বাঙালীয়ানা গুণটি একে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় করেছে। ফলে এই কাহিনীটিকে যেমন বিশুদ্ধ লোকপুরাণ [Myth]-র হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়, তেমনি অন্যদিকে পরিপূর্ণ লোককথা [Folktale] হিসেবে গণ্য করাও যায় না। দেবদেবী নিয়ে এই ধরণের অনেক লোক-মান্ত্রিক কাহিনী অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত আছে।

গ. এই প্রসঙ্গে আরও একটি কাহিনী যা আমার নিজস্ব সংগ্রহে আছে, তার কথা এখানে মনে পড়ছে। কাহিনীটি এই: আমরা সকলেই জানি যে বর্ণহিন্দু বিধবাদের মাছ মাংস—বিশেষত মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ এবং সমাজে নিন্দনীয়। কিন্তু একবার এক বিধবা রমণীর দারুণ মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিছুতেই তিনি লোভ সামলাতে না পেরে একদিন গোপনে মাংস সংগ্রহ ও রান্না করে গোপনেই খেতে বসেছেন। কিছুটা খাওয়া হয়েছে এমন সময় পরিচিত একজন এসে দরজায় ধাক্কা মেরে তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। ঐ বিধবা মহিলা অপযশের ভয়ে তাড়াতাড়ি আধ খাওয়া অবস্থায় মাংস-ভাতগুলিকে বাড়ীর খিড়কিতে গিয়ে ছাই গাদায় পুঁতে ফেলেন। কিছুদিন বাদে সেখানে ব্যাঙের ছাতা [mushroom*] গজিয়ে উঠেছে। সেই থেকে এটি রান্না করে খেলে ঠিক মাংসের মতো লাগে এবং বিধবারা এ-খায় না।

কিংবা, কাঠঠোকরা বা বেগে বউ পাখীর কি-ভাবে জন্ম হলো, অথবা লালবিহারী দে-র *Folktales of Bengal*-গ্রন্থের পোস্তগাছের জন্মকথা গল্পটিতে [দ্রষ্টব্য : Lalbehari Day : *Folktales of Bengal* [196] : 'The Origin of Opium' : pp. 351-6.]। এই সমস্ত কাহিনীগুলিকে কোন শ্রেণীর কাহিনী বলা যাবে ? সাধারণত এতে পশু-পাখী-গাছ ইত্যাদির জন্মকথা ["·· an account of a 'creation' , it relates how some thing was produced, began to be."] বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে কোন দৈবী চরিত্র নেই, অলৌকিক কাণ্ডকারখানা নেই, এযে তথাকথিত 'পবিত্র' [sacred]-ও নয়। তাই এ-গুলিকে

* এই ব্যাঙের ছাতা সাধারণত দু-রকমের। একটা বিষাক্ত ছত্রাক। অপরটি কোঁড়ক নামেও পরিচিত। এটি রান্না করে খায়। এবং রান্নার পর এর স্বাদ হয় ঠিক মাংসের মতো।

নির্ভেজাল লোকপুরাণ [myth] হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়। এ-গুলি লোককথা [folktale]-র অঙ্গনে রোপিত অবক্ষয়িত লোকপুরাণ [broken-down-myth] হিসেবে এক-একটি পৃথক নামে ;—এ্যানিম্যাললোর [mythic-animal-lore], বার্ডলোর [mythic-bird-lore], ট্রিলোর [mythic-tree-lore]—অর্থাৎ যথাক্রমে, পশু-পুরাণকথা, পক্ষী-পুরাণকথা, বৃক্ষ-পুরাণকথা ইত্যাদি অভিধার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বোধ হয়।

ঘ. এই সঙ্গে আরও একশ্রেণীর কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। তার অগে বিচার করা দরকার যে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, অর্জুন, বেহুলা, লাউসেন ইত্যাদি বা তারপরবর্তী পৌরাণিক অবতার চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে লোকপুরাণিক চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করবো কি ? কারণ, এঁদের জন্ম মর্ত্যের মানবীর গর্ভে, সমস্ত জীবনটাই অতিবাহিত হয় মাটি-মায়ের কোলে, সমস্ত জীবনাচরণ চেষ্টাদি মানুষের মতো—অলৌকিকতা বা অতিমানবিক আচরণও খুবই সামান্য। কারণ, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-ব্রহ্মা ইত্যাদি অমরলোকের অধিবাসীরা তুলনায় অনেক বেশী ঈশ্বরীয়, অধিক-পরিমাণ অলৌকিকতাপূর্ণ কাজকর্ম করে থাকেন, অনেক বেশি পবিত্র। অতএব লোক-পুরাণের পরিধি নিয়ে যদি কোন সংশয় কারোও উপস্থিত হয়, তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, সাধারণ ভাবে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ বা মহাভারতীয় চরিত্র-গুলি, অথবা মঙ্গলকাব্যের শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিরা ও তাঁদের কাজকর্ম দেখে আমরা তাঁদের 'নির্বিশেষ' অপেক্ষা 'বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়া' থাকি। এই 'বিশেষ পরিচয়' বাহী চরিত্রগুলি একদিন যে এই সমাজেরই মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমাজের দশজন লোকের মতই আচরণ করিতে গিয়া অসাধারণত্ব দেখাইয়া গিয়াছে' বলে সমাজ-মানস বিশ্বাস করে। ফলে, এদের লোকপুরাণ অপেক্ষা 'লোকইতিকথা' [legend]-র বর্গে স্থাপন করা যায়। কিন্তু প্রায় সকলেই উক্ত চরিত্র বা তাঁদের নিয়ে তৈরী কাহিনীসমূহকে লোকপুরাণই বলতে চাইবেন। অন্যদিকে, যিশুর একখানি রুটি অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীকে বিতরণ, শ্রীচৈতন্যদেবের সুদর্শন চক্র দিয়ে জগাই-মাধাইকে হত্যা করতে যাওয়া, অথবা মাঝগঙ্গাস্থিত নৌকার মাঝি তার ছেলের পিঠে যে চড় মারে, তাই ঘাটে দাঁড়ানো শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ নিয়ে ফুটে ওঠে। এগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই সবাই লোকপুরাণ না বলে লোকইতিকথা বলতে চাইবেন না কি—অথবা অন্য কিছু ?

একটি মাত্র নিবন্ধের পরিসরে মহাসমুদ্র-সদৃশ লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ দিয়ে, লোকপুরাণের প্রকৃত সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোচনার অবকাশ খুবই কম। এ-ছাড়া বাঙলায় এবং বাংলাভাষায় ১. লোকপুরাণ ও লোকইতিকথা বা এই ধরণের কিছু সংগ্রহ আজ পর্যন্ত প্রায় কেউই করেন নি ; ২. লোকপুরাণ সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক আলোচনাই আমাদের দেশ বা ভাষায় আজও পর্যন্ত হয় নি ; ৩. লোকপুরাণের গঠন, তার মধ্যে সমাজমনস্কতা প্রভৃতির অনুসন্ধান ইত্যাদিও স্বাভাবিকভাবেই তাই কিছুই এখনো হয় নি ; ৪. লোকপুরাণ-লেজেণ্ড প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্ত্যভাষায় রচিত [বিশেষ করে ইংরেজী] গ্রন্থাদি এবং যেখান থেকে কর্ষিত জ্ঞানের ঋণে ডুবে থাকতে পছন্দ করি।

আর তারই ফলে এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে, স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী উপকরণে পূর্ণাঙ্গ কিছু না করা পর্যন্ত, যে কোনো আলোচনায়, কোন না কোন দিক থেকে অপূর্ণতা থাকবেই ॥

মিথের নন্দনতত্ত্ব

——————বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১. **Myth is a mode of Cognition**

(William Troy; 1938)

২. **Myth is a large Controlling image which...gives Philosophic meaning to the facts of ordinary life**

(Mark Schorer, 1942)

৩. **Symbolic of the spiritual norm for Man the Micro-cosm. (Joseph Campbell) Appendix to Grimm's fairy tales.**

এ সবই 'মিথ'-এর স্বরূপ বিশ্লেষণে পণ্ডিতজনের উক্তি। আরও অনেকে অনেক কিছু বলেছেন এবং বলছেন। কিন্তু 'মিথ' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নন এমন পণ্ডিত-ব্যক্তির কাছে 'মিথ' প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কল্পনাশক্তির রমনীয় অভিব্যক্তি মাত্র। বাঞ্ছিতকে দূরত্বের বাধা দূর করে প্রাপ্তির নৈকট্যের মধ্যে অনুভব করার অতিপ্রাকৃত বাসনায় যে 'রোমান্টিকতা' মিথের বিশেষ লক্ষণ তাই। অতএব 'মিথে' অশুদ্ধচিত্তের অসদাচারের প্রকাশ ঘটে মাত্র। এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্ম ও বিকাশের বহু পূর্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকমানসের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রকাশ যে 'মিথ' তা মিথ্যাই। সত্য যদি হয় কার্য-কারণের অভিন্ন সম্পর্কানুসারী বা ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তশাসিত, তাহ'লে ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদির অস্তিত্ব এবং তাঁদের সক্রিয়তা নিতান্তই অলীক কল্পনামাত্র। তেমনি অলীক কল্পনার স্বেচ্ছাচার ঘটেছে এঁদের নিয়ে গড়া 'মিথ'-এ। বৃষ্টি নামানো ও বন্ধ করা, জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, বন্ধ্যার পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি নিয়ে অজস্র 'মিথ' গড়েছে এদেশে ও ওদেশে। আমাদের পুরাণ বলছে, আদিতে ছিল জল, তারপর এসেছে মাটি। শূকর রূপী ব্রহ্মা এলেন, পৃথিবীকে উর্দ্ধে তুলে ধরলেন দন্তাঘাতে।......সৃষ্টিরহস্যের মূলে উপস্থিত হওয়ার বাসনাজাত এই কাহিনী ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করেছে দশাবতার কল্পনায়। স্রষ্টা অবতাররূপে কখনও কূর্ম, কখনও মৎস্য, কখনও

নৃসিংহ . ইত্যাদি। এইসব কাহিনীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবশ্যই নেই। যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তামুজের কাহিনীর, শস্যদেবতা অ্যাটিসের কাহিনীর, হায়াসিন্থের সঙ্গে অ্যাপোলোর প্রেমকাহিনীর।

সন্দেহ নেই, 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' নামক মুদ্রার অন্য পিঠে যে মিথের অবস্থান, একালের যুক্তিশাসিত মনে তার কোন সত্যতা নেই। অথচ সেকালের অবৈজ্ঞানিক মন সৃষ্টির বৈচিত্র ও রহস্যের মধ্যে কার্য-কারণের অনিবার্য সম্পর্ক সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল বলেই এইসব কাহিনীর, জন্ম হয়েছিল। কিন্তু স্রষ্টা নামক কোন এক সত্তার কল্পনায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও যাদুবিদ্যার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। আকস্মিকে বিস্ময় দেবতার জন্ম দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু যেহেতু দেবতা থাকেন ইন্দ্রিয়ের অগোচরে, অতএব সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই তাঁরও বেদনা থাকতে হয়, থাকতে হয় প্রেম এবং মৃত্যুও। অর্থাৎ বড়গোছের মানুষ তিনি। বড় গোছের এই কারণে যে সাধারণের অপ্রাপণীয় তাঁর করতলগত। যাদুকরের মতই শূন্য ঝুলির ভিতর থেকে মুহূর্তে সৃষ্টি করেন সম্পদ-ভাণ্ডার। তাঁর ইচ্ছাতে বৃষ্টি হয়, তাঁর কোপে শস্য ধ্বংস হয়, নারী বন্ধ্যা হয়। কোন মানুষের পাপকেই তিনি অনুতাপ ছাড়া মার্জনা করেন না। তাঁর রোপে শক্তিমান শ্রীবৎস রাজা পথের ভিখারী হন, নল-দময়ন্তীর প্রেমজীবনে বিচ্ছেদ আসে, ইডিপাসের থেবিসে শস্য জন্মে না, নারী বন্ধ্যা হয়, যীশুর শেষ পান-পাত্র-রক্ষিত গির্জার 'নান'দের সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে ফিসার কিং তাঁর প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে বসে। তাঁরই অভিশাপে বরতনু শাম্ব হয় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, যেমন নগ্ন এথেনাকে প্রাবরতা দেখার অপরাধে অন্ধ হয় টাইরেসিয়াস, শিকারী অ্যাকটিয়ন দেবী ডায়ানার নগ্নদেহ দর্শনের অপরাধে পরিণত হয় তারই কুকুরের শিকারে। যে-কল্পনায় পূজনীয়ার নগ্নদেহ দর্শন ভয়ংকর পাপের কারণ, সেই কল্পনা, সন্দেহ নেই, সমাজ বন্ধনের গাঢ়তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। শস্য উৎপাদন আর সন্তান-উৎপাদন যেকালে সমান গুরুত্বপুর্ণ সেকালে যে-কোন রকমের বন্ধ্যাত্বকে পাপ ও দেব-অভিশাপের ফল বলে গণ্য করা হত। পাপ-পুণ্য, অভিশাপ-আশীর্বাদ সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করার বাসনা থেকেই কাহিনীর আশ্রয়ে উগ্র হয়ে উঠেছিল। সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-মানসেরঅদ্ভুত প্রতিফলন ঘটেছে 'মিথ'গুলিতে। তবে সেই সমাজ অবশ্যই সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রভাবিত একালের সমাজ নয়। আদিমতার স্বাক্ষর তার সর্বাঙ্গে। ফ্রয়েড এই সব মিথের মধ্যে ব্যক্তির কামজ-তৃপ্তি, অজাচারে আকাঙ্খা প্রভৃতি বিভিন্ন

আদিম লালসার অভিব্যক্তি হতে দেখেছিলেন। কিন্তু ইয়ুঙ খুঁজে পেয়েছেন 'Collective Unconscious', এই Collective Unconscious একটি সর্বজনীন ব্যাপার। সর্বজনীন এই কারণে যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে, 'Suprapersonal' nature রয়েছে তার ভিতর থেকেই এই সব মিথের জন্ম। এই 'Suprapersonal nature' প্রকাশের মধ্যে থাকে একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে 'ডিম' থেকে 'মুরগী'র জন্ম হয়। পদ্ধতিগত এই সামান্যতা থেকেই ইডিপাস,শাম্ব,টাইরেসিয়াস বা অ্যাকটিয়ন প্রায়একই অপরাধে অপরাধী এবংএকই ধরণের গুরুতর শাস্তিভোগী। সমুদ্রগর্ভে মহাদেশ রচনার আয়োজনের মত সমাজ-মানসের অন্তর্গত ব্যক্তিমানসের গভীরে এই সব সৃষ্টির আয়োজন চলে। একালের ভাষাবিজ্ঞানে যাকে 'deep structure'বলা হয়েছে, ইয়ুঙ-এর Collective Unconscious'-এর ভূমিকা প্রায় সেই রকম বলা যায়। অজ্ঞমানুষের ভাষা ব্যবহারে যেমন বাক্যগঠনের পদ্ধতি শিক্ষা করতে হয় না, তেমনি 'মিথ' গঠনেও ব্যক্তি-চৈতন্যের প্রাধান্য থাকে না। বরং তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমাজবদ্ধ আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে 'মিথ' গোপনে কাজ করে চলে। কুসংস্কারের কবলমুক্ত হয়েও মানুষ নানাভাবে 'মিথ'-এর দ্বারস্থ। সৃষ্টির পদ্ধতিগত সাদৃশ্যছাড়াও কবি-সাহিত্যিকেরা একালেও 'মিথে'র কাছ থেকে উপাদান নিয়ে তাঁদের সৃষ্টির ভাবভূমি ও অবয়ব রচনা করে চলেছেন সচেতন ও অচেতন দু'ভাবেই মিথ সাঙ্গীকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রথম চৌদ্দ পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ এক সময়ের মানসিকতা প্রকাশ করতে গিয়ে বেশ কিছু ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন যা অবশ্যই পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতিবহ। 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো' ও 'কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি' যথাক্রমে বৃন্দাবনের বালক-কৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যবাদক অর্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণের ছবি এনে দেয় আমাদের মনে। 'কোন্ অন্ধ কারামাঝে জর্জর বন্ধনে / অনাথিনী মাগিয়ে সহায়' স্পষ্টই কংসের কারাগারে দেবকীর পীড়নের কথা এবং অক্ষমের বক্ষ হতে / রক্ত শুষি করিতেছে পান 'ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষ-রক্তপানের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিখ্যাত 'বলাকা' কবিতায় 'শব্দময়ীর অপ্সররমণী / গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি' অথবা 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' যথাক্রমে স্বর্গাপ্সরাদের ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার কথা ও পর্বতের পক্ষ-থাকার

পৌরাণিক বিশ্বাসের কথা মনে এনে দেয়। অনুরূপভাবে 'প্রান্তিক' কাব্যের একটি পংক্তি 'দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি' লিখতে গিয়ে মনসামঙ্গলে বর্ণিত লখীন্দরের দেহ ভেলায় নিয়ে বেহুলার যাত্রার কথা রবীন্দ্রনাথের গভীরে প্রভাব ফেলেছিল কিনা কে জানে? যিনি কবিতা লিখছেন তাঁর মনের গভীরে 'মিথ' যে ছায়া ফেলে সেই ছায়া যখন কবিতার পাঠককেও মিথের জগতে পৌঁছে দেয় তখনই একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। একই গোষ্ঠীমানস অদ্ভুতভাবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত 'The Waste Land' শীর্ষক পাঁচটি ঝোঁকে লেখা কবিতায় গ্রেইল কাহিনী, টাইরেসিয়াসের কথা, ফিসার কিং প্রসঙ্গে ইজিপ্সীয় মিথ, বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'-এর অংশ বিশেষ, ফিলোমেলার কাহিনী ডায়ানা ও অ্যাকটিয়নের কাহিনী প্রভৃতির দ্বারা পাঠকদের সঙ্গে লেখকের যেমন, তেমনি এক পাঠকেব সঙ্গে অন্য পাঠকের যোগ ঘটিয়েছেন। অথচ কী রবীন্দ্রনাথ কী এলিয়ট কেউই পাঠকদের পুরানকাহিনী শোনাতে চান নি। পুরাণ তাঁদের একালের বিশেষ সময়ের ভাব ও ভাবনা প্রকাশে সহায়তা করেছে মাত্র। কিন্তু গোষ্ঠীমানসের অংশীদার যদি কবিরা না হতেন তাহ'লে তা সম্ভব হত কি? এই বিশ্বাসেই মাক্সিম গোর্কি বেশ কিছু উদাহরণ সামনে রেখে সিদ্ধান্তে এসেছেন, The finest works of great poets of all countries have drawn upon the treasure-house of the people's collective works. গোর্কির 'collective works'-এর মধ্যেই রয়েছে 'মিথ', 'লিজেণ্ড' ইত্যাদি। তারপরই একটি চমকপ্রদ কথা বললেন গোর্কি—'Art lies with the individual, but it is only the collective that is capable of creativity.' সমষ্টি-মানুষের মধ্যে সৃষ্টির উৎস, আর ব্যক্তিমানুষ তাকে শিল্পরূপ দেয়। অপরিচ্ছন্ন হীরক জন্ম নেয় খনির গভীরে আর মণিকারের হাতের ছোঁয়ায় তা হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়। পুরাণ-কাহিনী বা 'মিথ'-এর Supra personal স্বভাব একালের কবির কবিতায় 'deep structure' গঠনে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। তবে 'deep structure' কে 'Surface structure-এ পরিণতি দেওয়ার জন্যে শিল্পী নামক দক্ষ মণিকারের হাতের ছোঁয়া দরকার হয়। তা যখন হয় তখনই বলি 'Art lies with the individual'. কিন্তু 'individual' মানে তো এই নয় যে, প্রথা পরিপার্শ্ব ও অন্য সব প্রভাব থেকে শিল্পী মুক্ত। বরঞ্চ গোর্কি-র এই কথাটা

রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যকে ব্যাপকার্থে ধরলে ঠিক বোঝা যাবে—সাহিত্য রচয়িতার নয়, ব্যক্তিবিশেষের নয়, তা দৈববাণী। শিল্পীর 'Individuality' একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বৃহৎ ব্যাপককে আত্মীকরণে সমর্থ, তা বিশেষকে নির্বিশেষে পরিণতি দিতে সক্ষম। আমরা মনে করি প্রাচীন 'মিথ' বা 'লিজেণ্ড'—এই শুধু নির্বিশেষ মন বা Community mind প্রকাশিত হয়। আর একালের সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষ ও তাঁর মনটাই সর্বপ্রধান। কিন্তু সত্য হচ্ছে, 'মিথ' ও 'সাহিত্য' দুই ক্ষেত্রেই 'Community mind' বলবান। প্রাচীন 'মিথ' গঠনে যা ছিল সত্য, পরবর্তী সাহিত্যেও তা সত্য। এই সত্য হচ্ছে মানুষের মধ্যেকার 'Supra personal nature'. 'Collective unconscious'-এ তরঙ্গ না তুললে ভাষা দিয়ে আঁকা ছবি বা শব্দের ধ্বনি লেখকের একার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ভালো সাহিত্য দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে। করার কারণ যাদুকরের আপাত অর্থহীন অথচ সচেতন হিসেব-এর মত দক্ষ সাহিত্যিকের পদ্ধতিও সচেতন ও সংযত। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এই জগতে আমরা থাকি আবার থাকিও না। এই জগতে থাকি কারণ সাহিত্য জীবন ছাড়া নয়, কিন্তু থাকি না কারণ প্রত্যহের জীবনটাকে আগে কখনও আমরা অমন করে ভাবি নি। সাহিত্যিক চিরপরিচিতকে নবরূপে চিনতে শেখান। ঐ শেখানোতেই সাহিত্যিক নামক যাদুকরের হাতসাফাই-এর কাজ। 'মিথ' সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

'মিথ'-এর জগৎ সাহিত্যের জগতের মতই সামাজিক মানুষের জগৎ এবং একই সঙ্গে পরিচিত অথচ অপরিচিত। তবে সাহিত্যের সঙ্গে 'মিথ' স্রষ্টার মস্ত পার্থক্য এইখানে যে, সাহিত্যিক ঘটনা ও উদ্দেশ্যের বিন্যাস থেকে সাহিত্যের অবয়ব গঠনে ব্রতী হন,আর 'মিথ' স্রষ্টা(রা) অবয়ব থেকে ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যানুকূল পদ্ধতিতে ঘটনার মালা গাঁথেন। অর্থাৎ একই ঘটনা নিয়ে দু'জন সাহিত্যিক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি গল্প ফাঁদেন আর 'মিথ' রচয়িতা (রা) ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা দিয়ে গল্প বানালেও মূল বিশ্বাসে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য নেই। সাহিত্যের লক্ষ্য রূপসৃষ্টি আর মিথের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছুনো।
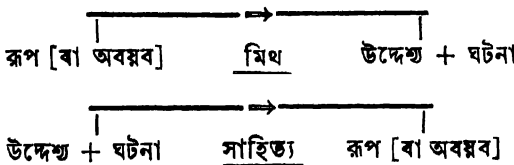
'মিথ' ও 'সাহিত্যে'র শুরু ও শেষ পরস্পরের বিপরীত প্রান্ত থেকে। পথের মাঝখানে সাক্ষাৎ। 'মিথে' thinking self নিসর্গকে দেখছে জানছে ও ভাবছে। সাহিত্যেও তাই। বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্ক একই রকম। 'মিথে' থাকে 'Patterend sense of togetherness.' যা থেকে জন্ম নেয় গোষ্ঠীমানস। মিথে গোষ্ঠীমানস থেকে রহস্যময় দেবতার জন্ম হয়েছিল। সাহিত্যে জন্ম নিচ্ছে চরিত্র। 'চরিত্র' মানে ঘটনা প্রবাহ সে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত হয়, মিথ শব্দটি (muthos) জন্ম থেকেই আদি মধ্য-অন্তে গড়া কাহিনীকে বোঝায়। 'মিথে'ও যেসব চরিত্র থাকে ঘটনাপ্রবাহেই তাদের পরিচয়। তবে সাহিত্যে গোষ্ঠীমানসের হুবহু প্রতিফলন না ঘটলেও এখানেও 'মানুষ' নামক ক্ষুদ্র বিশ্বের সঙ্গে 'সমাজ' নামক ব্যাপক বিশ্বের যোগের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীমানসের প্রতিফলন ঘটে। আসলে 'মিথ' ও 'সাহিত্য'দুই-এরই অবলম্বন বস্তুজগৎ। দুই-এরই লক্ষ্য মাটির সঙ্গে যোগ রক্ষা করা। মিথের দেবতা ও একালের সাহিত্যে চরিত্র সকলেরই প্রধান লীলাভূমি মাটির জগৎ। আবার সাহিত্যও মিথের ভূমিকা জীবনে প্রায় একই। আমাদের এই জীবন কেবল ভাঙ্গে আর গড়ে। কিন্তু 'মিথ' ও 'সাহিত্য'এই ভাঙ্গা-গড়ার জীবন থেকে একটা নতুন ঐক্য বা প্যাটার্ন গড়ে তোলে। সাহিত্যিক 'মিথ'স্রষ্টার মতই বিপরীতের ঐক্য গড়েন—সূর্যের সঙ্গে নায়কের,খলের সঙ্গে সরীসৃপের। তবে একই 'উর্বরতার' মিথ নিয়ে গড়ে উঠেছে যত মিথ সে সব মিথের সার কিন্তু ততটা কাহিনীতে নয়, যতটা তত্ত্বে অথচ একই 'লাভ মিথ' বা 'ট্রাজিক-মিথ' নিয়ে পৃথিবীতে যত প্রেমের গল্প সাহিত্য ট্রাজেডি গড়ে উঠেছে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে পৃথক। শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' ও রোমিও-এণ্ড-জুলিয়েট'-এ 'লাভমিথ' খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শেক্সপীয়র প্রেমের চিরন্তনত্ব বোঝাবার জন্যে বা 'লাভমিথে'র দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যে দু'খানা নাটক লেখেন নি। যদি কেউ বলেন শেক্সপীয়র জীবন-মরণে, মিলনে-বিচ্ছেদে প্রেমই যে একমাত্র সত্য একথা বোঝাবার জন্যে দু'খানি নাটক লিখেছেন তা'হলে আর যাই হোক তাঁকে কেউ সাহিত্যরসিক বলবেন না। ঐসব তত্ত্বকথা তো শেক্সপীয়র ভেবেছেন ঠিকই, কিন্তু তত্ত্বের রসরূপ দেওয়ার জন্যে সাহিত্যিকের পিছনে কোন তাগাদা নেই। অতএব রসিকেরও নেই। যদি কোন পাঠক গোড়ায় পৌঁছুতে চান তা'হলে তাঁকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামতে হবে। নামবার সময় সবদিক তাকিয়ে দেখতে হবে। শেষে এমনও হতে পারে দেখার আনন্দে

গোড়ায় উপস্থিত হওয়ার পথ ভুল হয়ে গেল তাঁর। সুতরাং উপাদানগুলি জন-জীবন থেকে 'মিথ' চায় নির্যাস, আর সাহিত্যের জগতে জীবনের উপাদান থেকে গড়ে ওঠে নতুন জীবনরূপ। তবে সেই জীবনরূপ গঠনে সাহিত্যিক ঝাড়াই বাছাই-এর পর আদি-মধ্য-অন্তে যোগ রেখে যা গড়েন অ্যারিস্টটল তাকেই বলে-ছিলেন 'muthos' ইংরেজীতে বলা হয় Plot. সুতরাং সাহিত্যিকের 'প্লট' নির্মাণে মিথের পদ্ধতিগত অনুসৃতি রয়ে যাচ্ছে। আবার শুধু কাহিনীতেও নয়, ভাষায় ছন্দবন্ধনে ও সুরসৃষ্টিতে একালের কাব্যে-নাটকে প্রাচীন মিথের 'কম্যু-নিটি মাইণ্ড'-এরই প্রকাশ ঘটে। যদিও প্রত্যেক বড় স্রষ্টাই হাতে পাওয়া উপাদানকে ঘসে মেজে নেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সূর্যোদয়, বসন্তকাল, যৌবন কাব্য-ভাষায় প্রায় একই বক্তব্য-প্রকাশক। তেমনি সূর্যাস্ত, শীতকাল, অন্ধকার, মৃত্যু আনে একই ধরণের দ্যোতনা। জীবন-প্রভাত, যৌবন-মধ্যাহ্ন এমন কথা তো যথেষ্টই পড়ি ও লিখি। আসলে মানবজীবনকে 'natural cycle'-এর সঙ্গে পুরাকাল থেকেই যে আমরা মিশিয়ে আসছি, এসব তারই স্মৃতিবহ। ফলে জীবন-প্রভাত ও যৌবন-মধ্যাহ্ন প্রভৃতি রূপকধর্মী কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের মনের গোপন কোঠায় একেবারে গিয়ে ঘা দেয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটো অবৈজ্ঞানিক কথা অবলীলাক্রমে বলি, লিখি এবং বিজ্ঞান পড়েও সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করি না। তাহ'লে এটাই কি সত্য নয় যে, পরম প্রাজ্ঞের মনের গভীরে বাস করে অবুঝ এক আদিম শিশু? এই আদিম শিশুর কল্পনার অবাধ লীলা যে মিথে তার ভূমিকাই হচ্ছে একালের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে এবং একালের মানুষের সঙ্গে সুদূর অতীতের মানুষের ভাবৈক্য রচনা করা। মিথ-চেতনা আসলে সমকাল চেতনা ও ঐতিহ্য চেতনার নামান্তর। এই সমকাল ও ঐতিহ্য গড়ে যে নাম তার মানুষ। সুতরাং 'মিথে' আগ্রহ হচ্ছে দেশের সমকালের মানুষ ও অতীতের মানুষের প্রতি আগ্রহ। অতীতে সেই আগ্রহ মুখ্যত কাব্যদেহে রূপ পেত, আর একালে গদ্যে এবং কাব্যে তা রূপ পেলেও ছন্দে সুরে ও ভঙ্গিময় ভাষায় তার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। 'মিথ' যা আসলে 'a method and a body of ordered experience' তা কবিতার ভিত্তি নয় বরং 'কবিতা' নামক এক বিশেষ শিল্পরূপ মিথের ভিত গঠনে কাজ করেছে। কম্যুনিটি-মানসিকতা প্রকাশে কল্পনার ছন্দিত বহিঃপ্রকাশ রূপে কবিতার অতীতের ভূমিকা ও বর্তমানের ভূমিকা সদৃশই। আসলে সুর ও ছন্দে

অনুরাগ, মানবহৃদয়ের সেই গোড়ার সত্য যেখান থেকে গোষ্ঠীর ঐক্য-কামনা উৎসারিত হয়েছিল। City Dionysia উৎসবে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মানুষেরা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও নাচে, গানে ও নাটকে এক ধরণের আবেগজাত ঐক্য অনুভব করতেন নিজেদের মধ্যে। এখনও একটি নাট্যাভিনয় কি সেই একই ভূমিকা পালন করছে না? সুতরাং আমরা যাকে 'মিথচেতনা' বলেছি তা যে কত গুরুত্বের সঙ্গে গোপনে গোপনে আমাদের জীবনে কাজ করে চলেছে তা অবশ্যই ভেবে দেখার মত। একালের একক-ব্যক্তিপ্রাধান্যে গড়া শিল্প-সাহিত্যে 'মিথ' চেতনার অবস্থিতি স্পষ্ট চোখে না পড়লেও অতিপ্রাকৃত রহস্যে বিশ্বাসটুকু বাদ দিয়ে মিথের মূল সত্য যে সাহিত্যে এখনও সক্রিয় তা অস্বীকার করা যায় না। কবিতার জন্যে কবিতা, কবির জন্যে কবিতা যাঁরা একথা বলেন এবং কবিতা মানুষের জন্যে, বহুজনের জন্যে এমত যাঁদের তাঁরা কিন্তু কেউই গোষ্ঠী ব্যাপার-টাকে মাথা থেকে বাদ দিতে পারেন না। তবে প্রথম মতবাদীরা যে গোষ্ঠীটি (কবিগোষ্ঠী) মানেন তা সমাজগোষ্ঠী এবং মানবগোষ্ঠী নামক বিরাটের অংশমাত্র। দ্বিতীয় দলের গোষ্ঠীচেতনা মিথচেতনার সঙ্গে যুক্ত। গোর্কি এঁদেরই এক-জন। আর প্রথম দলের অন্যতম এজরা পাউণ্ডের ভক্ত এলিয়ট তাঁর কাব্যের জন্যে অজ্ঞ এবং কালা ও বোবা পাঠক কামনা করলেও একালের কাব্যজগতে তাঁর চেয়ে 'মিথ'কে আর কে প্রকটভাবে ব্যবহার করেছেন? হয়ত মিথের আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বরে বিশ্বাস এলিয়টকে ভাবিত করেছিল বেশি, কিন্তু যে মানুষ 'tradition'-বিশ্বাসী, এককালের একটি ঘটনায় অতীতের সদৃশ অনেক ঘটনার প্রতিবিম্ব সন্ধান করেন তিনি মিথ-চেতনার অধিকারী অবশ্যই। সুতরাং সাহিত্য যখন নিতান্তই শুধু সাহিত্যিকের জন্য নয়, বিকশিত ব্যক্তিত্ব যখন গোষ্ঠী-সম্পর্কশূন্য নয়, একটি গোষ্ঠীও বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর বাইরে নয় তখন মিথ-চেতনার অভাব মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষেই বড় ধরণের ক্ষতি নয়কি? এইদিকে ভেবেই সম্ভবতঃ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফিলিপ হুইলরাইট তাঁর 'Poetry, Myth and Reality'—"বইএ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে শেষ করেছিলেন:—

> মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে শুধু থাকবে জমাট অন্ধকার ও তারই মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা। আধ্যাত্মিক ও বাস্তব ঐতিহ্যের সব হারিয়ে আমরা দেউলিয়া হয়ে যাব। দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন তার

ভাঁড়ারে আগামী শস্যের বীজ রেখে দেয় আমাদেরও বাঁচতে গেলে সে রকম কিছু রাখতে হবে। আমাদের একালের কবিতায় প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে বহুকাল আগে যা সজীব ছিল তারই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুতরাং বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য রেখে যাওয়া 'মিথ' চেতনা। এই চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার বীজ যা আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে বপন করব তার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে সন্তানদের প্রেম, অন্তর্দৃষ্টি ও গোষ্ঠীমানসিকতার উপর। তারই উপর আবার নির্ভর করবে আমাদের মহত্ত্ব—কী কবিতায় কী অন্যত্র।

লোকপুরাণ ও সমাজতত্ত্ব

—অসিতানন্দ রায়

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের কেন্দ্র অধিকার করে আছে মিথ্ বা লোকপুরাণের ধারণা। মর্গান হ'তে গর্ডন চাইল্ডের মানব সমাজের বিকাশের আলোচনায় নিহিত থাকলেও সমকালে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র অতিক্রম করে সমাজতত্ত্ব ও তুলনামূলক সমাজতত্ত্বে মিথের প্রভাব ও প্রয়োগ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অ্যাকা-ডেমিক গবেষণায় লোকায়ত চিন্তনের প্রভাব যত বাড়ছে—মিথ, লোককথা প্রভৃতির আলোচনা ও প্রয়োগও তত বাড়ছে। এমনকি নান্দনিক আলোচনাকেও একটি জনতাত্ত্বিক মাত্রা দিতে গিয়ে মিথ্-সমূহের ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ধ্রুপদী সাহিত্যের মিথ্-মাত্রিক ভিত্তির উন্মোচন আজকের গণ-সমাজে একটি বিশেষ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্ আজও মিথ্যা নয়। যে সমস্ত রীতি-নীতি ও বিশ্বাস সমাজের অন্তঃপুরে রূপান্তরের মধ্যে দিয়েও চিরকাল অধিষ্ঠিত তারা অবশ্যই দর্শন-বিজ্ঞানের উপকরণ না হয়ে যায় না। আজকের সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধন বা অ্যাকালচুরেশনের ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারে যদি প্রাচীন মিথের প্রবর্দ্ধন ও পরিবর্তন সম্যকভাবে আলোচিত হয়। সামাজিক দূরত্বের ব্যাখ্যা, সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বিশ্লেষণ, গোষ্ঠীরীতি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনাও সামগ্রিক সাফল্য লাভ করতে পারে প্রচলিত লোকপুরাণের মাধ্যমে। মিথ্ বা লোকপুরাণের এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকার আলোচনা আজকের মনস্বী সাংস্কৃতিক আলোচনার প্রাক্-ভূমিকা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্ মিথ্ বা লোকপুরাণের সবিশেষ আলোচনা করেছেন। মর্গান-চাইল্ডের যুগকে বাদ দিলেও পরবর্তীকালে সুম্নার, মালিনওস্কি, জুঙ, বুথ বেনেডিক্ট, ম্যাকাইভার ও পেজ, এলিয়েড মিরসিয়া, জেনেপ প্রভৃতি সমাজতত্ত্ব বিদ্‌গণ মিথের আলোচনায় যে সমস্ত তর্ক-বিতর্কের উত্থাপন করেছেন এবং আধুনিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় উত্থাপিত মিথের প্রায়োগিক উপযোগিতা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। স্বল্প পরিসরে এই আলোচনার পূর্বে মিথের প্রাথমিক ধারণার আবশ্যিক আলোচনাও এই নিবন্ধে করা হল।

॥ ১ ॥

মিথ্-কে অবৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিকতা বললে ভুল হয় না। আদিম মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু তার বুদ্ধির দিগন্তে কোন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে না পেরে অতি দুঃখে মানুষ তার নিজের চেয়ে বড় এক সত্তাকে স্বীকার করে নেয়। সৃষ্টি হয় লেজেণ্ড, লোককথা, লোক-পুরাণ ইত্যাদির। মিথ্ লোককথার এক রূপ যাকে আদিম সমাজ ব্যবস্থার সূচক বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রাচীন ঐতিহাসিক পর্যায়ের বিভিন্ন কাহিনী যার মূল প্রতীক হয় ঈশ্বর, নয় কোন কিংবদন্তী পুরুষ, নয় বা সাংঘাতিক একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি যার সাহায্যে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন ঘটনার সাঙ্গীকরণ ও ব্যাখ্যা সম্ভব মানব ইতিহাসের যতদূর জানা যায় দেখা যায় কিছু রীতি, কিছু অভ্যাস, কিছু ধর্মীয় আচার বা অল্প বিস্তর বিশ্বাস গোড়া থেকেই মানুষের সাথে আছে এবং যেগুলিকে সে নিজের জন্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। ঘটনা সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান এবং আধুনিক যুগের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি সব কিছুই অজ্ঞাত থাকায় এই ধরণের সাদাসিধে গল্পই প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মনে তুষ্টি এনেছে।

লোকপুরাণের গল্পগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় একটি অঞ্চলে বিবৃত হ'তে থাকে। বিশ্বাস, যে এর ফলে আঞ্চলিক শান্তি বজায় থাকবে। অবশ্যই এই আচরণ সার্বজনীন ভাবে সত্য নয়। কিন্ত সমাজ সংগঠনে ও সামাজিক আচরণে এমনি করে এর প্রভাব বিবৃত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার তাই মিথের ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন যে প্রত্যেক সমাজব্যবস্থাকেই ধারণ করে আছে কতগুলি মিথ্—সমষ্টি। তাঁর মতে মিথ্ বলতে বোঝায় "কতগুলি মূল্য বোধ—নিহিত বিশ্বাস যেগুলি মানুষ পোষণ করে, যেগুলির দ্বারা বা যেগুলির জন্য মানুষ জীবন ধারণ করে।"[১] কোন সমাজই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে না যদি না তার ভিত্তি স্বরূপ মিথ্গুলি—যেমন, আইন-সংশ্লিষ্ট মিথ্, ক্ষমতা সম্পর্কিত মিথ্, স্বাধীনতা-সম্পর্কিত প্রভৃতি মানুষের মূল্যবোধের মূলকেন্দ্র হয়। এসব কারণে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। প্রতিনিয়ত আবর্তিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শের অনায়াস সংযোগ সাধিত হয়, মানুষের মনে ন্যায় ও অনিবার্যের ধারণা প্রোথিত হতে থাকে। এই পদ্ধতির প্রক্ষেপে ব্যক্তি ধীরে ধীরে

১. MacIver—The Web of Government—p. 4.

সংশ্লিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। আচার ও অনুষ্ঠান তখন সহজে স্বীকৃতি পায়—কোন ব্যাখ্যার বা কোন যুক্তির দরকার হয় না। এইগুলি এক ব্যাপক-বাস্তবতাবোধ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন ও মিথ্ তাদের সচেতন করে দেয়। এর আগে কখনই এরকম অভিজ্ঞতা বা বোধ তাদের হয়নি। মন্দির, রাষ্ট্র, আইন বা ঈশ্বর আদিম যুগের মানুষের কাছে অনেক দূরবর্তী ভাবনা হ'তে পারে, কিন্তু মন্দিরের রীতিনীতি, রাজার অভিষেক, বিচারের বিশেষ কায়দা, কবরখানা বা বিবাহ-বাসরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুগমন মানুষকে ওই সমস্ত দূরের বিষয়-গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে।[২]

সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানে মিথের প্রয়োগ হ'লেও ক্রান্তিকালের পরিপ্রেক্ষিতেই মিথের সৃষ্টি। মিথ্ শুধু কাল্পনিক গালগল্প নয়। স্টিথ্ থম্সনের ভাষায় এগুলি এক পবিত্র কাহিনী যা পবিত্র সত্তা বা আধা ঐশ্বরিক বীরদের বা সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কথা বলে যাদের মূলে আছে ঐ পবিত্র সত্তার মধ্যস্থতা।[৩] কিন্তু মিথের জাতীয় চরিত্রই বুঝিয়ে দেয় কি করে এক অবস্থা অন্য অবস্থার সঙ্গে জড়িত ; কি করে জনবিহীন পৃথিবী জনসমৃদ্ধ হয়, কি অমর মরণশীল হয় ; কি করে আদিম ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজ বহুধা বিভক্ত উপজাতি ও জাতিতে রূপান্তরিত হয়। মিথ্ তাই একটি প্রান্তিক ঘটনা, পরিবর্তিত ঘটনার মধ্যস্থলেই এর অবস্থিতি।

॥ ২ ॥

মিথের প্রান্তিক চরিত্র সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আর্নল্ড ভান জেনেপ যেখানে রীতিনীতির পদ্ধতি সম্পর্কে পদ্ধতিগত আলোচনা করেন[৪] সেখানে তিনি মিথ্ সম্পর্কে অনুসন্ধানের এমন সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলি আগে কখনও প্রতিফলিত হয় নি। জেনেপ আচার অনুষ্ঠানের তিন ধরণের পর্যায় উল্লেখ করেন যেমন, বিভাজনী, প্রান্তিকী ও সাঙ্গীকরণের ধারা। বহু গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এই প্রান্তিক অবস্থায় দেখা যায়। যদি কোন সামাজিক গোষ্ঠীর আচার অনুষ্ঠান

পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তবে পূর্বের সমাজের সমস্ত বিশেষ ও নির্ভরশীল অঙ্গগুলির অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবয়বিক এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসের মত প্রান্তিকী প্রতীকগুলি মাঝে মাঝেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন স্তরের জটিলতা যাজক ও যজমানের অন্তর্বিরোধের মত হতে থাকে, সংগঠনের আভ্যন্তরীন অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নতুনভাবে পরিচালিত অন্য এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়; আত্মীয়তা, সম্পত্তি ও পদমর্যাদার চিরাচরিত পার্থক্য অবলুপ্ত হতে থাকে। প্রচলিত পদমর্যাদার অবলুপ্তি বা আবয়বিক পরিবর্তনকে 'ধ্বংস' বা 'মৃত্যু' বলা হয় আবার নতুন অবস্থার উদ্ভবে বা গ্রন্থিবন্ধনকে 'সৃষ্টি' বা 'শৈশব' বলা হয়। এরূপে মিথ্‌গুলিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা আদর্শসৃষ্টিকারী[৫] বা যেগুলি মর্যাদা বা নৈতিক নিয়মগুলির সমর্থন ও পারম্পর্য দান করে থাকে।[৬] মিথ্‌ ও প্রান্তিক নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষ আচরণের আদর্শ বলে গণ্য করা উচিত নয় আবার অন্যদিকে এগুলিকে নিয়ন্ত্রনী গল্প বা নঞ-র্থক আদর্শ বলেও মনে করা ঠিক নয়। অন্যদিকে বরং পৃথিবীর প্রারম্ভিক সৃষ্টিশীল শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক উন্নত ও গভীরতম রহস্য বলেই এগুলি অনুভূত হয়। এগুলি সমাজের মত-নিরপেক্ষ আচরণের উত্তরণকারী এক শক্তি-সমবায় কারণ, মিথে আছে এক অসীম স্বাধীনতা যা আচার-বদ্ধ সামাজিক সংগঠনের অবস্থিতিতে কোন সময়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

॥ ৩ ॥

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মিথের কাল্পনিক ও অবাস্তব চরিত্র হ'তে ভিন্ন করে মিথের বাস্তব চরিত্রের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। ম্যালিনওস্কির মতে আদিম বন্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত মিথগুলি শুধুমাত্র প্রচলিত গল্প নয়, ওগুলি একটি বাস্তব জীবন-পদ্ধতি। মিথ্‌ শুধুমাত্র গালগল্প নয়, এটি একটি কষ্ট-সৃষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি।[৭] জুঙ্‌ লিখেছেন যে আদিম মানসিকতা মিথ্‌ আবিষ্কার করেনি,

মিথ্‌গুলি তাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে। মিথ্‌ কোনরূপেই কায়িক পদ্ধতিগুলির রূপক হতে পারে না। আবার মিথ্‌ শুধুমাত্র আদিম উপজাতিদের মানসিক জীবনকেই প্রতিফলিত করে যে যেইমাত্র এরা তাদের পৌরাণিক ঐতিহ্য হতে সরে আসবে সেইমাত্র মিথ টুক্‌রো হয়ে লয় প্রাপ্ত হবে। মিথের একটি গভীর জৈব তাৎপর্য রয়েছে।[৮] মিরসিয়া এলিয়েড লিখেছেন যে মিথ্‌ সব সময়ই সৃষ্টিকথার পুনরাবৃত্তি করে থাকে। মিথে বলা হয় কি করে কোনকিছু সৃষ্টি হ'ল, কি ক'রে এগুলি গৃহীত হ'ল। এই অর্থে মিথ্‌ জ্ঞান-তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। মিথ্‌ শুধুমাত্র বাস্তবের কথা বলে, যা প্রতিফলিত হচ্ছে তার মধ্যে প্রকৃত বাস্তব কি অন্তর্নিহিত আছে মিথ্‌ তাই বলে।[৯] মিথের এই তিন ধরণের বাস্তবতার ব্যাখ্যা বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ।

ম্যালিনওস্কির ব্যাখ্যায় মিথ্‌-সমষ্টি বিস্তৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কতগুলি সনদ। যদিও এগুলিতে অনেক সময় অনেক কাল্পনিকতার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় তবুও প্রত্যেকটি ধাপে এগুলির সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসের পারম্পর্য রয়েছে। ট্রব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীর সমাজ-সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি এই কথার উল্লেখ করেছেন। অপরপক্ষে জুঙ্‌ মিথ্‌কে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সনদের সূচক বলে মনে করেন না, তিনি মিথ-সমষ্টিকে সমষ্টি-গত অবচেতনের আদিম আদর্শের প্রতীক এক মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সমষ্টি বলে মনে করেন। মিথ্‌গুলি বাস্তবকারণ প্লেটোর আদর্শের মত প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এক বিশেষ রূপ বা ধারাকে প্রতিফলিত করে এই পুরাণ-সমষ্টি। প্রথমেই এই রূপে কোন নির্দিষ্ট চিন্তনের বিষয় থাকে না, কিন্তু বিশেষ সংস্কৃতি নির্দিষ্ট বিষয়ের যোগান দেয়। সামান্যধর্মী রূপগুলিকে মিথ্‌ একটি বিশেষ আঞ্চলিক অবস্থিতি প্রদান ও নামকরণ করে বাস্তবতা আরোপ করে ও চেতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। বাস্তবতা বলতে এলিয়েড 'পবিত্র বাস্তবতা' বোঝেন। তিনি বলেন, "যা পবিত্র তাই বাস্তবতা বলে সুখ্যাত।...মিথ্‌ একটি পবিত্র ইতিহাস আর এই পবিত্র ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করা মানেই রহস্য উন্মোচন করা। মিথের ব্যক্তিরা মানুষ নয়, তারা হয় ঈশ্বর নতুবা কোন সাংস্কৃতিক নায়ক। এই সমস্ত

৮. Jung, K—Psychological Reflections, An Anthology of writings of Jung—Ed. by Jolande Jacobi, Ny, 1953, p. 314.

৯. Eliade—op. cit p. 95

কারণে এদের আচার-ব্যবহার রহস্য-ঘন হয়ে ওঠে এবং মানুষ কখনই তাদের বুঝতে পারে না যদি না এ-রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়।"

উপর্যুক্ত বিশেষ আলোচনায় দেখা যায় ম্যালিনওস্কির দৃষ্টিতে মিথের বাস্তবতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে অনুভূত হয়, জুঙ্-এর মতে মিথের বাস্তবতা উপলব্ধ হয় মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর এলিয়েড মির্সিয়ার মতে আধ্যাত্মিক চিন্তনেই মিথের বাস্তবতা সুস্পষ্ট। রীতি-নীতি ও প্রথার প্রাক-ইতিহাস বা সর্ত্ত হিসেবে মিথ্‌কে বুঝলেও মিথের কতগুলি অপার্থিব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মিথ্-সমষ্টি আদিম আদশের সমাহার হলেও বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এর প্রভাব দেখা যায়। জ্ঞান-তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর উদ্বৃত্ত হলেও ঈশ্বর বিমুখ সংস্কৃতি ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিথ্ এর সম্পর্ক বিদ্যমান। মিথ্ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জগতের দিগ্দর্শন নয়, মানব-জীবনের অন্তঃস্থ এক বিশেষ সৃষ্টিশীল শক্তির নির্দেশ দেয় এই মিথ্, যে শক্তি মাঝে মাঝে মানুষের সাংস্কৃতিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে যায়। যুক্তিবোধের উৎসে আছে এক ধরণের অসাংস্কৃতিক অযৌক্তিকতা আর এগুলিই মিথের অর্থ ও প্রান্তিক চরিত্রের উন্মোচন করে। প্রকৃতি ও অতিমানবিক শক্তি এখনও সংস্কৃতির মূল ও এর অভাবিত পরিবর্তনের উৎস। মিথের বা লোকপুরাণের মাঝে আমরা প্রকৃতি ও অতিমানবিক শক্তির এই ক্রিয়াশীল পরম্পরা লক্ষ্য করি এবং সময় থেকে সময়ান্তরে পরিবর্তনের প্রান্তিক মুহূর্ত্তে সেটা উপলব্ধি করি।

॥ ৪ ॥

সমাজজীবনে মিথের ভূমিকার ও তার বৈশিষ্ট্যের কিছু তাত্ত্বিক-বিতর্কের আলোচনাতেই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মিথের আলোচনা নিবদ্ধ রাখাপদ্ধতি-বিরুদ্ধ। চলমান জীবনে মিথের প্রায়োগিক নিদর্শনের উল্লেখ অবশ্যই করণীয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। মিথ্-অন্তর্নিহিত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ আমাদের অগোচরেও আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যে সমস্ত পর্যায়ে শৈশব হ'তে আমাদের সামা-জিকীকরণ শুরু হয় তার প্রতিটি স্তরেই মিথের উপস্থিতি পরিলক্ষিত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যাবে বহু দেশেই শ্রেণী, বর্ণ ও বিভিন্ন সামাজিক বিভাজনের মূলে আছে মিথের পরিব্যাপ্ত ও বিভিন্ন উপলব্ধি। সামাজিক বিচলনীয়তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মিথের নিরপেক্ষ

নীতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে মিথের প্রভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামজিকীকরণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও বিচলনীয়তা এবং সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব ছাড়াও টোটেম, ট্যাবু, বিবাহপদ্ধতি প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন ধারণার ব্যাখ্যানে মিথের সাহায্য অপরিহার্য। সর্বোপরি সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধনের ক্ষেত্রে বা অ্যাকালচুরেশনে মিথের গৌরবময় ভূমিকা যে কোন মানবিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হতে বাধ্য। মিথের এই সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকার আলোচনা শেষে কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি প্রাবন্ধিক রীতি হিসাবেই উল্লিখিত হতে পারে। এক, মিথ্ প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান-ভাবনা। দুই, বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগেও মিথের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ, বিজ্ঞান মানবিক ও সামাজিক কল্যাণকামী, মিথ্‌ও লোকায়ত সমাজ-নীতির ধারক। অতীত হতে বর্তমানে মিথের রূপান্তর বর্তমানের বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক যুগে মিথের উপস্থিতি সহজ করেছে। মিথ্ গভীর, তার একটি প্রান্তিক চরিত্র আছে। তিন, মিথের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন তথ্য ও ধারণায় মিথের উপস্থিতি এই অনুসিদ্ধান্তের প্রমাণ। চার, মিথে অতিমানবিক সত্তার উপস্থিতি থাকলেও মিথের নিরপেক্ষ চরিত্রই মিথের বিশেষ শক্তি। ধর্মীয় নেতারা তাদের ধর্ম-মতের বিশেষ প্রতীক সৃষ্টি করলেও আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই মিথ্ বা লোক-পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গণমানসে স্থায়ী আসন ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য তাদের এই পদ্ধতি গ্রহণ। ধর্মমত ছাড়াও যে কোন সৃষ্টিকেই লোকায়ত মাত্রা দিতে হ'লে মিথ্ বা লোকপুরাণের স্পর্শ অন্ততঃ প্রয়োজন।

— ০ —

লোকপুরাণের গঠনরীতি

· দুলাল চৌধুরী

To regard all mythology and puranas as tales told by idiots is now rightly held to be unscientific. Mythology greatly helps us in understanding the unfolding of civilisation, of various cultures, of the human psyche itself of the dreams and hopes and fears of man. Myths are at once a record of ancient man's world-view as well as his artistic inventiveness and interpretation of himself and the universe around him.

১. ০ 'মিথ' শব্দের উৎস গ্রীক ধাতু 'মু' (Mu) বা 'মুথ (Muth)। এর অর্থ মুখের কথা। 'মু' ধাতু থেকেই এসেছে 'মুথোস'। এর অর্থও মুখের ভাষায় অভিভাষণ। মুথোস থেকেই এসেছে 'মিথ' যার অর্থ মৌখিক গল্প। শ্রুতি-বাহিত আদিম গল্প একদিকে যেমন সাহিত্য, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান।

ভারতীয় পুরাণের পঞ্চলক্ষণরূপ: সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুর্চরিত। মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণ: সৃষ্টি, বিসৃষ্টি, স্থিতি, কর্মবাসনা, বার্তা, মনুক্রম, প্রলয়, মোক্ষ, কীর্তন ও দেবতার রূপ বর্ণন। এদের ঘিরে বিবৃত থাকে ভূগোল, জ্যোতিষ, তীর্থ, সমাজধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, কামকলা, পাপপুণ্য বিচার, ব্রত, পারলৌকিক মহিমা ইত্যাদি।

মানুষের মানসভূমিতেই পুরাণের জন্ম। আর এই মানবমন তার বিচিত্রমুখী প্রকাশে বিকশিত করেছে সমাজ ও জীবনের নানা রহস্য। সাধারণত পুরাণ বলতে আমরা বুঝি, অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজধর্ম ইতিহাস

অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা বা কথা mythology.[১] প্রাচীন গ্রীসেও 'মিথ' অর্থে গল্প, বাক্য, বাক্ বোঝাত।[২] পুরাণ মূলত কথা, গল্প, রূপক। সৃষ্টি, বিকাশ, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম-সংঘর্ষ, হিংসা-দ্বেষ, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা-ঘৃণা, অপহরণ-ধর্ষণ, জিঘাংসা, জিগীষা, হত্যা-লুণ্ঠন, বিজয়, আত্মসমর্পণ, অভিশাপ, শাপমুক্তি প্রভৃতি মানব-দেবতা বৃত্তির শিল্পিত প্রকাশ পুরাণ। নাতিদীর্ঘ পুরাণ আদিম লোকায়ত স্তর অতিক্রম করে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে রেণু সঞ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১. ২ পুরাণের সর্বাঙ্গে মানুষের চলিষ্ণু মানসিকতার রূপকাশ্রয়ী প্রতিভাস। বর্ণনা ও চিত্রকল্পের এমন সুনিয়ন্ত্রিত অনুষঙ্গ অন্যত্র দুর্লভ। বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র পুরাণের গঠনরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। পুরাণের গঠনরীতি আলোচনায় ক্লদ লেভি স্ট্রসের অবদান উল্লেখযোগ্য।[৩] পরবর্তীকালে মারান্দা দম্পতি 'স্ট্রাকচারাল মডেলস্ ইন্ ফোকলোর এণ্ড ট্রান্সফরমেশান-ন্যাল এসেজস' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করে এই পদ্ধতিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মারান্দা দম্পতি গঠনরীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন : 'গঠন কাঠামো হচ্ছে লোকসংস্কৃতির যে কোন উপাদানের অন্তর্লীন সাংগঠনিক সম্পর্ক। যে সম্পর্ক মূলত উপাদানসমূহের সাংগঠনিক ঐক্যকে দৃঢ় করে।[৪] আর এই গঠনরীতিগত বিশ্লেষণ লোকসংস্কৃতির মৌল উপাদানের বা কণিকাসমূহের এককগুলির বিন্যাস আবিষ্কারের সহায়ক। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ডঃ এল্যান ডাণ্ডিস এই গঠনরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন : 'গঠনরীতির আলোচনার উদ্দেশ্য হলো : লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ। রূপান্তরতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণ একটি চিরায়ত তত্ত্ব ও সংজ্ঞার সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৫] গঠনরীতি প্রসঙ্গে লেভি স্ট্রসও বলেছেন : গঠনকাঠামো মূলতঃ একটি সংগঠন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সূচক।[৬] তিনি আরো একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন গঠনরীতির তিনটি মূলভাব বর্তমান। অবশ্য পিয়াগেটও লেভি স্ট্রসের সঙ্গে একমত। মূলভাবগুলি হলো এই : ক. সামগ্রিকতা (wholeness) খ. রূপান্তর (idia of transformation) গ. আত্মনিয়ন্ত্রণ (idea of self regulation). ভ্লাদিমির প্রপ রূপকথার রূপান্তর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : রূপান্তরী বিশ্লেষণ হলো কোন লোককথার

বিবরণভিত্তিক উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়।[৭] বিবিধ তথ্যের ভিত্তিতে যে তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় গঠনকাঠামো সম্পর্কে তাকেই আমরা বলি 'গঠনতত্ত্ব' (structuralism)।[৮] লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন আমরা গঠনতত্ত্বের কথা বলি, তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হবে লোকসংস্কৃতির যে কোন উপাদানের সাংগঠনিক একক গুলির সংস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক গুলি কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা ছকে আমরা বিন্যাস করে অন্তর্লীন সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করছি।[৯] সমাজ সংগঠনে যে কতকগুলি একক বর্তমান, তেমনি সাহিত্য বা যে কোন লোকশিল্পে এই ধরণের একাধিক একক বর্তমান থাকতে পারে। এই একক সমাবেশেই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুটন সম্ভব।

২.০ ভারতীয় পুরাণ থেকে একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করব। 'সমুদ্র মন্থন' শীর্ষক পুরাণ কাহিনীর কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। স্বর্গের দেবতা এবং অসুরের দ্বন্দ্বের সংবাদ সুবিদিত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বেশ কয়েকবার অসুর বলা হয়েছে। বৈদিক আর্যদের দু'টি পৃথক কৌম ছিল। একটি কৌম অসুর-পূজারী, অন্যটি দেব-পূজারী। আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থকরা গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করলে ঋণগ্রস্তদের ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করা হয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে ঋণ মকুবকারী দেবতাও বলা হয়েছে [ঋগ্বেদ ৪।২৩।৭]।

মহাভারতে আছে সৃষ্টির পূর্বে কেবলই অন্ধকার ছিল। তারপর সৃষ্টি হল একটি ডিম। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর বীজ ঐ ডিমের ভিতর নিহিত ছিল। ব্রহ্মার সাতটি পুত্র। তারাই আকাশের সপ্তর্ষি। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, আর বশিষ্ঠ।

কথিত আছে যে কশ্যপ মুনির দুই স্ত্রী ছিল। অদিতি ও দিতি। অদিতির পুত্ররা (বার জন) আদিত্য বা দেবতা বলে খ্যাত। বরুণ, সবিতা, বিষ্ণু প্রমুখ এঁর সন্তান। দিতির পুত্ররা অসুর বলে খ্যাত। হিরণ্যকশিপু এঁর অন্যতম পুত্র।

সঞ্জীবনী বিদ্যায় অতৃপ্ত দেবলোকের সদস্যবৃন্দ একদা 'অমৃত' পান করে অমর হবার আকাঙ্খায় উদ্‌গ্রীব। সুমেরু পর্বতে দেবসভায় চিন্তায় মগ্ন দেবকুল। কি উপায়ে অমৃত আহরণ করা সম্ভব। চিন্তামগ্ন দেবতাদের দেখে স্বয়ং নারায়ণ ব্রহ্মাকে বললেন: দেবতা আর অসুরগণ একত্রে যদি ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করতে

পারেন, তবে সেই সমুদ্র গর্ভ থেকে অমৃত পাওয়া যাবে। ব্রহ্মা দেবতাদের জানালেন: 'হে দেবতাগণ, তোমরা সমুদ্র মন্থন কর, অমৃত পান করতে পারবে। তবে ধন, রত্ন, রমণী পেলেও তোমরা থেমোনা, প্রলুব্ধ হয়ো না। নিরন্তর সমুদ্র মন্থন করো। অমৃত পাবেই।'

দেবলোকে সাজ সাজ রব। কিন্তু দুর্লভ হলো মন্থন-বাড়ি ও মন্থন-দড়ি। দেবতারা মন্দার পর্বত উত্তোলনে অক্ষম। তাই অবশেষে নারায়ণ সর্পরাজ অনন্তকে পর্বত উত্তোলন করতে আদেশ দিলেন। অনন্ত নাগ আদেশ মাত্রই পর্বত উত্তোলন করে নিয়ে এলো।

দেবতা ও অসুর সমবেতভাবে মন্দার পর্বতসহ ক্ষীর সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হল। প্রয়োজন দড়ি। অতঃপর সকলের অনুরোধে অনন্তনাগ দড়ি হতে রাজি হলো। কারণ বাইশ হাজার যোজন লম্বা মন্দার পর্বতকে বেষ্টন করবার মত ক্ষমতা একমাত্র অনন্তেরই আছে। কুর্মরাজের পিঠ থেকে মন্দার পর্বতকে সুমেরুতে স্থাপন করা হল। এবার শুরু হল মন্থন। দেবতারা ধরলেন সাপের লেজ। অসুররা ধরলেন মাথা। শুরু হল দড়ি টানাটানি। ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। পৃথিবী টলমল করে উঠল, জল ছিটকে আকাশে উঠল, আগুন ধরল পর্বতে। পর্বতের যত ঔষধ-ঔষধি, মণি-মুক্তা, ধাতু ছিল তা আগুনে পুড়ে-গলে ক্ষীর সৃষ্টি করল। এই ক্ষীর সমুদ্রমন্থন হতে থাকল। মাস, বছর, শতাব্দী অতিক্রান্ত। ক্লান্ত দেবকুল। নারায়ণ তাঁদের উৎসাহ দিলেন। আবার দ্বিগুন জোরে চলল মন্থন।

হঠাৎ চতুর্দিক চন্দ্রাতপে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে এলেন সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিত চন্দ্রদেব। বিস্ময়-বিমূঢ় দেবতারা রূপেমুগ্ধ, কিন্তু সমুদ্র মন্থনে অক্লান্ত। চললো আরো মন্থন। উঠে এলো পদ্মফুল। পদ্মমধ্যে উপবিষ্টা লক্ষ্মী। তাঁর রূপে চতুর্দিক আলোকোজ্জ্বল। উৎফুল্ল দেবতা-অসুরের সমবেত প্রয়াসে আরো একটু পরে উঠে এলেন একজন দেবতা, উচ্চৈশ্রবাঃ নামক অশ্ব, কৌস্তভ নামে একটি মণি। কৌস্তভ নারায়ণের কণ্ঠে শোভা পেল এবং অন্য সামগ্রীগুলি দেবতারাই পেলেন। তবুও অসুরেরা নিরাশ হলেন না। আরো দ্বিগুন উৎসাহে দেবতা-অসুরের সমুদ্র-মন্থন চললো। এবার কমণ্ডলু হাতে উঠে এলেন চিকিৎসার দেবতা ধন্বন্তরী। তাঁর কমণ্ডলু অমৃতে পূর্ণ। দেবতারা কমণ্ডলুসহ ধন্বন্তরীকে তাঁদের দাবী করতে থাকল। তখনও সমুদ্র মন্থন পুরোদমে চলছে। এরপরই সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে এলো চারিদন্তবিশিষ্ট ঐরাবত নামক হস্তী। ইন্দ্র

বললেন : এইটি আমার। অতপর তিনিই হস্তীটি পেলেন। অনন্তর মন্থনের পর সমুদ্র থেকে প্রবল স্রোতে বেরিয়ে এল 'কালকূট' নামে বিষম বিষ। এই ভয়ঙ্কর বিষের ঘ্রানেই ত্রিভুবনের অধিবাসী হলো অজ্ঞান। এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে দেখে স্বয়ং ব্রহ্মা শিবকে বললেন : 'এখন উপায় কি ? সকলই যে ধ্বংস হয়।' ব্রহ্মার উৎকণ্ঠায় দেবতাদের রক্ষা করার জন্য মহাদেব সমগ্র কালকূট বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করে রাখলেন। সেই থেকে মহাদেব হলেন 'নীলকণ্ঠ'।

এদিকে বিক্ষুব্ধ অসুরগণ দেবতাদের কাছ থেকে কমণ্ডলুসহ অমৃত ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই সংবাদে নারায়ণ বিষন্ন মনে চিন্তিত। তিনি ছলনাজালে অসুরদের ভোলাতে চাইলেন। এক অপরূপ সুন্দরী রমণীর বেশে তাঁদের তিনি লাস্য-মোহে বিমোহিত করলেন এবং সুধাভাণ্ডটি সুকৌশলে আবার অপহরণ করে স্বর্গলোকে নিয়ে গেলেন। দেবতাদের ভাগে এলো অমৃত। তাঁরা হলেন অমর। বঞ্চিত প্রতারিত অসুরগণ অসহ্য জীবন যুদ্ধ করতে থাকলেন।

২.১ ॥ বিশ্লেষণ :

ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর ধারায় দেবতা ও অসুর পরস্পর বিরোধী শক্তি। এই দুই বিরোধী শক্তি সমাবেশে বিশ্বের ইতিহাস বিবর্তিত। ভারতীয় এই পুরাণ কাহিনীর রূপক বিশ্লেষণ করলে অনেক সত্য দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। 'সমুদ্র মন্থন' পুরাণের প্রতীকার্থ এইভাবে সাজানো যেতে পারে।[১০]

অনন্ত নাগ : অসীম বিশ্বলোক, যা পৃথিবীকে আবরিত করে রেখেছে।

অনন্ত নাগ-মুখ : ধ্রুবতারা, যা স্থির যেন পর্বত। যাকে কেন্দ্র করে গ্রহ, নক্ষত্র ঘুরছে অবিরাম।

অনন্ত নাগ লেজ : দক্ষিণ গোলার্ধ, যেখানে গ্রহমণ্ডল ও সূর্য অবস্থিত।

বিষ্ণু : কল্পিত শক্তি, যিনি সূর্যের এবং গ্রহ, আলোকের সংরক্ষক।

মান্দার পর্বত : ধ্রুব সত্য, মন্থনের কারক।

শিব : সমগ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্ব, বিষ ও মৃত্যুর প্রতীক।

দেবতা : গ্রহলোক, যাঁরা সূর্যমুখী, নিরন্তর সূর্যনির্ভর। সূর্যাস্তে যাঁরা নিষ্প্রভ।

অসুর : নক্ষত্র, যাঁরা রাত্রে গ্রহের চেয়ে উজ্জ্বল এবং সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।

অমৃত : দিবালোক, সর্বদুঃখহর সম্পদ।

সুতরাং, দেবতা : অসুর। উভয়ের লক্ষ্য সর্বদুঃখহর ব্যবস্থা।

: : সত্য : সংঘর্ষ

৩.০ আমি আলোচ্য পুরাণ কথায় লেভি স্ট্রস এবং মারান্দার ছক প্রয়োগ করে এককগুলির সংস্থাপন নির্ণয় করে সমগ্র পুরাণ কথাটির গঠন রীতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। প্রপের বিশ্লেষণ রীতি সাহিত্য প্রকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। তবে প্রপের মডেলগুলি বহু সমালোচিত এবং প্রপ নিজেও তাঁর রূপান্তরী ছকগুলি পরবর্তীকালে আর ব্যবহার করেন নি। গঠনতত্ত্ব কোন দর্শনঋদ্ধ তত্ত্বও নয় আবার কোন বিশেষ পদ্ধতিও নয়। এই আলোচনা শুধুমাত্র গঠনগত একটা চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে মাত্র। সমাজকাঠামোর মত সাহিত্য-সংস্কৃতি কাঠামোতেও কতকগুলি বিরোধী শক্তি বর্তমান। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'binarism' (লেভি স্ট্রস/১৯৬৩)। 'স্ট্রাকচার' বা 'ফ্রেমের' মধ্যে এই দুই বিপরীত শক্তির সমাবেশে গঠনতত্ত্ব কল্পিত। যদিও লেভি স্ট্রস ভাষা বা বাক্যগত প্রতিপক্ষকে গঠনের একক রূপে চিহ্নিত করেছেন।

৩.১ লেভি স্ট্রস বলেছেন : পুরাণ কাহিনী বিভাজন করতে হবে ছোট ছোট বাক্যে। প্রত্যেকটি বৃত্তসূচক বাক্য পরস্পর অর্থ সন্নিবিষ্ট হবে এবং পরিণামে সমগ্র কাহিনী একটি অর্থপূর্ণ ছকে পরিণত হবে।[১৪] যেমন ধরা যাক এই সংখ্যাগুলি যদি এইভাবে সাজাই, তবে কোন ক্রম হয় কি? — ১, ২, ৪, ৭, ৮, ২, ৩, ৪, ৬, ১, ৫, ৪, ৭, ৯ ইত্যাদি। এখানে ক্রমভঙ্গ হয়েছে। যদি আমরা সংখ্যাগুলির ছক এইভাবে সাজাই, তবে একটি ক্রম পাওয়া যাবে। যেমন :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	২		৪	৫	৬	৭	৮	৯

এবার 'সমুদ্র মন্থন' পুরাণ কাহিনীটিকে যদি এইভাবে বিন্যাস করি তবে

একটি ছক সহজলভ্য হবে। নিম্নের কয়েকটি বাক্যে কাহিনীটির মূল গঠন সংস্থান বোঝানো যেতে পারে।

১. দেবতারা 'অমৃত' পান করে
অমরত্ব প্রত্যাশী।

২. অসুরগণও দেবতার
প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁরাও
অমৃত প্রত্যাশী।

৩. ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে
দেবতা ও অসুরদের অংশগ্রহণ

৪. প্রলুব্ধ দেবগণ কর্তৃক
অমৃত-কমণ্ডলু হরণ।

৫. অসুরগণ দেবতাদের
দ্বারা প্রতারিত ও শোষিত।

৬. কর্মনিষ্ঠ অসুরগণ কর্তৃক সমুদ্র
মন্থন শেষে কালকূট বিষ
উত্তোলন।

৭. কালকূট বিষে দেবতা-
অসুরসহ ত্রিভুবন মূর্ছিত।

৮. নারায়ণ কর্তৃক
মহাদেবকে ত্রিভুবন রক্ষার
আমন্ত্রণ।

৯. মহাদেব কর্তৃক
কালকূট বিষ কণ্ঠে ধারণ।

১০. অসুরগণ কর্তৃক দেবলোক
থেকে সুধাভাণ্ড অপহরণ।

১১. নারায়ণ কর্তৃক রূপসীর
ছদ্মবেশে অসুরদের সম্মোহন।

১২. পরিশেষে নারায়ণ কর্তৃক
অসুরদের নিকট থেকে
সুধাভাণ্ড হরণ।

১৩. দেবতারা অমৃতপান
করে অমর হলেন।

১৪. অসুরগণ প্রতারিত ও
শোষিত হয়ে ক্রমাগত
মৃত্যুর অধীন হলেন।

লোকসংস্কৃতির উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গবেষকরা লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি ও সংজ্ঞা ইত্যাদি বিচারেই ব্যস্ত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক বিবরণমূলক লোকসংস্কৃতি চর্চার পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'ডায়াক্রনিক' বা বিবরণমূলক বিচার পদ্ধতি। যদি যুক্তি ক্রমযুক্ত মনস্তত্ত্ব-গত সংগঠন বা কাঠামোগত বিচার করা হয় তবে তাকে বলে 'সিনক্রনিক' পদ্ধতি বা গঠনতত্ত্বমূলক বিচার। 'ডায়াক্রনিক' (diachronic) পদ্ধতিতে টাইপ বা শ্রেণী এবং মটিপ বিভাজন যদিও একদা সমগ্র বিশ্বে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অধুনা লোকসংস্কৃতির কণিকা বিভাজন করে স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি প্রবর্তন করে প্রপ, লেভি স্ট্রস, মারান্দা, ডাণ্ডিস, প্রিয়েভ বা ভাষাতত্ত্বে সস্যুরে, চমস্কি, সিভিয়ক প্রমুখ এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। সমগ্র বিশ্বে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে টাপস→ফাংশন→মোটিপ→মিথিম→সোটিফিম্→ইউনিট ধারায় ক্রম বিবর্তিত। এই মৌলকণাগুলি আবিষ্কার করেন থাক্রমে আর্ণে আর্টি

৪.০ 'মিথ' বা পুরাণ সমাজের যৌথ মানসক্রিয়ার ফসল। সেইজন্য এক বিস্তৃত কালসীমায় প্রকৃতি, পরিবেশ, ভূ-সংস্থান, গ্রহমণ্ডল ও নৈসর্গিক রহস্য এবং মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের অনেক অলিখিত তথ্য লোকপুরাণে বিধৃত। জাগতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রাচীন মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীক ও রূপকের আড়ালে শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছে। ফলে আপাত অর্থের অন্তরালে এক দূরান্তিক অর্থও পরিস্ফুট হয়েছে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই

গঠনরীতি বিচারণা পদ্ধতি কতটা পুরাণের সমাজতত্ত্ব (social representation) প্রতিভাষিত করেছে। কারণ যে কোন লোককথায় কথক-শ্রোতা সংযোগসূত্রে অখণ্ডভাবে বিধৃত। এই সংযোগ প্রণালীর বাস্তবতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা লোকপুরাণ আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লেভি স্ট্রস 'মিথ' পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অনেকটা হেগেলীয় দর্শনের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তত্ত্ব (thesis)→প্রতিতত্ত্ব (antithesis)→সমন্বয় (synthesis)— এই ক্রমই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের মূল ভিত্তি। ডারউইন ও মার্কসের মতবাদের সংকর্ষে লেভি স্ট্রস গঠনতত্ত্ব বিচার করেছেন।

মূলতঃ লোকসংস্কৃতির নামগ্রক প্রক্রিয়াটা হলো সামাজিক সংবেদন বা সংযোগ।[১৫] সুতরাং একটি মিথ বা লোকপুরাণের বস্তুগত বিশ্লেষণই হলো গঠনরীতির বিশ্লেষণ। লোকপুরাণ যে সত্যবাণী সংবেদন করে, তা যদি কয়েকটি বাক্য ও প্রতিবাক্যে আমরা বিশ্লিষ্ট করি তবে গঠনগত একটি রূপের চিত্র পাব। লেভি স্ট্রস এই সাংগঠনিকগত বৈপরীত্যের চিত্রটি ভাষা বা বাক্যে বিন্যস্ত করেছেন। এই ভাষাতাত্ত্বিক বিন্যাস রূপগত বা শ্রেণীগত। প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব কিম্বা আচরণগত প্রতিক্রিয়াকে সুচিহ্নিত করা যায় না। প্রতিপক্ষ ও বিরোধকে লেভি স্ট্রস সমন্বিত করতে পারেননি। তাই তাঁর মডেলটি সার্বজনীন তত্ত্বে পরিণত হয়নি। কল্পিত কোন 'মডেল' ছক সমাজ সংস্থিত কোন বিরোধাভাসের প্রতিভাস হতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর আদিম-লোকায়ত সংস্কৃতির কাঠামোগত রূপসাদৃশ্য বস্তুতপক্ষে একটি 'গঠনকাঠামোর' ইঙ্গিত দিতে পারে। লেভি স্ট্রস যে মানবমনের ঐক্যতানের (psychic unity of mankind) কথা বলেছেন, তা বাস্তবতার দিক থেকে দেশে দেশে সমাজে সমাজে ভিন্ন হতে পারে। তাই একটি সর্বাত্মক তত্ত্ব লেভি স্ট্রসের 'মডেল' বা ছকে অনুপস্থিত। এই গঠনতত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন: গঠনতত্ত্ব একটি পদ্ধতি। এটা কোন দর্শন বা তত্ত্ব নয়।[১৬]

আপাতত বিচার করলে দেখতে পাব মৌখিক সাহিত্যের সর্বত্রই একটি গভীর কাঠামো (deep structure) এবং একটি উপসৌধ-কাঠামো (surface structure) বর্তমান। যেমন লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর্নে (১৯১০) প্রথমে 'টাইপ' বা শ্রেণী বিভাজন করে নতুনত্ব সঞ্চার করেছিলেন।

পরবর্তীকালে (১৯২৮) প্রপ তার সুবিখ্যাত 'মরফলজিক মিথিক' গ্রন্থে 'ফাংশন' বা ক্রিয়া আবিষ্কার করে আর এক নবদিগন্তের উন্মোচন করে-ছিলেন। লোকপুরাণ প্রসঙ্গে লেভি স্ট্রস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন : মিথের গল্প বহিরঙ্গ মাত্র। গবেষককে এই গল্পের আবরণ উন্মোচন করতে হবে। মনে করতে হবে মিথ একটি অখণ্ড রূপক। মিথ শুধু কতগুলি বক্তব্যের সমাহার নয়। মূলতঃ মিথ কতগুলি বিপরীতাত্মক বক্তব্যের পক্ষের শিল্পিত রূপ মাত্র।[১৭] এই বৈপরীত্যকে এইভাবে যূথবদ্ধ করা চলে :

প্রকৃতি / সংস্কৃতি
কাঁচা / পাকা
মধু / তামাক
নৈশব্দ / কোলাহল ইত্যাদি : এর সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারি : দেবতা / অসুর, মানুষ / পশু, পালন / শোষণ / বিষ / অমৃত ইত্যাদি। এই বৈপরীত্য ভাষায়, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে এবং লোকা-য়ত জীবনেও বর্তমান।

প্রপ তাঁর বিখ্যাত 'মরফলজি অফ দি ফোকটেল' গ্রন্থে রূপকথার 'ফাংশন' অর্থে চরিত্রের সংস্থানের (dramatis personal) ওপর প্রাধান্য দিয়ে-ছিলেন। ডাণ্ডিস মনে করেন : গঠনগত একক নির্ধারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'মটিফিম বা এলোমটিপ (motifeme and allomotif) শব্দদ্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ। 'ফোনিম্' বা মর্ফিম যেমন ভাষার ধ্বনি বিচারে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি লোককথার ক্ষেত্রেও মোটিফিম বা 'এলোমোটিপ' তাৎপর্যপূর্ণ।[১৮] পরিশেষে ডাণ্ডিস এই গঠনরীতির আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন : যদি গঠনগত এককের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপিত করা যায়, তবে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গঠনগত চর্চার ভবিষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ।

৪. ১ চমস্কির রূপগত ব্যাকরণ চর্চার সুবিখ্যাত 'সিনট্যাটিক স্ট্রাকচার' গ্রন্থে রৈখিক গঠন (linear structure) এবং ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তরণ গঠন, বাক্যবিন্যাসরীতির কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'কর্তা', 'কর্ম', 'বিশেষ্য', 'ক্রিয়া' ইত্যাদির সংস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকর্মক কিম্বা অকর্মক সম্পর্ক বস্তুত বাক্যবিন্যাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। যেমন :

My friend / will open / the door

[আমার বন্ধু / দরজাটি / খুলবে]

এখানে বিশেষ্যপদ (NP) : My friend (আমার বন্ধু) / the door (দরজাটি) ক্রিয়াপদ (VP) : will open (খুলবে)

কাজের সুবিধার জন্য নোয়াম চমস্কি কয়েকটি প্রতীক (symbol) ব্যবহার করে বাক্য বিন্যাসরীতি বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন 'বাক্য' (S), বিশেষ্যপদ (NP), ক্রিয়াপদ (VP), ক্রিয়া (V), সহায়ক ক্রিয়া (Aux) এবং ক্রিয়া নির্ধারক (Det)। তা'হলে বাক্যটিতে একক দাঁড়াচ্ছে আপাতভাবে দুটি :

এক. My friend / the door

দুই. will open.

তাহলে এই এককগুলিকে একটি ছকে বিন্যাস করলে (নোয়াম চমস্কির অনুকরণে) দাঁড়াবে এই রকম :
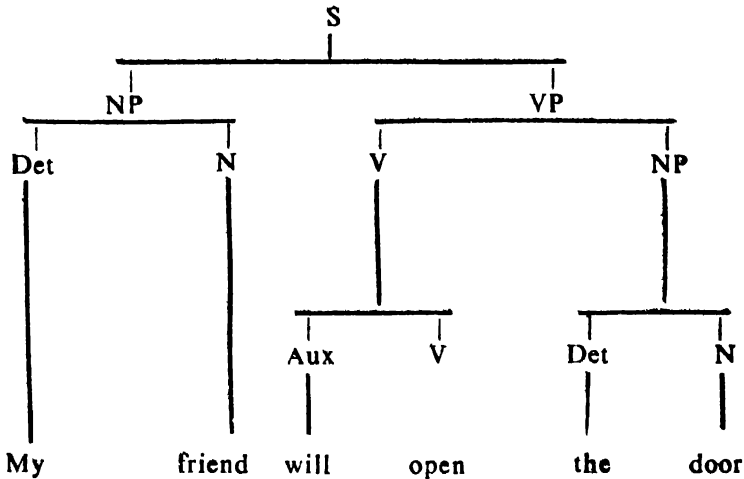
৪.২ নোয়াম চমস্কির Syntactic Structurers (1957) অনুসারে রূপান্তরণ তত্ত্ব প্রয়োগ করলে এককগুলির বিন্যাস হবে এই রকম :

The door will be opened by my friend.

$$NP_1 \rightarrow Aux \rightarrow V \rightarrow NP_2 \rightarrow NP_2 - Aux + be + en - V - by + NP_1$$ [২০]

প্রপ মূলত 'জেনারেটিভ গ্রামারের' সূত্রাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রূপ-কথার একক নির্ধারণ করে গঠনরীতি বা রূপান্তরণ পর্যালোচনা করে-ছিলেন। প্রপ তাঁর প্রতিপাদ্য রূপকথার মৌল উপাদানগুলির বিন্যাস করেছের। প্রত্যেক কাহিনীর কতগুলি 'চলন' (move) আছে। যেমন :

১. প্রতিনায়ক / Villain / A অথবা a lack (a).

২. সঞ্চালক ক্রিয়া→বিবাহ পর্যন্ত (w')

৩. পুরস্কার (F)

৪. লাভ কিম্বা বিমোচন (a gain or liquidation of misfortune/(k)

৫. পলায়ন (an escape from persuit (Rs)

একটি কাহিনীতে একাধিক চলন (move) থাকতে পারে। চলনের ক্রম প্রপ এইভাবে বিন্যাস করেছেন :

১. (ক) A _________ W*

(খ) A _________________ W²

২. (ক) A _________________ G ··· K W¹

(খ) a _ _ _ _ _ K

এইভাবে কাহিনী সরল থেকে জটিল চলনে প্রবেশ করতে পারে। একটি সরল কাহিনীর বিন্যাস প্রপ এইভাবে করেছেন। কাহিনীটির নাম দিয়েছেন 'Kidnapping of a person'। আমরা বাংলায় নাম দিতে পারি :

অপহরণ

গল্পের ক্রম এই রকম :

একজন জারের তিন কন্যা ছিল (*a*। কন্যারা ভ্রমণে বের হয়েছিল (p^3) বাগানে দীর্ঘক্ষণ ছিল (o^1)। একটি ড্রাগন তাদের অপহরণ করল (A') তারা সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করল (B')। তিনজন সাহসী নায়কের আবির্ভাব ($C\uparrow$)। ড্রাগনের সঙ্গে তিনজনের তিনবার যুদ্ধ হলো ($H'-I'$)। তিনকন্যাকে উদ্ধার করা হোল(K^4) প্রত্যাবর্তন করল ছজন ($\downarrow$) নায়কদের পুরস্কৃত করা হোল (W^0)।

সূত্রটি হলো এই : $p^3 o^1 A'B'C' \uparrow H'I'K^4 \downarrow W^0$

৪.৩ মারান্দা লোকপুরাণের ছক বিন্যাস করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ঘটনার

সাদৃশ্য বিবেচনা করে যে রূপক কল্পনা করা হয় তা' মূলত: ক্রমসঞ্চালক সাদৃশ্য (continuous analogy) এবং ভঙ্গক্রম সঞ্চালক (discontinuous analogy). যেমন ক : খ : : খ : গ : ঘ অথবা ক : খ : : গ : ঘ ইত্যাদি। লেভি স্ট্রস যে সূত্রটি এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা হলো এই :

$$fx(a) : fy(b) : : fx(b) : fa^{-1}(y)$$

এই সূত্রে (b) হলো মাধ্যম (mediator) ; (a) হলো প্রথম সমাজ-ইতিহাস জ্ঞাপক, চলন ও ক্রিয়া (fx), অন্যান্য ক্রিয়া (fy)। লেভি স্ট্রসের সমীকরণটি সাদৃশ্যসূচক চলন থেকে সমাহৃত।

'সমুদ্র মন্থন' লোকপুরাণটির গঠনগত বিন্যাস নিম্নলিখিত ক্রমে সাজানো যেতে পারে। কাহিনীটির মোটিপ হলো এ১০০—এ৪৯৯ এবং ডি০—ডি৬৯৯ যথাক্রমে দেবতা ও যাদুবিদ্যা/রূপান্তরণ সূচিত করে।

—	+
সমুদ্র বাসযোগ্য নয় =পৃথিবী নয়	মন্দার পর্বত অনন্তনাগ সহায়ক

এর অর্থ হলো '—' ঋণাত্মক এবং '+' ধণাত্মক। অর্থাৎ 'সমুদ্র' জনবসতি-হীন তাই ঋণাত্মক, 'মন্দারপর্বত' 'অনন্তনাগ' সমুদ্রমন্থনের সহায়ক বা কারক। সুতরাং,

—	+
	+ +

যদি একটি ছকে এই 'ঋণাত্মক' ও 'ধনাত্মক' উপাদানগুলির বিন্যাস করি, তাহলে কাহিনীর চলন (move) এমনিভাবে ধরা পড়বে :
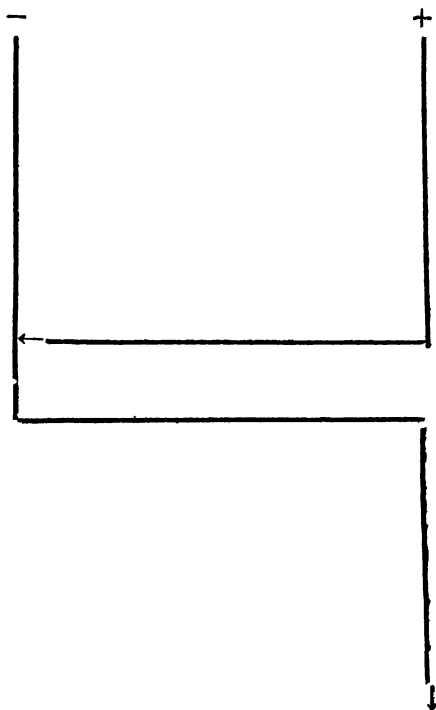
এখন গঠনতত্ত্বটি দাঁড়াবে এই রকম :

ক — সমুদ্র

খ — মান্দার পর্বত, অনন্ত নাগ [মন্থনের সহায়ক]

ক্রিয়া :

চ — তরল

ছ — কঠিন

অতএব সূত্রটি হবে এইরকম :

$ফ_{চ}$ (ক) : $ফ_{ছ}$ (খ) : : $ফ_{চ}$ (খ) : $ফ_{ক-১}$(ছ)

দেবতা ও অসুরের সমুদ্র মন্থন কঠিন মান্দার পর্ব্বত দিয়ে। যেখানে অনন্ত নাগ সহায়ক। সমুদ্র থেকে উত্থিত অমৃত উভয়পক্ষের কাছে প্রার্থিত। অথচ অসুরেরা প্রতারিত। অতএব সমগ্র কাহিনীতে কার্য-কারণ সম্পর্কে দুটি পক্ষ বর্তমান।

এই দুই প্রতিপক্ষ হলো :

মব : দেবতা : অসুর

মভ : বিষ : অমৃত

লব : সত্য : মিথ্যা

লভ : সঞ্চয়ন : হরণ

সুতরাং প্রকৃত ঘটনাবিন্যাসে যে সূত্রটি পরিস্ফুট হয়, তা হলো : মব : : মভ :: লব : লভ। দেবতা ও অসুরের দ্বারা সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত সঞ্চয়ন বা লাভ করা গিয়েছিল তা, পরিণামে প্রকৃতপক্ষে অপহৃত হলো দেবতাদের দ্বারা। অসুরেরা প্রতারিত ও শোষিত হলো। মহাদেব (নীলকণ্ঠ) 'মধ্যমণি' বা সঞ্চালক। কারণ কালকূট বিষ তিনিই কণ্ঠে ধারণ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন। একদিকে নারায়ণের প্রতিনায়কসুলভ হীন চক্রান্ত, অন্যদিকে অসুরগণের সত্যনিষ্ঠা এই কাহিনীতে সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে। একদিকে দেবতাদের প্রাথমিক চলন→ছলনা→হরণ অন্যদিকে অসুরদের সত্যনিষ্ঠা→সঞ্চয়ন→প্রতারণা এই লোকপুরাণে 'Lack' ও 'Liquidation' এর বৈপরীত্যে যথার্থ গঠনগত কাঠামোকে পরিচ্ছন্ন রূপদান করেছে। অসুরদের 'Lack' দেবতারা সুকৌশলে 'Liquidation' করলেন।

দেবতা ও অসুরের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অজানা ছিল না। গ্রহ ও নক্ষত্র, প্রকৃতি-পরিবেশের যথার্থ পরিবর্তনশীলতার পটভূমিতে নশ্বর দেব ও অসুরের অবিনশ্বরতার আকাঙ্খা স্বাভাবিক। দুই বিরোধীশক্তির সহাবস্থানে 'সমুদ্রমন্থন' যথার্থই গঠনতত্ত্বের সতটিকে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছে। কিন্তু গঠনতত্ত্বের এই ছকগুলি সমাজবিন্যাসের নিম্নতম ভূমির কাঠামো কি নির্ধারণ করতে পারে? আমাদের সংশয় কয়েকটি ছক বা প্রতীক সমগ্র কাহিনীর সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দৃষ্টিগোচর করতে পারছে না।

ভবিষ্যতে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ত কোন নতুন সূত্রের সন্ধান দিতে পারে।

টীকা :

[সং পুরাতন > প্রা. পুরাণ > আ. বাঙ্গালা পুরাণ]

১. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান/দ্বিতীয় ভাগ/১৯৭৯ ॥ শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস

২. myth/mith/n-s [GK. mythos tale, speech].

1. a story that is usu. of unknown origin and at least partially traditional, that ostensibly relates historical events usu. of such character as to serve to explain some practice, •belief institution or natural phenomenon and that is esp. associated with religions rites and belief—compare Euhemerism, Fable, Folktale.

2. a story invented as a veiled explanation of a truth : parable, Allegory.

—Webster's Third New International Dictionary Vol : II/1971

৩. Structural Anthropology/Penguin/1963/Claude Levi-strauss

৪. Structure can be defined as the internal relationship through which constituent elements of whole are organized. Structural analysis thus consists of the discovery of significant elements and their order,

—Structural Models in Folklore and transformational Essays/Moulon
1971/E. K. Maranda and P. Maranda

৫. An immediate aim of structural analysis in folklore is to define the genres of folklore. Once these genres have been defined in terms of internal morphological characteristics, one will then be better able to proceed to the interesting

problems of the function of folkloristic forms in particular cultures. Furthermore, morphological analysis may reveal that a given structural pattern may be found in a variety of folklore genres.

৬. op. cit.

৭. 'a description of the tale according to its components relation of each other and the whole'.

—V. Propp / The Morphology of Folktale.

৮. Structuralism : 1. a theory that emphasizes the importance of structure as contrasted with function in mental life.

৯. In folktoristic texts, too, there are certain regularly recurrent units which permit experimentation along methodological lines which might be regarded in these broad terms as structural. This should surprise no one who has reflected on the close analogy between the language-speech dicho-

tomy of saussurean linguistics, and the relationship of a given folkloristic type and its actua variations as presented by specific informants.

১০. A new interpretation of a pauranic story.

১১. Myths and Legands of Many lands/1930/London/
—Evelyn Smith

১২. হারানো দিনের পুরানো গল্প/উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

১৩. Structuralism is neither a theory nor a method, it is an epistemological point of view. It starts out from the observation that every concept in a given system is determined by all other concepts of that system and has no significance by itself alone ; it does not become unequivocal until it is integrated into the system, of which it forms part andin which it has a definite place :

১৪. 'Shortest possible sentences and writing each sentence on an

index card bearing a number corresponding to the unfolding story.' —Levi-strauss/op. cit.

১৫. 'The whole of culture may be regarded as a communications system. Myth is but a particular from of communication The Structural Study of Myth and

১৬. Levi-strauss insists that structuralism is a method rather than a philosophy or even a theory.'/Anthropologists and Anthoropology

১৭ Ibid/pp. 220

১৮. Analytical Essays in Folklore/1975/Alan Dundes.

১৯. With the aid of the rigorous definition of structural units, the future of structural studies in folklore looks promising indeed. —Ibid/pp71

গ্রন্থপঞ্জী :

১. Propp, V.—Morphology of the Folktale/

২. Maranda, E. K. and P. —Structural Models in Folklore and

৩. Edited by Edmond Leach,
Myth and Totemism

বিশ্বের লোকপুরাণ

-সংকলন

অনুবাদ ঃ

বাণী ঘোষ * নিবেদিতা গুপ্ত * রীতা বসু * রেখা রাউত
গোপা সরকার * মঞ্জু দত্ত * দিব্যজ্যোতি মজুমদার
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় * পল্লব সেনগুপ্ত

॥ পূর্বকথা ॥

এই সংকলনে বড় এবং ছোট যে-পুরাকাহিনীগুলি নির্বাচিত এবং গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের মাধ্যমে লোকপুরাণের বলতে গেলে সমস্ত ধরণের নমুনাই মিলবে। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রধান-প্রধান ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক বলয়গুলি পুরাণবৃত্ত আলোচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকটিরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এই সংকলনে। ধ্রুবপদী পুরাণকাহিনীও প্রাসঙ্গিকভাবে এর মধ্যে রাখতে হয়েছে, তা নইলে সংকলনটি পূর্ণায়ত একটা রূপ লাভ করত না। ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্ত থেকে সেই সব বিবরণই সংগৃহীত হয়েছে, যারা লৌকিক ধর্মকে মোটা-মুটি নিটুট রেখেছে। বাংলায় ত বটেই, খুব সম্ভবত কোনো বিদেশী ভাষাতেও বিশ্বের সমস্ত প্রধান সাংস্কৃতিক বলয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক এমন ব্যাপক একটি সংকলন বিরল বলেই আমাদের বিশ্বাস করবার কারণ আছে। এর থেকে আয়তনে বড লোকপুরাণ-সংগ্রহ অবশ্যই আছে, কিন্তু একটি মাত্র সংকলনে এতটা বহুধা-ব্যাপ্তি সেখানে কতখানি পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞরাই তার বিচার করবেন। সংকলনের দোষ-ত্রুটির দায় অবশ্যই সম্পাদকের; অনুবাদের সুষ্ঠুতার কৃতিত্ব কিন্তু আর সব অনুবাদকদের—একথা বলাই বাহুল্য!

॥ এক ॥ দেবী ফুলুগা আর মানুষদের কথা ॥

[আন্দামানের ওঙ্গেদের লোকপুরাণ]

ফুলুগা স্থষ্টি করলেন পৃথিবী। ধরিত্রীর নীচে এক বিশাল জঙ্গলের মধ্যে এক সুদীর্ঘ তালগাছ, পৃথিবী রইল তার মাথায়। মৃত সব মানুষের আত্মারা সেই স্বল্পালোকিত অরণ্যের অধিবাসী। তারা সেখানে শিকার করে ডাঙার জীবজন্তুই শুধু, সমুদ্র সেখানে নেই যেহেতু। সেই প্রেতের দল শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই থাকে এক বিশাল বুনো ডুমুরের গাছের তলায়। সেই ডুমুর খায় তারা। পূবদিকের আকাশের নীচে আছে খুব ঠাণ্ডা এক জগৎ; সেখানে থাকে খুনী এবং অন্যান্য পাপীদের আত্মা। এই জগতের সঙ্গে সেই জগতের আসা-যাওয়ার জন্যে একটা সাঁকো বাঁধা আছে; কখনো-কখনো দেখা যায় সেই সেতু। তার নাম রামধনু।

পৃথিবীর পরে ফুলুগা গড়লেন এক মানুষ। তার নাম টোমো। আমাদের মতনই কালো তার রং তবে আমাদের চেয়ে মাথায় অনেক লম্বা আর মুখভর্তি তার দাড়ি। আমাদের মতো মাথায় খাটো, গোঁফদাড়ি না-থাকা চেহারা ছিল না তার। ফুলুগা দেবী বড় ছোট দুই দ্বীপের মাঝখানের সরু সমুদ্দুরের কাছে ওটিইমী বলে যে জায়গা—তখন সারা দুনিয়ার মধ্যে সেখানেই শুধু ছিল জঙ্গল—সেখানে তাকে রাখলেন। গাছের ফল চেনালেন তিনি টোমোকে—কিন্তু বর্ষার সময়ে আবার কোনো কোনো ফল খেতে বারণও করলেন। দু' রকমের গাছের ডাল—একবার এটা, তার ওপর ওটা, তার ওপর আবার প্রথমটা এই ভাবে সেগুলো সাজিয়ে দিলেন দেবী, তারপর সূর্যকে আদেশ করলেন তার ওপর বসতে। এইভাবে টোমো পেল আগুন।

টোমোকে তিনি এবারে শেখালেন কেমন করে শুওর রেঁধে খেতে হয়। তখন শুওর বেচারীরা ছিল নেহাৎই অসহায়, নাকও ছিল না কানও ছিল না, তার ওপরে নিজেরা-নিজেরা পারত না খেতে! এবার দেবী চলে গেলেন হয় তাঁর এখনকার বাড়ি আকাশে, আর নয়ত আগে তিনি যেখানে থাকতেন, সেই সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার ওপরে।

প্রথম মেয়েমানুষের নাম চানা ইলেওয়াদি। কেউ কেউ বলে ফুলুগা তাকে সৃষ্টি করেছিলেন টোমোকে খাবার আর আগুন জুগিয়ে দেবার পর ; জলে সাঁতার দিচ্ছিল সে ওটিইমীর কাছে। জল থেকে উঠে এসে চানা ইলেওয়াদি টোমোর সঙ্গে ঘর করতে শুরু করল। তাদের দুটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে জন্মাল। কেউ আবার বলে যে, দক্ষিণের দ্বীপের পশ্চিম দিকের আধখানা সমুদ্দুরের মধ্যের যে ছোট দ্বীপটা, সেখানে চানা ইলেওয়াদি যখন উঠে এসেছিল জল থেকে প্রথম, তখনই নাকি তার পেট ভর্তি ছিল বাচ্চায়। আমরা হলাম ঐ চানা ইলেওয়াদিরই বংশধর।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই শুওরের পাল এমন ভাবে বেড়ে গেল যে, তাদের খাইয়ে দেওয়াই হল এক বিরাট দায়। আগেই বলেছি, ওরা তখন নিজেরা-নিজেরা খেতে পারত না! কাজেই চানা ইলেওয়াদি তাদের বেঁটে শুঁড়ে আর মাথায় ফুটো করে দিল ক'টা, যাতে নিজেরাই তখন থেকে তারা খাবার জোগাড় করে খেতে পারে। ওটিইমীর জঙ্গলও চারিদিকে ছড়িযে গেল শুওরের গুষ্টিকে ঠাঁই দেবার জন্যে। হয় ফুলুগা নিজেই গাছগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর নয়তো টোমো নিজেই তীরের সঙ্গে মাছি বেঁধে বেঁধে চারিদিকে ছুঁড়েছিল। আর মাছিগুলো হয়ে গিয়েছিল গাছ। তখন আবার শুওর শিকার করা এদিকে খুব কঠিন হয়ে উঠল। কাজেই ফুলুগা তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করতে শেখালেন পুরুষদের। আর একবার পৃথিবীতে নেমে তিনি চানা ইলেওয়াদিকে শেখালেন ঝুড়ি আর জাল বুনতে, সঙ্গে সঙ্গে লাল সাদা কাদামাটি ব্যবহার করতেও শেখালেন সাজগোজের সরঞ্জাম হিসেবে।

ফুলুগা টোমো আর চানা ইলেওযাদিকে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন তারা বর্ষাকালে সূর্য ডোবার পরে আর কোনো কাজ না করে। করলে তাঁর পোকা-মাকড়েরা বিরক্ত হবে। যদি সন্ধ্যের পর কখনো তারা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ শোনে, তাহলে তাদের মাথা ধরে যাবে কি না! সে জন্যে ফুলুগারও বিরক্তির কারণ ঘটবে। ফুলুগা ওদের দুজনকে আদি ভাষাও শিখিয়ে গেলেন।

টোমো একদিন লম্বা বঁড়শী দিয়ে একটা বিরাট মাপের মাছ ধরতেই, সেটা আবার এমন জোরে ল্যাজের ঝাপ্‌টা মারল যে গোটা এলাকা একেবারে ফেটে-ফুটে চৌচির হয়ে তৈরী হল ছোট ছোট নদী। বহুদিন বেঁচে ছিল টোমো, তার বংশধরও হয়েছিল অগুণতি। তখন ফুলুগা তাদেরকে জোড়ায়-জোড়ায়,সমস্ত দ্বীপে

ছড়িয়ে দিলেন, সঙ্গে দিলেন আগুন আর অন্য সব গেরস্তালি জিনিষপত্র। তাদের থেকে গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, আর প্রত্যেক দলের নিজস্ব ভাষা। অবশেষে টোমো বুড়ো একদিন সুমুদ্দুরের জলে ডুবে গিয়ে হল কচ্ছপদের দুশমন তিমিমাছ; চানা ইলেওয়াদিও ডুবে গেল; সে হল চিতি কাঁকড়া।

টোমোর পরে সর্দার হল তার নাতি কোল্ওয়ট। সেই ছিল প্রথম লোক লম্বা বঁড়শী দিয়ে কচ্ছপকে যে গাঁথতে পেরেছিল। কিন্তু কোল্ওয়ট মরে যাবার পর তার বংশধরেরা ফ্লুগা যে সব-ব্যাপার-স্যাপার নিষেধ করেছিলেন, সেই-সেই কাজ করে তাঁকে অমান্য করায়, ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বন্যাকে পাঠালেন সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দেবার জন্যে। কেউ বলে সারা পৃথিবীই ডুবেছিল প্লাবনে, কেউ বলে—না, তা নয়, ফ্লুগার যেখানে আদি বাস ছিল সেই উঁচু পাহাড়টি ছিল বন্যার সময়েও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বানের জলে ডুবে মরেছিল সবাই, শুধু দু-জোড়া মেয়ে-পুরুষ তখন নৌকোয় করে যাচ্ছিল বলে বেঁচে যায় কোনো মতে। জল যখন নামল, ওরা চারজনে ওটিইমীতে এসে উঠল ডাঙায়। কিন্তু পৃথিবীর আর সব মানুষ জীবজন্তু তখন শেষ হয়ে গেছে; নিভে গেছে আগুনও।

দেবী নতুন করে সৃষ্টি করলেন সমস্ত প্রাণী। কিন্তু আগুন নেই। কাজেই মাছরাঙা পাখি গেল তাঁর ডেরায়, যেখানে তিনি আগুন পোহাচ্ছিলেন তখন। একটা জলন্ত কাঠ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে ভার সামলাতে না পেরে মাছরাঙা সেটাকে ফেলল আর কোথাও নয়, ঠিক ফ্লুগারই গায়ে। ক্রুদ্ধ হয়ে দেবী সেটাকে ছুঁড়ে মারলেন বটে উড়ন্ত মাছরাঙার দিকে তাক করে, কিন্তু ফস্কে গিয়ে জলন্ত টুকরোটা পড়ল এসে ওটিইমীতেই! এখনও জলছে সেই আগুন।

ঐ দুজোড়া মেয়েপুরুষের ছেলেপুলেদের বংশধরেরাই বাড়তে লাগল আবার পৃথিবীতে। কিন্তু তারা ফ্লুগার পাঠানো বন্যার কথা বলাবলি করতে-করতে ঠিক করল তাঁকে মেরে ফেলবে। দেবী শেষ বারের মতো নেমে এলেন পৃথিবীতে; এই বার নিয়ে হল চার বার। ফ্লুগা হেঁকে বললেন, "আমার শরীর কাঠে গড়া; কে আছ এগিয়ে এস, ছোঁড় তীর আমার গায়ে।" ফ্লুগা তাদের ভৎ´সনা করে বললেন যে তারা তাঁর নিষেধ অমান্য করে লতানে গাছের কন্দ খুঁড়ে খেয়েছে, জঙ্গলের মোম নিয়ে পুড়িয়েছে আরও অনেক বারণ

শোনেনি। শেষবারের মতো ফুলুগা সবাইকে এই সব করতে নিষেধ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার বিরুদ্ধে সাবধান করলেন। আর তিনি ফেরেন নি। লোকে এখনো তাঁর সব কথা মেনে চলে।

এখন থেকে বহু, বহু কাল পরে ফুলুগা আর চুপচাপ থাকবেন না। বিরাট এক ভূমিকম্প ঘটাবেন তিনি, পৃথিবী যাবে উল্টে, সমস্ত জ্যান্ত মানুষ গিয়ে পড়বে নীচের তলায় সেই কম আলোয় টিম্‌টিম্‌-করা প্রেতের জঙ্গলে; তাদের পূর্ব-পুরুষদের আত্মারা উঠে আসবে ওপরে—সেখানে তারা তখন থেকে বরাবরের মতো বাস করবে, রোগ-বালাই থাকবে না, তারা বুড়ো হবে না, মৃত্যু বলে কিছু রইবে না। বিয়ে হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে; চিরকাল তরতাজা জোয়ান হয়েই বেঁচে থাকবে তারা॥

[বড় ছোট দ্বীপ গ্রেট ও লিট্‌ল আন্দামানস; সরু সমুদ্দুর আন্দামান প্রণালী; সব চেয়ে উঁচু পাহাড় স্যাড্‌ল্ শৃঙ্গ; ওটিইমী অঞ্চলের ভাষাই হল সমস্ত আন্দামানী উপভাষার মূল; ঐ অঞ্চলের লোকেরা অন্যদের চেয়ে লম্বা, তাদের দাড়িগোঁফও বেশী হয়।]

॥ দুই ॥ পৃথিবীর জন্ম ॥

[সাঁওতাল জাতির সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ]

ঠাকুরজিউ মানুষ সৃষ্টি করে ভাবলেন, রাখবেন কোথায়? বিশ্বচরাচর শুধু জলে-জলময়। কোথাও ডাঙার অস্তিত্বটুকুও নেই। সেই জলে বাস করে শোল হাও [মাছ], কাট্‌কোম [কাঁকড়া], লেন্‌ডেট কুয়ার [কেঁচো] আর লেন্‌ডম কুয়ার [কুমীর]। ঠাকুরজিউ ডেকে তাদের হুকুম দিলেন জলের তলা থেকে মাটি তুলে এনে ডাঙা গড়তে। আগে এল শোল মাছ। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও তার দ্বারা ও কাজ হয়ে উঠল না; সে তখন চলে গেল। কাঁকড়া বলল, "আমি মাটি তুলে আনছি জলের তলা থেকে।" কিন্তু সেও পারল না। কাট্‌কোম তার মাথা জলের তলায় গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে মাটি গিলে এনে ওপরে উগ্‌রে দিয়ে জমি বাঁধবার চেষ্টা করল অনেকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই মাটি ফের তলিয়ে গেল জলের নীচে।

এবারে লেন্‌ডম কুয়ার এসে বললে, "জলের ভেতরে থাকে কাছিম কুয়ার

[কচ্ছপ] ; আমরা যদি চারকোণে চারটে শেকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখি আর তার পিঠের ওপবে মাটি জড করি, তাহলে সেগুলো আর পডে যাবে না, ওখানেই থেকে যাবে। এই ভাবেই জমি তৈরী হবে।" কাছিম কুয়াবকে ঐভাবে বেঁধে তার পিঠের ওপর লেনৃডেট কুয়াব মাটি তুলে তুলে জমা করল। এই ভাবে তৈরী হল পৃথিবী—জলের মধ্যে একটা দ্বীপের মতো খুব তাডাতাডিই। ঠাকুবজিউ তাব ওপরে সৃষ্টি করলেন একটা 'কবম' গাছ, তার গুঁডির নীচে গজালেন সিরমোম ঘাস—এরপরে জন্ম দিলেন ধোবীঘাসের—সারা পৃথিবী ছেয়ে গেল তাইতে। নানা ধরনের গাছ গাছালি সৃষ্টি করে ঠাকুরজিউ এইভাবে পৃথিবীব মাটিকে পোক্ত করলেন ॥

॥ তিন ॥ প্লাবনের পরে নতুন সৃষ্টি ॥

[মধ্যভারতেব ভিল্‌জাতির লোকপুরাণ]

ধোপা আব তাব বোন জঙ্গলে বসবাস কবত। একদিন এক মাছ তাকে নদীব ধারে দেখতে পেয়ে বলল যে বিবাট বান আসছে। মাছের মুখ থেকে মহাপ্লাবনেব খবব শুনে ধোপা জঙ্গলেব কাঠ দিযে একটা বাক্স বানিয়ে বোনকে নিয়ে তাতে চডে বসল। সঙ্গে রইল একটা মোরগ। তারপর মহাপ্লাবন এল ; দুনিয়া ভেসে গেল। জলের ওপর ভাসতে লাগল শুধু ধোপার বাক্স।

মহাপ্লাবনের জল যখন সরলো তখন মহাপুরুব দূতকে পাঠালেন কেউ কোথাও বেঁচে আছে কি-না তার খবর নিতে। বাক্সের ভিতব থেকে মোরগের ডাক শুনে দূত ধোপা আর তার বোনের খোঁজ পেল। বাক্স খোলা হলে ওরা ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে, দূত মহাপুরুবের কাছে হাজির কবল ওদেব।

ভগবান ধোপার কাছে সব শুনে তাকে পূব, পশ্চিম আর উত্তর দিকে মুখ করিয়ে পরের-পর দাঁড করালেন আব শুধোলেন যে মেয়েটি তার কে হয়? ধোপা তিনবারই দিব্যি গেলে বলল যে, সে তার বোন। কিন্তু দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়ে জিজ্ঞেস করার সময় সে বলে ফেলল যে, মেয়েটি তার বউ। কাজেই মহাপুরুবের আদেশে ধোপা বাধ্য হল তার বোনকে বিয়ে করতে। কালে-দিনে এদের সাতটি ছেলে আর সাতটি মেয়ে হল। তারাও স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে লাগল বয়স হলে। এরপর যেসব ছেলেপুলে হল, তারাই হল আমাদের ভিল্‌জাতের লোক ॥

॥ চার ॥ আকাশ কেন উঁচু ॥

[বিরহড়দের মধ্যে প্রচলিত লোকপুরাণ]

আগে আকাশের নাম ছিল রিমিল। রিমিল এত নিচে ঝুলে থাকত যে সব সময়েই মানুষের মাথায় লাগত। এক বুড়ো একদিন হামানদিস্তে দিয়ে ধান কুটছিল। সেই সময়ে তার হাত ফস্‌কে লোহার ডাণ্ডাটা ছিট্‌কে গিয়ে লাগল আকাশের গায়ে, আর সেই বাড়ি খেয়ে রেগে আকাশ ওপরে উঠে গেল চড়্‌চড়িয়ে ॥

॥ পাঁচ ॥ তারা খসে যায় কেন ॥

[গাবোদের মধ্যে প্রচলিত লোকপুরাণ]

দোসাদিল্‌ মিন্‌গিতির্‌ ছিল সে-ই সেকালের সবচেয়ে জ্বল্‌জ্বলে তারা। পৃথিবীর ওপর আলো ফেলতে-ফেলতে হঠাৎ তার চোখে ভাল লেগে গেল এক মাটির ঢেলার রূপ। মিন্‌গিতির্‌ মাটিতে নেমে এসে বিয়ে করল সেই ইটা সুন্দরীকে। কিন্তু ইটা ত আর আকাশে যেতে পারে না স্বামীর ঘর করতে। তাই মাটির পৃথিবীর বউকে ফেলে রেখে আকাশের তারা ফের ফিরে গেল আকাশে। সেখানে সে নতুন করে ঘরসংসার পাতল বটে আরেক নক্ষত্র রূপবতীকে বিয়ে করে। কিন্তু তার মনে পড়ে সব সময়েই সেই ফেলে-আসা ইটা বউয়ের কথা। তারই টানে মাঝে-মাঝেই সে নেমে আসে আকাশ থেকে পৃথিবীতে। তখনই আমরা ভাবি যে তারা খসে গেল বুঝি একটা ॥

॥ ছয় ॥ হাসির জন্ম ॥

[মধ্যভারতের মান্দ্‌লা অঞ্চলের গোঁড়্‌ জাতির লোকপুরাণ]

আগে মানুষে হাসতে পারত না। তখন থাকত মাঙ্গিয়া বলে এক গান্দা। তার ছিল এক ছেলে, এক মেয়ে। মাঙ্গিয়ার বাড়ির উঠোনে ছিল একটা ফাঁপা বেলগাছ ; সেখানে থাকতেন হাস্‌নি মাঙ্গ বলে এক উপদেবী। এই মাঙ্গ একদিন মাঙ্গিয়ার মেয়েটার মুখ চেপে ধরলেন জোরে : সে বেচারীর তো মুখ ফুলে এই এত বড়! কত ওষুধ-বিষুধ দেওয়া হল এই রোগ সারাতে, কিন্তু সবই বৃথা!

এমন সময়ে মাঙ্গিয়া একরাত্রে স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নের মধ্যে সে শুনতে পেল : "দুগানীগড়ে ভীমজাতের এক লোক থাকে, স্বয়ং আসোয়ারী পাট তার ওপরে

ভর করেন। তাকে যদি আনতে পারো তো তোমার মেয়ের অসুখ সেরে যাবে।" মাঙ্গিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা হল ভীম জাতের সেই লোকের খোঁজে যেই-না মেয়েটার দিকে সোজাসুজি তাকিয়েছে অমনি তার ওপরে ভর করলেন আসোয়ারী পাট ঠাকুর। ভর করেই তিনি প্রণামী চাইলেন চাল আর মুরগীর ছানা। মাঙ্গিয়া সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যবস্থা করল। ঠাকুর হলেন খুশী, আর যেই-না খুশী হওয়া, অমনি কমতে লাগল মেয়ের ফোলা মুখ, আর হাসি আরম্ভ হল তার। আসোয়ারী পাট হাস্‌নি মাঈকে হুকুম দিলেন: "সব সময়ে এর রকম আনন্দে থাকবি।" এর পর থেকেই হাস্‌নি প্রেতিনী দুনিয়াশুদ্ধু লোককে হাসিয়ে বেড়ায়॥

['ভীম' নামে বাস্তবিক পক্ষে কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী সম্ভবত (?) নেই; তবে এখনকার মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলায় প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের 'গ্যালারী' যেখানে, সেই ভীমবেট্‌কা পাহাড় অঞ্চলে যে গোঁড্‌ গোষ্ঠী বাস করেন, তাঁহা নিজেদেরকে মহাভারতের ভীমের বংশধর ভাবেন।]

॥ সাত ॥ বিষের থলির ভাগ ॥

[বাংলা দেশের লোকপুরাণ ; ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত]

এক সময়ে ঢোঁড়া সাপেরও বিষ ছিল। আর সেই বিষের তেজ ছিল গোখ্‌রোর বিষের সমান জোরালো। একবার হল কি, দেবী মনসার হুকুমে সব সাপেরা যাচ্ছিল তাঁর কাছে। পেটুক ঢোঁড়াও ছিল সেই দলে যেতে-যেতে পথে পড়ল একটা ডোবা; সেখানে চুনো মাছের ঝাঁক কিল্‌বিলিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে পেটুক আর লোভ সামলাতে পারল না। বিষের থলি মুখ থেকে নামিয়ে রেখে ঢোঁড়া ইয়া বড় হাঁ করে লাফ মারল ডোবার জলে। পেট পুরে চুনো আর পুঁটি মাছ গিলতে লাগল ঢোঁড়া। এদিকে যে গোবরের গাদার ওপরে তার বিষের থলিটা নামিয়ে রাখা ছিল, তার চার পাশে এসে জুটল বিছে, ডেঁয়ো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, মশা, ছারপোকা, জোঁক, বোল্‌তা, ভীমরুল—এরা সবাই। ঢোঁড়ার ফেলে রাখা সব বিষটুকু এরা ভাগাভাগি করে নিয়ে পালাল। সেই থেকে ঢোঁড়ার আর বিষ নেই, বিষ আছে অন্য সাপেদের আর ঐ ডেঁয়ো, লাল্‌সে, মশা, ছারপোকা, জোঁক, বোল্‌তা, ভীমরুলদের॥

॥ আট ॥ ইয়েলাম্মা আর মাতঙ্গী ॥

[লৌকিক ঐতিহ্যজাত পুরাণবৃত্ত ; দ্রাবিড়ভাষী বলয়ে প্রচলিত]

ইয়েলাম্মা নামে যে দেবীর আমরা পূজো করি তাঁর অনেক নাম : কেউ বলে মূকাম্বা, কেউ জগদম্বা, কেউ বা দুর্গাভ্যা, কেউ আবার মারিকাম্বা। ইনি আসলে ছিলেন জমদগ্নির বউ রেণুকা। একবার নাকি মাথায় সাপের বিঁড়ে পাকিয়ে বালির কলসীতে করে জল আনবার সময় গন্ধর্বদের জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে দেখে তাঁর মনে একজন গন্ধর্বের সম্পর্কে কামনা সৃষ্টি হয়েছিল। একজনের বউ হওয়া সত্ত্বেও অন্যের সঙ্গে এই সহবাসাকাঙ্ক্ষার পাপে তাঁর কলসী ফেটে সব জল পড়ে গেলে, জমদগ্নি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নিজের বারো বছরের ছেলে পরশুরামকে আদেশ দিলেন মায়ের মাথা কেটে ফেলতে।

পরশুরাম কুড়ুল দিয়ে মায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করে বাপের কাছে ফিরে এলে জমদগ্নি খুশী হয়ে ছেলেকে বর দিতে চাইলেন। পরশু ফেরৎ চাইলেন মায়ের প্রাণ। জমদগ্নি ছেলেকে বললেন, সেটা সম্ভব হতে পারে যদি মাতঙ্গ জাতের কোন যুবতীর ঐ কুড়ুল দিয়েই মুণ্ডচ্ছেদ করে আনতে পারা যায়। তাই হল। জমদগ্নির বরে দুটি কাটা মুণ্ডুই ধড়ে জোড়া লাগল বটে, কিন্তু ধড় আর মুণ্ডু পাল্‌টা-পাল্‌টি হয়ে গেল রেণুকা আর মাতঙ্গীর মধ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে এই গণ্ডগোল ঘটে যাবায় পরে সমস্যা হল যে, নতুন করে জীবন ফিরে পাবার পর কার কি-পরিচয় হবে? দেবতারা তখন বললেন যে মাথাই যেহেতু শরীরের সেরা অংশ, তাই মাথা ধরেই হবে পরিচয়। সেই অনুযায়ী রেণুকার ধড় আর মাতঙ্গী যুবতীর মাথা জোড়া শরীর পরিচিত হল মাতঙ্গী হিশেবে; আর রেণুকার মাথা মাতঙ্গীর ধড় জোড়া শরীরের নাম হল ইয়েলাম্মা।

এইজন্যেই মাতঙ্গ জাতির লোকেরাও ইয়েলাম্মার পূজো করে; আর আমরাও ইয়েলাম্মার পূজোর আগে মাতঙ্গীর পূজো করি এখনো॥

॥ নয় ॥ গ্রহণের কারণ ॥

[গিল্‌গিট অঞ্চলের পার্বত্য আদিবাসীদের লোকপুরাণ]

চাঁদের যখন যুবতী বয়স তখন তাকে দেখে একদিন এক দৈত্য প্রায় আত্ম-হারা হল কামনায়। চাঁদকে বিয়ে করবার জন্যে প্রায় ক্ষেপে উঠল সে। ভয়ে চাঁদ

সেই জন্যে সব সময়ে পালিয়ে বেড়ায় আকাশের এদিক থেকে ওদিকে। কিন্তু এক-এক সময় দৈত্য তাকে ধরে ফেলে যখন, তখন তার কবলে পড়ে চাঁদ দারুণ-ভাবে ছটফট করতে থাকে। বাধ্য হয়ে দৈত্য তখন তাকে দেয় ছেড়ে। চাঁদকে যখন দৈত্য জড়িয়ে ধরে তখনই আমরা বলি গ্রহণ লেগেছে। ছেড়ে দিলে হয় গ্রহণমুক্তি।

সূর্যেব গ্রহণ যাকে আমরা বলি, তাব কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীতে সূর্যের অনেক আপনজন আছে--আমরা তাদের চিনিনা, এই যা। সেই বকম কোনো আপনজন যখন মারা যায় তখন সূর্যের মুখ দুঃখে কালো হয়ে ওঠে। মবা আপনজন আকাশে তারা হযে উঠে গেলে আবার তাব মুখ উজ্জল হয়ঃ তখনই গ্রহণ ছাড়ে সূর্যের ॥

॥ দশ ॥ প্রাণের উদ্ভব ॥

[বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই কাহিনী চবিত্রে লোকপুরাণেব উৎসজাত]

আদিতে আত্মন্ ছিলেন একা। এই একাকীত্বেব জন্য তিনি নৈঃসঙ্গ্যেব সুখহীনতা অনুভব কবলেন। দ্বিতীয় কারুর জন্য আকাঙ্ক্ষা কবলেন তিনি সেই হেতু। নিজেকেই তিনি দ্বি-ধা করে নারী ও পুরুষে পরিণতি দিলেন। তাঁরা হলেন স্বামী-স্ত্রী। দুজনে মিলিত হলেন বারংবার। এই ভাবে সৃষ্টি হল মানব জাতির।

আত্মনের নাবীসত্তা ভাবলেনঃ "আমাকে তিনি নিজেব ভিতব থেকেই সৃষ্টি কবেছেন কিন্তু আবাব আমার সঙ্গেই তিনি মিলিত হচ্ছেন কেমন ভাবে? তবে আমি আত্মগোপন করি।" তিনি গাভীর রূপ ধাবণ করলেন। আত্মনেব পুরুষ-সত্তা তখন গ্রহণ করলেন বৃষমূর্তি। সঙ্গত হলেন উভয়ে। সৃষ্টি হল গোজাতির। নারী-আত্মন্ হলেন অশ্বী, তাঁর নবসত্তা হলেন অশ্ব। তাঁবা ক্রমান্বয়ে মূর্তি ধরলেন গর্দভ-গর্দভীর, ছাগ-ছাগীর, মেষ-মেষীর। প্রতি অবস্থাতেই সঙ্গত হলেন আত্মনের দুই সত্তা। সৃষ্টি হল সমস্ত প্রাণীব, পিপীলিকার পর্যন্ত। তাঁদের ঐসব ঐশী সংযোজনার ফলেই বিশ্বচরাচরে প্রাণের সর্ববিধ উদ্ভব ঘটল ॥

॥ এক ॥ সৃষ্টি ও সভ্যতা ॥

[সুমেরীয় পুরাণবৃত্ত ; নিনেভ নগরীতে আসুর-বানিপালের মৃৎচক্রের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল ।]

আকাশ, ধরিত্রী তখন ছিল না। ছিল শুধু অনন্ত জলরাশি। আর ছিলেন আদি স্রষ্টা অপ্‌সু, ছিলেন মুম্মু আর ছিলেন মহাসর্পিণী তিয়ামত। তিয়ামতের পরে জন্ম নিল এই আকাশ আর পৃথিবী। তখন শুধু জল আর জল, কাদা নেই, মাটি ছিল না, জমি গড়ে ওঠেনি, মাথা তোলেনি দ্বীপভূমি। দেবতারাও অজাত তখনও। নদীর জল অপ্‌সু, সাগরের জল তিয়ামত আর মেঘ-কুয়াশা অন্ধকার মুম্মু। অপ্‌সু আর তিয়ামতের মিলনে জন্মাল দুই দেবতা : লাম্‌উ আর লাহাম্‌উ। তাদের মিলনে জন্মাল আর দুজন : আন্‌সার আর কিসার। আকাশদেব আনুউ হল এদের সন্তান, তার থেকে সঞ্জাত হল ধরিত্রী ইয়া। তাব আর দুটি নাম : এংকি আর নউদিম্‌অং।

এই দেবকুল তাঁদের আদি উৎসে যারা ছিল সেই অপ্‌সু, তিয়ামত আর মুম্মুকে হত্যা করতে চাইলেন—তাঁদের উদ্দামতার বেগে। ইয়া অপ্‌সুকে বিভ্রান্ত করে নিদ্রিত অবস্থায় তাকে হত্যা করলেন। মুম্মুকে তিনি করলেন বন্দী। মৃত অপ্‌সুর দেহের ওপরে তিনি নিজের আবাস গড়লেন। তিয়ামত তার পতিহত্যার প্রতিশোধ নিতে সৈন্যসজ্জা করলেন—ইয়ার পুত্র বিদ্যুৎজ্যোতিতুর্ল্য মাদু্র্ক তাঁর চার চোখে, চার কানে সমস্ত কিছু অনেক বেশি করে দেখতে পেয়ে যুদ্ধে নামলেন—তিয়ামতের কাছে পরাস্ত হয়েছেন ইয়া তার আগেই। দেব-সভার অনুরোধে মাদু্র্ক নেতৃত্ব দিলেন—ক্ষমতার দণ্ড, পরিচ্ছদ এবং আসন তাঁকে উৎসর্গ করলেন তাঁরা।

ঝড়ের দেবতা এন্‌লিল হলেন তাঁর অনুচর। রামধনুতে বিদ্যুতের তীর বসিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন মাদু্র্ক তিয়ামত মহাসর্পিণীর বিরুদ্ধে এক প্রবল ঝঞ্ঝার উন্মত্ততার মধ্যে। বাতাসের জালে তিনি বাঁধলেন তাকে—সাতটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় নিয়ে, বন্যার ভীম এক গদা নিয়ে মাদু্র্ক রথে চড়ে বিস্তৃত-বদনা তিয়ামতকে আক্রমণ করে তাঁর ব্যাদিত মুখের মধ্যে ঝড়ের অস্ত্র আর বজ্রের শস্ত্র দিয়ে করলেন সংখ্যাতীত আঘাত। বিদীর্ণ হলেন তিয়ামত : তাঁর শরীরের উপরটি হল

আকাশ। নিচের অর্ধ হল সাগরের জল। চর্মপেটিকার মত হল তাঁর চেহারা —অর্ধেক-শূন্য আকাশ, আর অর্ধেক-পূর্ণ সমুদ্রবারি।

বিশ্বে শৃঙ্খলা আনলেন মার্দুক। নক্ষত্র এবং গ্রহ সন্নিবেশ করলেন তিনি আকাশে। চন্দ্র সূর্যের অস্তোদয় বিধান করলেন। দিন গণনার পদ্ধতিও শেখালেন তিনি। দেবকুলের শ্রমবিমুক্তির জন্য মার্দুক সৃষ্টি করলেন মানুষ। তাদের দায়িত্ব হল পরিশ্রম এবং দেবতা-বন্দনা। একশ আর একশ আর একশ দেবতা হলেন স্বর্গ-প্রহরী—ভার ঠিক ততজনই পেলেন পার্থিব দায়িত্বগুলি পালন করছে কি-না মানুষ, তাই দেখার ভার। মার্দুক হলেন সর্বপ্রধান নায়ক। এমন কি আনুউও তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন ॥

॥ দুই ॥ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ॥

[হিব্রু লোকপুরাণ ; বাইবেলের 'বুক অব জেনেসিস'-এ সংকলিত]

ইডেন নামে স্বর্গের বাগানে ছিল দুটি গাছ : জীবনতরু আর জ্ঞানবৃক্ষ। সেই বাগানে থাকত আদম নামে ঈশ্বরের নিজের প্রতিরূপে সৃষ্ট প্রথম মানুষ। ঈশ্বর নিজেই বললেন : "এর একলা-থাকা উচিত নয়। আমি তাহলে এর জন্যে এক সঙ্গিনী সৃষ্টি কবি।"

আদমকে ঘুমে আচ্ছন্ন করলেন ঈশ্বর। ঘুমন্ত আদমের বুকের পাঁজর তুলে নিয়ে তিনি গড়লেন প্রথম নারীকে ; তার নাম ইভ। ঘুম ভাঙলে আদম দেখল তাকে। ঈশ্বর উভয়কে উভয়ের হাতে সমর্পণ করলেন। শুধু যেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল তারা কখনো না খায়, সে-ব্যাপারে তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন তাদের।

ইডেনের ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে ছিল সাপ। একদিন সে এসে প্রলুব্ধ করল ইভকে সেই নিষিদ্ধ-ফল পেড়ে খাবার জন্যে। ঈশ্বরের নিষেধের কথা বলল ইভ। সে বলল : "ঈশ্বর বলেছেন, ঐ ফল খাওয়ার অর্থ মৃত্যু।" সাপ আবার কুমন্ত্রণা দিল : "মৃত্যু নয়, ঐ ফল খেলে তোমরা ভালমন্দ বিবেচনা করতে শিখবে।" সাপ তাদের বোঝাল : "তোমরা জানবে জ্ঞান কাকে বলে। তোমরা দেবতা হয়ে উঠবে।"

প্রলুব্ধ ইভ ফল পাড়ল জ্ঞানবৃক্ষ থেকে। নিজে খেল, আদমকে খাওয়াল। তাদের জ্ঞান উন্মীলিত হল। নিজেদের নগ্নাবস্থা বুঝে তারা সঙ্কুচিত হল ; গাছের পাতা দিয়ে লজ্জার আবরণ করতে বুদ্ধি দেখা দিল তাদের মনে। ঈশ্বর

তাদের ডাকলেন : "আদম, তুমি কোথায়?" আদম বলল : "আমি লুকিয়ে আছি, আমি যে প্রভু নগ্ন।" ঈশ্বর বললেন : "তুমি যে নগ্ন তা তুমি কি করে বুঝলে?" আদম-ইভ স্বীকার করল নিষিদ্ধ-ফল খাওয়ার কথা। সাপের প্ররোচনা যে ছিল এর পিছনে তাও তাবা জানাল ঈশ্বরকে।

ক্রুদ্ধ ঈশ্বর অভিশাপ দিলেন তিনজন অপরাধীকেই। সাপকে বললেন : "সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তুমিই হবে সবচেয়ে অভিশপ্ত—বুকে-হেঁটে বাঁচতে হবে তোমায়।" ইভ তাঁর কাছে এই বলে অভিশপ্ত হল : "তুমি দুঃখে-যন্ত্রণায় গর্ভধাবণ করবে, সন্তানকে জন্ম দেবে বহু ক্লেশের মধ্যে। পুরুষ হবে তোমাব প্রভু।" আদমকে তিনি বললেন : "ভূমি অভিশপ্ত হবে তোমার কারণে। সেই ভূমি থেকে অতি কঠিন পরিশ্রমের পর তোমাব আব তোমার পরিবাবেব অন্ন জুটবে। আব সেই ভূমিতেই একদিন মিশে যাবে তুমি।"

সেই থেকে সাপ সবার কাছেই আতঙ্কের। সে বুকেই হাঁটে। নারীব গর্ভ এবং প্রসব কল্পনাতীত যন্ত্রণায় সারা হয। পুরুষ কঠিন শ্রমের মাধ্যমে অন্ন সংস্থান কবে। ইডেন থেকে তারা পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছে সেই আদি পিতামাতা আদম-ইভেব সময়কালেই॥

[জ্ঞানবৃক্ষেব ফল খাওয়া, যৌনচেতনার উন্মেষ হওয়াব প্রতীক; সাপও তাইই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল বাইবেলীয় ঐতিহ্য-অনুসারে হল আপেল, যা নিজেও আবার যৌন প্রতীক রূপে স্বীকৃত।]

॥ তিন ॥ গাছেদের রাজা ॥

[প্যালেষ্টাইনীয়-লেবাননীয় লোকপুরাণ]

বহু-বহুকাল আগে গাছেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে বাজা হিশেবে ঠিক করতে চাইল। প্রথমে তারা ধরে পড়ল জলপাই গাছকে। জলপাই সব শুনে তাদের বলল : "কি জন্যে বাপুরা আমার এই ভারী-সারী চেহারাটাকে রোগা করব? এই ভারী শরীরটার জন্যেই ত দেবতাদের আর মানুষদের সমাজে আমার এত খাতির। সে সব ছেড়ে শুধু গাছেদের রাজা হওয়ায় আমাব দরকার কি?"

তখন সবাই গেল ডুমুর গাছের কাছে। ডুমুরও রাজি হল না। সে বলল :

"শুধু গাছেদের সর্দারী করার জন্যেই কি আমি আমার এত ভাল, মিঠে ফল-গুলোকে বরবাদ করে দিতে পারি ?"

ডুমুরের কাছেও হতাশ হয়ে গাছেরা তখন গেল আঙুরলতার কাছে। আঙুরও তাদের ফেরাল, বলল : "আমার যে-ফলের সুখ্যাতিতে মানুষ থেকে দেব্‌তা অব্‌দি সবাই পঞ্চমুখ, তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি খামোকা শুধু গাছেদের রাজা হতে যাব কিসের জন্যে ?"

কাঁটাজাম গাছের কাছে গেল আর সব গাছ তখন। ওদের আর্জি শুনে সে বলল : "সত্যি-সত্যিই বাপু যদি আমাকে তোমাদের রাজা বলে মানতে চাপ, তাহলে আমার ছায়ার তলায় তোমাদের সমস্ত বিশ্বাস উজাড় করে দাও। তা যদি করতে পার, তবেই আমার ভেতরের আগুন বাইরে আসবে, আর লেবাননের সমস্ত দেবদারু গাছকে সেই আগুন গ্রাস করবে। তোমাদের বিশ্বাস উজাড় কর, আমার আগুন প্রকাশিত হোক, লেবাননের দেবদারুরা তাতে পুড়ে খাক্ হোক ॥

॥ চার ॥ কিওমার্জের বংশ ॥

[পারসীয় লোকপুরাণ]

কিওমার্জ পরতেন জীবজন্তুর চামড়া, খেতেন শিকার-করা পশুর কাঁচা মাংস আর ফলমূল আর নদীর জল, থাকতেন সদলবলে পাহাড়ে। কিন্তু সর্দার কিওমার্জ ছিলেন ন্যায়বান্। তাঁর অনুচরদের ভালমন্দ বিচার করে চলতে হত সব সময়েই সেই কারণে।

কিওমার্জ আর অন্যান্য দলের সর্দার-রাজারা সকলেই ছিলেন অহুর-উপাসক। দেবরা ছিলেন তাঁদের শত্রু। আবার অহুর-উপাসক এই রাজাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল নানান্ দ্বন্দ্ব। এই রকম একজন জ্ঞাতি রাজা আক্রোশের বশে হত্যা করেছিলেন কিওমার্জের ছেলে সালামুককে।

সালামুকের ছিল একটিই মাত্র ছেলে, হুসেঙ্। হুসেঙ তার ঠাকুর্দার পুত্রশোক ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল নিজের বীরত্বে এবং প্রতিভায়। তার অনুচর ছিল শুধু মানুষ নয়, বনের হিংস্র প্রাণীরাও। দেবদের বিরুদ্ধে যখন হুসেঙ যুদ্ধ করতে যেত তখন তার সঙ্গে-সঙ্গে বাঘ, নেকড়ে, সাপ এরাও যেত। তীর-ধনুক, বল্লমধারী অনুচরদের সঙ্গে এরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে খতম করত দেবদের।

হুসেঙই নাকি প্রথম আগুন আবিষ্কার করে। শোনা যায় তার বাবার মৃত্যুর বদ্‌লা নিতে সে নাকি দূর থেকে ইয়া বড় এক পাথরের চাঙড় ছুঁড়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই জ্ঞাতি দানব সর্দারকে খতম করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাথরটা ফস্‌কে গিয়ে পাহাড়ের ওপর পড়ে প্রচণ্ড জোরে। ব্যস, ঐ ঘষ্‌টানিতে আগুনের ফুল্‌কি উঠল জ্বলে। সেই আগুনে বন-জঙ্গল দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল, সৃষ্টি হল দাবানলের। দাবানল পুড়িয়ে মারল তার পিতৃঘাতককে।

তখন হুসেঙ তার অনুচরদের ডেকে বিধান দিল: "এখন থেকে আমরা সকলে আগুন অহুরের পুজো করব। এই আমার হুকুম, যে না মানবে সে যেন দেবদের কাছে চলে যায়।" খুশী হয়ে অহুর মজ্‌দা হুসেঙের গুষ্টিকে তখন শেখালেন কেমন করে মাংস পুড়িয়ে বা সেঁকে খেতে হয়। হুসেঙের দলবল ত খুব খুশী এই নতুন খাবার খেয়ে। আরও বেশী ভক্তি করে তারা অহুর মজ্‌দার পুজো করতে শুরু করল। অহুরও তাদের ভক্তি দেখে খুশী হলেন: তিনি তাদের শেখালেন চাষবাস করে কেমন করে ফসল ফলাতে হয়। কেমন করে শহর গড়ে থাকতে হয়। লোহা আর অন্য সব ধাতুর কাজকর্ম কেমন করে করতে হয়, তাও তারা শিখল অহুরের দয়ায়।

হুসেঙ যখন মারা গেল তখন কিওমার্জের বংশে সর্দার হবার মতো ছিল এক-জনই; সে হল হুসেঙের বড ছেলে তাহুমার্জ। সেও ছিল বাপ্‌কা বেটা। হুসেঙ যেমন সব প্রথমে আগুন জ্বালাতে চাষ করাত, লোহা ঢালাই করতে শেখে নিজের যোগ্যতায় আর অহুরের কৃপায়, ঠিক তেমনই তার ছেলেও প্রথম শেখে পশমের জামা বানাতে আর কার্পেট বুনতে। বীর সেও কম ছিল না। দেবদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের কাছ থেকে সে আদায় করল সেই ক্ষমতা, যা দিয়ে আমরা লিখতে পড়তে শিখি। অহুরের বরে সেই লেখা পড়ার ধারা এখনও চলছে ভালভাবে।।

[প্রাচীন ইন্দো-ইরাণীর আর্যভাষীদের দুই শাখার একটি এসেছিল ভারতে, অন্যটি গিয়েছিল পারস্যে। এরা পরস্পরের শত্রু ছিল। 'ভারতীয়' দল ছিল দেব-উপাসক, অসুর-বিদ্বেষী, 'পারসীয়' দল ঠিক তার বিপরীত; দেবরা তাদের ঘৃণ্য, অহুর [অসুর] তাদের উপাস্য।]

।। পাঁচ ।। নানান্ জাতের সৃষ্টি ।।

[তিব্বতীয় লোকপুরাণ ; বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত]

সৃষ্টির আদিতে একটিই মাত্র মানুষ এই পৃথিবীতে ছিল। ঘরবাড়ি বলতে কিছু ছিল না তার, কেন না তখন শীতও ছিল না, গ্রীষ্মও ছিল না। বাতাসও বইত না জোরে। বৃষ্টি কিংবা বরফ পড়ত না। পাহাড়ের ঢালে আপনা-আপনিই চা জন্মাত। কোনো শিকারী জন্তুর ভয় ছিল না গোরু আর চমরীগুলোর।

লোকটার ছিল তিন ছেলে। ওরা সবাই খেত দুধ আর ফলমূল। তারপর অনেক বয়সে লোকটা একদিন গেল মরে। তখন ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করতে বসল যে বাপের মৃতদেহটা নিয়ে কি করা যায়। ওরা একমত হল না।

এক ছেলে চাইল মাটিতে পুঁতে ফেলতে ; আর একজন বলল যে পুড়িয়ে ফেলা হোক ; অন্য জনের ইচ্ছে, পাহাড়ের চূড়োয় ফেলে রাখা। অবশেষে ঠিক হল যে মৃত দেহটা তিন ভাগে ভাগ হবে। বড় ভাই পেল মাথা আর হাত দুটো ; ইনিই ছিলেন চীনা জাতির আদিপুরুষ। সেই জন্যেই তারা শিল্প-চর্চায় এত গুণী আর এমন চালাক চতুর।

মেজ ছেলে পেল বাপের বুকটা। ইনি ছিলেন তিব্বতীদের আদি পুরুষ। এই জন্যেই এরা হৃদয়বান্ এবং সাহসী ; মরতেও এরা ভয় পায় না। আর ছোট ছেলের ভাগে পড়ল দেহের হাবিজাবি অংশগুলো। তাই তার বংশধরেরা সরল আর ভীরু ; বোকা আর নিষ্ঠুরও বটে। নিজেদের মধ্যেই এরা বন্দী হয়ে থাকে। এদেরকেই আমরা তাতার বলি এখন।

।। ছয় ।। পুরাকালের গল্প ।।

[চৈনিক লোকপুরাণ ; 'শী-কিং' গ্রন্থে সংকলিত]

সৃষ্টির আগে জন্ম নিয়েছিলেন পোয়ান-কু। আদিম বিশ্বকে তিনিই শৃঙ্খলায় বেঁধেছিলেন আঠার হাজার শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল আর বর্ষাকাল আর বসন্ত-কাল ধরে। অনন্ত মহাকাশের অসীম শূন্যে বিরাট পাথরের স্তূপ ভেসে বেড়াত। পোয়ান-কুর মতো তারাও নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছিল। সেই পাথর-গুলিকে ছেনি দিয়ে কেটে-কেটে তিনি তৈরী করেছিলেন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা

আর পৃথিবী। তাঁর সহকারী ছিল ড্রাগন, কচ্ছপ আর মানুষমুখী ফিনিক্স পাখি। তারাও সৃষ্টি করেছিল নিজেরা নিজেদেরকে।

প্রতিদিন পোয়ান-কু কাজ করেন আর তাঁর শরীর বেড়ে ওঠে চার হাত করে। আঠার হাজার বছর পরে যখন মহাবিশ্বচরাচর সৃষ্টি করা শেষ হল তখন তাঁর মাথা হল পাহাড়ের চূড়া, নিঃশ্বাস হল বাতাস আর মেঘ, গলার স্বর হল বজ্রধ্বনি। তাঁর হাত, পা, চুল, রক্ত, মাংস, দাড়ি, গোঁফ, দাঁত—এরা কেউ হল নদী, কেউ জঙ্গল, কেউ পাহাড়, কেউ বা মাটি, কেউ আবার হল হীরে-মুক্তো। তাঁর ঝরে-পড়া ঘামই হল বৃষ্টি আর গায়ের পোকা-মাকড়গুলোই হয়ে গেল মানুষ।

পোয়ান-কুর পরে এলেন একের পর এক তিয়েন-হুয়াং, তি-হুয়াং আর জেন-হুয়াং রাজারা। এঁরা তিনটি বংশ—স্বর্গীয়, পার্থিব আর মানবীয়—পরম্পরায় তিন-আঠারং চুয়ান্ন হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তিয়েন-হুয়াংরা ছিলেন ভীষণ চেহারার মহাসর্পের মতো দেখতে। তি-হুয়াংদের দেহ ছিল ড্রাগন, ঘোড়া, সাপ আর মানুষের বিভিন্ন অংশ মিশিয়ে তৈরী। তাঁদের সময়েই দিন আর রাত আলাদা হয়ে যায়। খাওয়া, ঘুমোনো এই সব তাঁরাই পত্তন করে-ছিলেন। জেন-হুয়াংদের মুখ ছিল মানুষের, শরীর ড্রাগনের। পৃথিবীকে নানা দেশে ভাগ করে নিয়ে শাসন করেছিলেন তাঁরাই প্রথম।

এই তিন মহাযুগের পর আরও দশটি যুগ এসেছে। কুন্ নামে যে শাসক ছিলেন তাঁর সময় পর্যন্ত মানুষ থাকত মাটির তলার গর্তে, কিংবা পাহাড়ের গুহায়, কি গাছের ডালে। কুনের ছেলে ইউ চাও প্রথম শেখালেন বাড়ি তৈরী করে কেমন থাকতে হয়। কুন বিজ্ঞ কচ্ছপ আর ড্রাগনের সঙ্গে যুক্তি করে হোয়াং-হোর বান ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন অনেক-অনেকবার, কিন্তু সে ব্যাপারে কাজের কাজ করতে পারলেন ইউ-চাওই। কুন বাঁধ বেঁধেছিলেন কিন্তু তাতে জল বাঁধেনি। তিয়েন বা স্বর্গবাসীরা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। তিন বছর তাঁর মৃতদেহ পড়েছিল জলের মধ্যে না-পচে। সেই দেহ থেকেই জন্মেছিলেন ইউ-চাও। দৈত্য আর প্রেত-প্রেতিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শিশু ইউ-চাও তাদের হটিয়ে দিয়ে গড়লেন বিশাল-বিশাল মাটির পাহাড়। খাল কেটে-কেটে নদীর জলকে নানা দিকে বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আট বছর পরে তিনি বন্যাকে শান্ত করলেন।

সুই-জেন্ শিখিয়েছিলেন কাঠে কাঠ ঘষে আগুন বের করতে। রান্না এবং নাচ গানও নাকি তাঁরই আবিষ্কার। রঙিন সুতোয় গিঁট বেঁধে কথা বোঝানোও তাঁরই আমলে শুরু। আর তাঁর পরে এলেন ফু-সি। ফু-সির শরীরের ওপরটা ছিল মানুষের মতন, শরীরের বাকিটা ড্রাগনের মতো ছিল। তাঁব মন্ত্রণাদাতাও ছিলেন ছ-জন ড্রাগন। ফু-সি শিখিয়েছিলেন ছবির হরফ, দিন-তিথির হিশেব আর তৈরী করেছিলেন পঁয়ত্রিশ তারের বাজনা। ঘোড়া আর কুকুর আর ষাঁড় একদিকে,আর অন্যদিকে ভেড়া, শুওর আর মুরগী পোষাও নাকি ফু-সির আমলেই শুরু হয়। মাছ ধরার জালও শোনা যায় তাঁরই হাতে প্রথম বোনা। ফু-সির সবচেয়ে বড কাজ হল ঠিকমত বিয়ে-সাদীর পত্তন কবা—আগের মতো যাব সঙ্গে যে যতদিন খুশি থাকতে কিংবা না-থাকতে আর পারল না তাঁর আমল থেকে। ফু-সিই প্রথম ঈশ্বরের কথা শোনান আমাদেব বুড়ো কর্তাদেরকে। নিয়তি, ভাগ্য এই সব নিয়েও তিনিই সব আগে ভেবেছিলেন।

ফু-সির পব এসেছিলেন সেন-নুং; তার আবাব মাথাটা ছিল ষাঁড়ের, শরীব মানুষের। সেন-নুং নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ছিলেন স্বর্গের দেবতাদের আশীর্বাদ পাওয়া এক কৃষক। মানে, চাষবাস তিনিই করেছিলেন শুরু। নানা রকমেব ব্যামো সারানোর জন্যে গাছ-গাছড়ার ওষুধও তিনিই সব প্রথম চিনিয়েছিলেন। মানুষে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করল ঐ সময়েই। তার পবেব গল্প ত সবারই জানা॥

॥ সাত ॥ জরার কারণ ॥

[চৈনিক লোকপুরাণ ; তাওবাদী ধর্মসাহিত্যে সংকলিত]

একেবারে শুরুতে দুটিমাত্র সমুদ্র ছিল—দক্ষিণে একটি আর অন্যটি উত্তরে। মাঝখানে ছিল ডাঙা জমি। দক্ষিণ সুমুদ্দুরের রাজা ছিলেন অমনোযোগী সু, উত্তর সাগর শাসন করতেন হঠকারী হু, আর ডাঙাজমিব এলাকাটা ছিল বিশৃঙ্খল হুওন-তুন এর।

সু আর হুর অভ্যেস ছিল মাঝখানের ডাঙা জমিতে প্রায়ই বেড়াতে যাবার। সেখানেই তাঁদের দুজনের চেনা পরিচয় হয়। মাঝের ডাঙার রাজা হুওন-তুন তাঁদের খুব খাতির-যত্ন করতেন। এই জন্যে সু আর হু চাইলেন তাঁদের

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিশেবে তাঁকে কিছু একটা দিতে। এই নিয়ে দুজনে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

এদিকে হুওন-তুন ছিলেন বোবা, কালা আর অন্ধ। তাঁর নাক বা মুখও ছিল না। তবে তিনি যেমন দেখতেন না, শুনতেন না, কথা বলতেন না, তেমনিই খেতেনও না, নিঃশ্বাসও নিতেন না। তাই হুওন-তুনের রাজ্যে গিয়ে হু আর সু রোজ একটি করে বন্ধ রন্ধ্র খুলে দিতে লাগলেন। দুই কান, দুই চোখ, নাকের দুই ফুটো আর মুখ—মোট সাত দিন লাগল এগুলো খুলে দিতে; তখন হু আর সুর কাজ শেষ হল। হুওন-তুন তখন দেখতে, শুনতে, কথা বলতে খেতে আর নিঃশ্বাস নিতে পারলেন যেই, অমনি তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন। তিনি মারা গেলেন ॥

॥ আট ॥ স্বর্গ-মর্ত্য ॥

['নিহোন-গি' নামে প্রাচীন জাপানী বইয়ে সংকলিত এই পুরাবৃত্ত লোকপুরাণ থেকেই গড়ে উঠেছে]

আদিতে যখন স্বর্গ এবং মর্ত্য একই সঙ্গে ছিল, ইন এবং ইও তখন আলাদা হয়নি। ডিমের ভিতরের অংশে যেমন অবয়বহীন খানিকটা জিনিষ থাকে, তারাও ছিল সেই রকম। তারা অজানা সীমানার মধ্যের উদ্ভিদ্ আর প্রাণী-দের যে-সব জিনিষ দিয়ে গড়া হত তাদের সব চেয়ে আগের রূপটাকে ধরে রাখত। কিছুটা অংশ পরিষ্কার আর পবিত্র হয়ে-হয়ে ধীরে-ধীরে আলাদা হয়ে গেল। সেটা হল স্বর্গ। ভারী এবং খারাপ অংশটা যা পড়ে রইল, তাই হল পৃথিবী। জমাট বেঁধে গেল সে-সব। কিন্তু স্বর্গ যত সহজে গড়ে-উঠেছিল, পৃথিবীর গড়ে-ওঠাটা তত সহজ হল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বর্গের সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমে, তারপরে হয়েছিল পৃথিবী। তারও পরে দুয়ের মাঝে দিব্য-প্রাণের সৃষ্টি হল ॥

॥ নয় ॥ দেবতাদের জন্ম কথা ॥

[জাপানী লোকপুরাণ]

জগতের প্রথম মা হলেন কোজিকি। প্রথমে আগুনের জন্ম দিলেন তিনি। সেই আগুনে তিনি নিজেই পুড়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে গেলেন ভীষণ

রকম। নানা রকম শারীরিক বিকার দেখা দিল তাঁর: উদ্‌গীরিত-বমন থেকে তৈরী হলেন ধাতুর দেবতারা, পরিত্যক্ত-পুরীষ থেকে সৃষ্টি হল কাদামাটির দেবদেবীদের আর ক্ষরিত-দেহ-জলে জন্মালেন জলদেবীরা। এই সময়েই তিনি স্বাভাবিক ভাবে জন্ম দিলেন ফসলের দেবীকে। খাবারের দেবী আবার হলেন এঁর মেয়ে। এই ভাবে দেবদেবীকে সৃষ্টি করে জগতের প্রথম মা কোজিকি অবশেষে দেহরক্ষা করলেন।

এদিকে আগুনের দেবতা বিয়ে করলেন তাঁর বোন কাদামাটির দেবীকে। অনেকে বলে শস্যের দেবী তাঁদের বোন নয়, মেয়ে। শস্যদেবীর মাথা থেকে জন্মেছিল গুটিপোকা আর তুঁতগাছ। আর তাঁর নাভিমূলের নিচে থেকে জন্মেছিল পাঁচ ধরণের ফসলের গাছ। 'সেই সব গাছের ফসল আমরা এখনো নিয়মিত খাই॥

॥ এক ॥ দেবতাদের ঘরকন্না ॥

[নাইজেরিয়ার ওরুবা জাতির লোকপুরাণ]

এক আছেন মহাশক্তিধব ওলোরুন। তিনি আরো অনেক নামে পরিচিত। কেউ বলে এলেদা। কারুর কথায় তাঁর নাম ওগা-ওগো। কেউ আবার তাঁকে ওলোতুমায়ে বলে। স্বর্গের প্রভুরূপে তিনি ওলোরুনই হোন, আর এলেদা হিশেবে তিনি সৃষ্টিকর্তারূপে পুজোই পান, ওগা-ওগো নামে তাঁর মহিমাই ঘোষণা কবা হোক আর তিনি ওলোতুমায়ে বা নিজের স্রষ্টাই হোন, তিনি কিন্তু থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আমাদের নাগালের মধ্যে যাঁরা থাকেন, সেই দেবতাদের আমরা বলি ওরিশ্‌আ। এঁরা যে সংখ্যায় কতজন, তা ঠিক করে বলা মুস্‌কিল। দুশো একজনও হতে পারেন, আবার তার থেকে দুশো জন বেশিও হতে পারেন। অনেকে ত বলে এঁরা হলেন গুণতিতে শ-ছয়েক। বোধহয় ওলোরুনই এঁদের সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এমনও শোনা যায় যে, আগে এঁরা ছিলেন মানুষ পরে দেবতা হয়ে গেছেন।

সে যাই হোক, ওলোরুন প্রকৃতি দেবী কালোবরণী ওদুদুয়ার স্বামী হিশেবে সৃষ্টি করলেন সব আগে আলো-রং ওবাৎআলাকে। তিনি হলেন পবিত্র। তাঁর স্ত্রী ওদুদুয়া হলেন অপবিত্রা। এঁদের বিয়ের পরে দুটি ছেলেমেয়ে হয় আগাঞ্জু আর ইয়েম্‌আজা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদুদুয়া স্বামী-সন্তানদের ছেড়ে শিকারী এক দেবতার সঙ্গে রোজ ঘুমোতে লাগলেন। আকাশ-দেবতা ওবাৎআলা বা সূর্য সেই থেকে একা থাকেন।

আগাঞ্জু আর ইয়েম্‌আজা দুজনে দুজনকে বিয়ে করল। এদেরও দুই ছেলেমেয়ে ওবালোফুন আর ইয়ার মধ্যে বিয়ে হয়। এদের আরও এক ভাই ছিল ওরুনগান। সে ছিল খুব দুষ্ট স্বভাবের। নিজের গর্ভধারিণী ইয়েম্‌আজাকেও সে মেরে ফেলেছিল।

ইয়েম্‌আজার শরীরের রক্ত-মাংস-চর্বি এইসব থেকে সৃষ্টি হল পনেরজন দেবদেবীর। তাঁদের মধ্যে শান্‌গো হলেন বজ্রদেব। মেঘের ভেতরে তাঁর পেতলে তৈরী বিরাট প্রাসাদ। সেখানে থাকে তাঁর সমস্ত জাত-কুটুমেরা আর

থাকে অগুণ্‌তি ঘোড়া। একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে তিনি ঘোড়ায় করে ঘোরেন। ইয়েম্‌আজ্জার মৃতদেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তিন দেবীর। এঁরাই হলেন শান্‌গোর তিন বউ। এঁরা তিনজনেই নদীর দেবী। নাইজার নদীর দেবী ওইয়া হলেন শান্‌গোর পাটরাণী।

শান্‌গোর কাজ হল পাপীদের শাস্তি দেওয়া। দু-মুখো কুড়ুল হাতে তিনি ঘোরেন। তাঁর অনুচর ওশুম্‌আরে রামধনুর মূর্তি ধরে পৃথিবী থেকে জল শুষে নিয়ে শান্‌গোব মেঘমহলের পেতল-বাড়িতে ঢেলে দেয়। শান্‌গোর দু-মুখো কুড়ুলকে লোকে বলে, বিজুলী। পাপীর শাস্তি দেবার জন্যে তিনি তাই দিয়ে আগুন-পাথর ভেঙে মাটিতে ছোঁড়েন—বনজঙ্গল পুড়ে খাক্ হয়, গাছপালা ভেঙে-চুরে যায়, যার গায়ে লাগে তারই মরণ ঘটে। অবশ্য পাপ না-করলে শান্‌গোর আগুন-পাথর গায়ে লাগেনা কারুর।

ইয়েম্‌আজ্জার মরা-শরীর থেকে আর যে সব দেবতার সৃষ্টি হয় তাঁদের মধ্যে অনেকের পুজো পান ওগুন, ওরিশাকো, শোপোনো, ওলোকুন, ইফ্‌আ আর আরোনি—কেননা এঁরাই আমাদের প্রত্যেকদিনের সঙ্গে মিলে-জুলে আছেন। লোহার দেবতা, যুদ্ধের দেবতা, আর শিকারের দেবতা এক সঙ্গে এই তিন হলেন ওগুন। ওরিশাকো দেখেন আমাদের চাষবাস; তাই মেয়েরাই তাঁর পুজো করে বেশির ভাগ। গায়ে গুটিদানা উঠে যে রোগ হয় শোপোনো তার সামাল দেন। আবার তাঁর রাগ হলেই ঐ নাম-করতে-নেই রোগটা ফুটে ওঠে আমাদের গায়ে। সুমুদ্দুরের দেব্‌তা হচ্ছেন ওলোকুন। পরে কি-ঘটবে-না-ঘটবে সে-ব্যাপার যিনি বলান আমাদের কারুর মুখ দিয়ে, তিনি ইফ্‌আ। আর আরোনি আমাদের বনজঙ্গলের দেখা-শোনা করাব জন্যে আছেন।

এই সব দেবতাদেরই আমরা পুজো করি। আর করি বুড়ো-কর্তাদের মারা যাবার পর তাঁদের ভূতেদেরও। আরও একজন আছেন। তিনি হলেন ওলোরুন ঠাকুরের পার্ন্টি; তাঁর নাম এশ্‌উ। অন্ধকারে থাকেন তিনি আর মানুষকে দিয়ে পাপ করান। তাঁকেও তাই তুষ্টু রাখতে হয় বৈ কি! নইলে তিনি আমাদের দিয়ে পাপ করাবেন আর শান্‌গোর হাতে আমাদের শাস্তি পেতে হবে। পাপ না-করলে অবশ্য মরার পর ওলোরুনের কাছেই যাই আমরা সবাই॥

॥ দুই ॥ চিতাবাঘের বংশ ॥

[পশ্চিম আফ্রিকার চিতাবাঘ টোটেম-গোষ্ঠীর আদিবাসীদের লোকপুরাণ]

অনেক, অনেক পুরোনো দিনের কথা। তীরের ফলা তৈরী করতে হলে আমরা যে মাটির তলার কালো পাথর লাগাই, তাও তখন ঢেলে-পিটিয়ে কাজে লাগাতে জানা ছিল না কারুর, সে এত পুরোনো দিনের ব্যাপার। আকাশের দেবতা মাঝে-মাঝে আগুন জালিয়ে পৃথিবীতে এক রকমের যে পাথর ছুঁড়ে দেয়, তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষে তৈরী করত অস্তর-শস্তর, কুড়ুল এইসব। তেমনি এক সময়ে আমাদের বুড়ো ঠাকুর্দার বুড়ো ঠাকুর্দা কিংবা তারও কোনো বুড়ো কত্তাবাবা জঙ্গলে গিয়েছিল মধুর খোঁজে। খুব ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

ঠিক তখনই পাশের এক গর্ত থেকে বেরিযে আসে কালো মাম্বা একটা, বাচ্চা-সমেত। আমাদের সেই বুড়ো কত্তাবাবাকে যেই সে ছোবল মারতে যাবে অমনি কোথা থেকে একটা চিতাবাঘ এসে থাবায় তার লেজ ধরে টেনে সরিয়ে দিল। কত্তাবাবা এসব কিছুই জানতে পাবেনি কিন্তু। যেই তার ঘুম ভেঙেছে অমনি সে-না লাফিয়ে উঠে তার সেই আগুন-পাথরের কুড়ুল দিয়ে মারতে গেল চিতাটাকে। চিতা তখন বলে উঠল : "বাবাকে তার ছেলে কখনো খতম করে না। তুই হলি আমাদের বংশেরই। বাড়ি চলে যা, কোনো দিন আর নিজে তুই বা তোর বংশের কেউ যেন চিতাবাঘের দিকে অস্তর তাগ্ না করিস। যত চিতাবাঘ আছে তারা সবাই তোর গুষ্ঠির লোক। তোকে মানতে হবে তাদেরকে। তুই, তোর ছেলে, নাতি, পুতি—তার পরে আর যারা জন্মাবে তোদের বংশে—সকলের জন্যেই এই নিয়ম চলবে বরাবর। এই বংশের নাড়ির টান, রক্তের বাঁধন শক্ত হয়ে থাকবে। ঐ রক্তের সম্বন্ধে গুষ্ঠি বাড়বে শুধু মায়েদের থেকে, যারা আসবে অন্য গুষ্ঠি থেকে বউ হয়ে তোর বংশে। এর পরে যত মেয়ে-পুরুষ জন্মাবে এই বংশে সবাই হবে ভাইবোন।"

"এই জ্ঞাতিগুষ্ঠিদের মধ্যে একটা সম্পর্কের নিয়ম মানতে হবে—এক বংশে জন্মেছে এমন ছেলে-মেয়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক হতে পারবে না, তা তুই জানিস। এক গুষ্ঠির মেয়ে-পুরুষ এক নাড়ির দেখতে-না-পাওয়া সুতোয় নাই-কুণ্ডলীতে বাঁধা থাকে বলে তারা একসঙ্গে ঘুমোতে পারে না। চিতাবাঘের

বংশকেও এই আইন মানতে হবে। যদি সে বংশেব দুজন মেযে-পুরুষেব একজন আসে সূর্য ওঠে যে দেশে, সেখান থেকে, আব অন্যজন আসে সূর্য পড়ে যাওয়ার দেশ থেকে — তাহলেও তাদেরকে এই আইন মেনে চলতে হবেই। কাবণ অত-অতদূবে থাকলেও তাবা হবে ভাই আব বোন।"

বাঘ আবও বলল: "এই আইন যাবা মেনে চলবে, তাবা মবাব পব চিতাবাঘ হবে। তাদেব চেনা বনজঙ্গল, যেখানে তাবা মানুষ-থাকা অবস্থায় শিকার-পাতি কবেছে, সেখানেই ঘুববে-ফিরবে তাবা বাঘ হযে। চেনা জলাতেই জল খেযে তেষ্টা মেটাবে। তাদের আত্মা ঘুবে বেড়াবে মবে-যাওযাদের দেশে। কেউ আব তাদেব দেখতে পাবে না। ঐ বাঘেদেব উত্যক্ত না যদি করে কেউ, তাবাও এড়িযে চলে যায, যাবেও। অন্য গুষ্টির কেউ যদি আমাদের দিকে অস্তব তাগ্ কবে তাহলে তাদেব আটকাবি। আমবা ঘায়েল হলে সেবা আত্তি করিস। মাবা যাবাব পব কবব দিস আমাদেব শবীবটাকে। অকালে কেউ মরলে যেমন শোক কবিস, আমাদেব জন্যেও তেমনি হা-হুতাশ কববি কিন্তু। নিজেব গুষ্টিব কাবোব বক্ত ঝবাবি না।"

চিতাবাঘ আব বলেছিল আমাদেব সেই আদ্যিকালেব বুড়ো কত্তাবাবাকে: "এই সব নিযম যদি না-মেনে চলিস তাহলে তাব শাস্তি পাবি তোবা। আকাশ থেকে জল পড়া থেমে যাবে। ফসলেব মাঠে সব যাবে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে। শিকাব পালাবে তাগ্ ফসকে। বৌবা পেটে ছেলে ধববে না, বংশ লোপ হবে।" সেই থেকে এই স-ব কথা আমবা মেনে চলি ॥

॥ তিন ॥ আগুন এল কেমন করে ॥

[আফ্রিকাব দক্ষিণ কঙ্গো অঞ্চলেব কাসাই নদীব ধারে বসবাসকাবী ব'কুবা বা বুশোঙ্গো জাতিব লোকপুবাণ]

পুবাকালে আমবা আগুন জ্বালতে জানতাম না। আকাশ থেকে বাজ পড়ে যদি আগুন জ্বলে উঠত, তবেই মানুষ পেত আগুন। এইভাবে সময় যেতে-যেতে যখন মুচু মুশাঙ্গাব বাজত্ব শুরু হল তখন মানুষ নিজে শিখল আগুন জ্বালতে।

কেবিকেবি বলে একজন লোক ছিল সে-ই প্রথম আগুন জ্বালতে শেখে। একদিন ভগবান বুম্বা তাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। তিনি আদেশ কবলেন

কেরিকেরি যেন একটা বিশেষ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে একটা বিশেষ গাছের ডালপালা ভেঙে নিয়ে এসে সাবধানে রাখে সেগুলো। ঘুম থেকে উঠে কেরিকেরি তাকে যা-যা আদেশ দিয়েছিলেন বুম্‌বা, তা-ই—তা-ই পালন করল। ঐ ডালগুলো ছিল খুব শুকনো। বুম্‌বা আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন পরের রাতে। কেরিকেরি যে তাঁর সব নির্দেশ ঠিকমত পালন করেছে এ জন্যে তিনি খুব খুশী হলেন এবং তার বাধ্যতার পুরস্কার হিসাবে আগুন জ্বালতে শিখিয়ে দিলেন। সেই শুকনো ডালগুলো ঘষে-ঘষে গরম করলে কি ভাবে আগুন জ্বলে ওঠে শিখল কেরিকেরি।

এই বিদ্যে কেরিকেরি গোপন করে রাখল সকলের কাছ থেকে। গ্রামের সব আগুন—আকাশের বাজ থেকে যা পেয়েছিল সকলে—একবার নিভে গেল হঠাৎ। কেরিকেরি তখন চড়া দামে আগুন বেচতে লাগল সকলের কাছে। বোকা থেকে চালাক, সব পড়শীই তার কাছে থেকে আগুন-জ্বালার রহস্যটা বের করার বৃথাই চেষ্টা করল বহুবার।

রাজা মূচু মুশাঙ্গার ছিল এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। নাম তার কাতেঙ্গে। রাজা মেয়েকে বললেন : "তুই যদি এই লোকটার কাছ থেকে কৌশলটা আদায় করে আনতে পারিস তো তোকে গাঁওবুড়োদেব সঙ্গে একসঙ্গে বসতে দেওয়া হবে খাতির করে।'

সুতরাং সুন্দরী রাজকুমারী কাতেঙ্গে গেল কেরিকেরির কাছে। সে তো রাজকন্যার রূপে মোহিত! সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। কাতেঙ্গেও ব্যাপারটা বুঝে ফেলে খুব খুশী! বাড়ি ফিরেই সে হুকুম দিল সমস্ত গ্রামের যেখানে যত আগুন আছে যেন নিভিয়ে-ফেলা হয়। আর এক দাসীকে দিয়ে রাজকন্যা কেরিকেরিকে খবর পাঠালে এই বলে যে, সে সেদিন রাতে তার কুঁড়েয় যাবে।

সবাই ঘুমোচ্ছে নিঝুমরাতে। কাতেঙ্গে চুপিচুপি গিয়ে টোকা দিল কেরিকেরির ঘরের দরজায়। দোর খুলতেই সেই অন্ধকারের আড়ালে রাজকন্যা ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর একটাও কথা না বলে চুপচাপ রইল বসে। কেরিকেরি শুধোল : 'কথা বলছ না যে? আমাকে কি ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে না?' কাতেঙ্গে জবাব দিল : 'তোমার ঘরে ঢুকে ইস্তক আমি শীতে কাঁপছি। ভালবাসা-টাসার কথা এখন ভাবতেই পারছি নে। এখুনি আগুন জোগাড় করে আনো, তোমার মুখ দেখি, গরম হই, তারপরে ভালবাসব।'

কেরিকেরি ছুটল পড়শীদের কাছে যদি আগুন পায় কিন্তু রাজকন্যার হুকুমে সকলেই আগুন রেখেছিল নিভিয়ে। কাজেই তাকে ফিরতে হল খালি হাতে। অনেক সাধ্যসাধনা করল সে রাজকন্যাকে বিনা আলোতেই ঘুমোতে।

কিন্তু কাতেঙ্গে রাজী হবার মেয়ে নয় অত সহজে। আলো না জ্বাললে, আগুনে শীত দূর না করলে—সে কোনো কিছুতেই রাজী নয়। তার জোরাজুরিতে শেষ অবধি হাল ছেড়ে দেয় কেরিকেরি; শুকনো ডালপালা এনে ঘষে-ঘষে রাজকন্যার সামনেই যে আগুন যেই জ্বেলেছে—অমনি রাজকন্যা রহস্যটা ভেদ করে ফেলে বিদ্রূপ করে ওকে বলল: "তুমি কি ভেবেছ রাজার মেয়ে হয়েও তোমার সঙ্গে অমনি-অমনি ভালবাসার কথা বলেছিলাম? তোমার এই গোপন খবরটা আমার জানার দরকার ছিল তাই তোমার অত খাতির! আমি চললাম তোমার গোপন কথা জেনে নিয়ে; আমাব ঝি এসে তোমার মাথা ঠাণ্ডা করবে একটু পরে।"

গ্রামশুদ্ধু লোকের কাছে কাতেঙ্গে তার নবলব্ধ জ্ঞানের ঝুলি উজাড় করে। গর্ব করে তার বাপকে বলে সে: "যে রাজার শক্তিও হালে পানি পায় না, সেখানে একটা মেয়ের বুদ্ধিতেই বাজিমাৎ হতে পারে।" সেই দিন থেকে সকলে আগুন জ্বালতে শিখল আব বুশোঙ্গোদেব সর্দারদের সভায় একজন করে মেয়ের আসনও রইল পাকাপাকিভাবে। এই সর্দার মেয়ের উপাধি আজও কাতেঙ্গেই আছে। শান্তির সময় তার গলায় থাকে একটা ধনুকের ছিলে, গয়নাব মতো; আর যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সেই ছিলে সে দেয় সেনাপতির হাতে, ধনুকে সেটা পরিয়ে নিয়ে তখন সেনাপতি যায় শত্রুকে খতম করতে॥

॥ চার ॥ আগুন আমরা নিবুই নি ॥

[আফ্রিকার শ্বেত নীল নদ অঞ্চলের সিল্লুকদের লোকপুরাণ]

আগুন ছিল পান জ্‌ওকের দেশে। পান জ্‌ওক ছিলেন বড়ো ভূত। তিনি মানুষের হাতে আগুন পৌঁছে দেননি। লোকে জানতই না আগুন কাকে বলে। রোদে মাংস শুকিয়ে খেত সবাই। ওপরের ঝল্‌সানো দিকটা খেত পুরুষেরা, নীচের না-ঝল্‌সানো বাকিটা ছিল মেয়েদের বরাদ্দ।

একদিন একটা কুকুর বড়ো ভূতের দেশ থেকে আগুনে পোড়া মাংসের

টুকরো নিয়ে এল আমাদের কত্তাবাবাদের কাছে। কত্তারা ত সেটা খেয়ে খুব খুশি। তাঁরা ঠিক করলেন, আগুনে পোড়ানো মাংস যখন রোদে সেঁকা মাংসের চেয়ে খেতে ভাল, তখন আগুন জোগাড় করতেই হবে।

ওঁরা করলেন কি, কুকুরটার ল্যাজে বেঁধে দিলেন এক গোছা শুকনো খড়। তারপর সেটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন বড়ো ভূতের দেশে। সেখানে পৌঁছে কুকুরটা নিবু-নিবু-আগুন একটা ছাইগাদার ওপর গড়াগড়ি দিল যেই-না, অম্নি তার ল্যাজের খড় উঠল জ্বলে। যন্ত্রণায় সেটা দৌড়ে ফিরে এল কত্তাবাবাদের কাছে। এসে ছট্‌ফট্ করে পাক্‌সাট্ মারতে লাগল রোদে খড়্‌খড়ে ঘাসেব জঙ্গলেঃ দাউদাউ করে জ্বলে উঠল ঘাস। সেই আগুন আর আমরা কখনো নিবুই নি॥

[বড়ো ভূত অর্থ গ্রেট স্পিরিট তথা ঈশ্বর]

॥ পাঁচ ॥ ৎচুয়্যের বাঁচামরা ॥

[বুশম্যানদের লোকপুরাণ]

ৎচুয়্যে জানত কেমন করে নানান জিনিষে নিজেকে বদ্‌লে ফেলা যায়। কর্তাদের আমলের '! কুন্' শাস্তরে তার সেই সব ভোল বদলের কথা জানা যায়। যখন সকালবেলায় সূর্য উঠত সে হয়ে যেত ফলন্ত এক গাছ। সূর্য পাটে গেলেই সে যেত মরে। আবার পরদিন যেই ফের সূর্য হাজির হত, ৎচুয়্যে ধরত নিজের চেহারা। ওদিকের দেশের লোকেরা বলে সূর্য-ওঠার সময় ও হত তালগাছ। নানা রকমের ফলফুলুরিতে ভরন্ত গাছের চেহারা যেমন ধরত যে—অন্তত তিন রকমের গাছ ত সে হতই! মাছি হত কোনো সময়ে, এইটুকুন শরীর ধবে। আবার কখনো এই এত্ত বড়ো হাতীর চেহারা ধরত ইচ্ছে হলে। এমনও শোনা গেছে যে, জলভর্তি গর্তও নাকি সে হয়েছে এক-আধবার। পাখি—গিরগিটি—অনেক কিছুই অনেকবার চেহারা ধরেছে সেই লোক। প্রত্যেকবারেই সে একটা করে চেহারা ধরার কিছু পরে মরে গেছে। আবার বেঁচে উঠেছে খানিক বাদে।

শেষবার ও আবার ধরেছিল গিরগিটির চেহারা। ঐ অবস্থায় ওর বাবা কিন্তু ওকে মাটির ওপর দেখে ঠিকই চিনতে পারল। তখন ও দুটো লাঠি ঘসে-ঘসে

আগুন বানাচ্ছিল, আর ফুঁ দিয়ে-দিয়ে সেটার শিস্‌গুলো লক্‌লক্ করাচ্ছিল। বাবা ওকে দেখছে বুঝতে পেরেই ৎচুয়্যে সঙ্গে-সঙ্গে মরে গেল।

ওর বাবা খুব ভয় পেয়ে গেল। একেই আগুন ছিল একটা ভয়ের জিনিষ, তার ওপর ৎচুয়্যের এই আচমকা মরে-যাওয়াটা তার কাছে আরো ডর-তরাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

তবে আমরা একথা জানিনা যে, ৎচুয়্যের বাবার থেকেই কত্তারা আগুন জ্বালতে শিখেছিল কি-না। বোধ হয় শিখেও থাকতে পারে কারণ ৎচুয়্যে খুব সম্ভব দেবতাই ছিল॥

॥ ছয় ॥ নাগবধুর কথা ॥

[কঙ্গো অঞ্চলের সর্পটোটেম-আদিবাসীদেব লোকপুরাণ]

সে অনেক কাল আগের কথা। সেকালের সবাই ভুলে গেছে। ভোলেনি শুধু নাগবংশের মেয়েবা। ওদের কাছে সাপ দেবতা, কেননা সাপই ওদের বংশকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সেই ভুলে যাওয়া কালের এক সকালে একা-একা নদীতে স্নান করতে গেল এক মেযে। তির্-তির্ করে বয়ে যাচ্ছিল নদী, পাহাড়ী পথ বেয়ে নামছিল তার জল ; অপরূপ ঝির্‌ঝির্ শব্দ সেই জলের।

জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই কিশোবী। অনাবৃত তার দেহ। মন তার ব্যাকুল, কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। জল তার শরীরকে ছুঁয়ে-ছুয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ এমন সময়ে বিরাট একটা সাপ তার সামনে লকলকিয়ে ভেসে উঠল। একটুও ভয় পেলনা কিন্তু সেই মেয়ে।

কাজেই সাপ অবাক হল। তাকে দেখে ত সবাই ভয় পায়! সাপ শুধোল: "ও মেয়ে, ভয় করে না তোমার আমায় দেখে? তুমি এমন আন্‌মনা কেন?" মেযে বলল: "ভয় পাব কেন? আর মরলেই বা আমার ক্ষতি কি? আমি ত আর মা হতে পারছি না। কেউ আমায় দেখতে পারে না। মেয়েদেব যা-কিছু থাকার, স-ব আমারও আছে। তবু আমি যেন পুরো মেয়ে নই। আমার বুক হু-হু করে। আর সবার বুকের মধ্যে ছেলে আছে। আমার নেই। মরতে ভয় পাব কেন?"

সাপ ফণা হেলিয়ে বলল: "তুমি আমাকে ভয় পাওনি। তোমায় আমি

আমার শক্তি দেব। আমি তোমার দেহের মধ্যে ঢুকব। তোমার সঙ্গে মিশে যাব। আমি-তুমি এক হয়ে যাব। ভয় কি?"

সাপ ঢুকে পড়ল কিশোরীর শরীরে। দিন যায় বয়ে। অনেক সন্তানের মা হল সেই কিশোরী। সবাই শুনল তার গল্প। সবাই অবাক হল। তার ছেলেরা তাদের বাবা সাপকে দেবতা বলে পূজো করতে শুরু করল।

কিশোরীর সারা দেহে যে মাতৃত্বের লক্ষণ জেগে উঠল, তা তো সেই সাপেরই কৃপায়। সাপ যে সন্তান দেবার ক্ষমতা রাখে। নাগবংশী মেয়েরা সে কথা সেই জন্যেই ত মনে রাখে আর সাপের পূজো করে॥

॥ সাত ॥ আকাশের জঙ্গলে শিকার ॥

[মধ্য আফ্রিকার পিগ্‌মীদের লোকপুরাণ]

সূর্য হল সকলের চেয়ে বড় শিকার-করনেওলা। রোজ ভোরবেলা রোদ্দুরে তীর ছুঁড়ে মারে সূর্য আকাশের জঙ্গলের মধ্যে হরিণের পালের ওপর। আমরা যেগুলোকে তারা বলি, ওগুলো আসলে হল হরিণ। কিন্তু বুড়ো কর্তা যেমন মরা-হরিণটাকে আবার নতুন করে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন কদিন পরে, তেমনিই আবার রাত্রিবেলা মরে-যাওয়া তারা-হরিণটাকে ফের পাঠিয়ে দেন আকাশে চরতে। শুধু মাত্তর যে তারাটাকে তিনি আর বাঁচাবেন না বলে ঠিক করেন, সেটাই খসে পড়ে মাটির ওপর। বুড়ো কর্তা, যাঁকে আমরা বড়ো ভূতও বলি, তাঁরই ইচ্ছেতে এই সব কিছু হয়॥

[বুড়ো কর্তা অর্থে ঈশ্বর]

॥ আট ॥ সাপ কেন অমর ॥

[পূর্ব আফ্রিকার বারুন্ডুদের লোকপুরাণ]

লেজ্‌আ একবার পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। তখন ছিল অনেক রাত। সেই নিশুত রাতে সব্বাই ছিল ঘুমিয়ে, শুধু জেগেছিল পলক-না-ফেলা চোখে সাপ। লেজ্‌আ সব প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে হেঁকে বললেন: "বল, তোমরা কারা-কারা মরতে চাও না?" বারবার শুধোনো সত্ত্বেও কেউ সাড়া দিল না; কি করে আর দেবে—সবাই ত ঘুমে অচেতন!

আস্তে-আস্তে সাপ এল তাঁর কাছে বুকে হেঁটে-হেঁটে। সে বলল: "প্রভু, আমি চাইনে মরতে।" অন্য সব প্রাণীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে লেজ্‌আ একমাত্র

তাকেই দিলেন অমর হবার বর। সেই থেকে মরার বয়স হলেই সাপ তার আগের খোলসটা ছেড়ে ফেলে নতুন করে শরীর ধরে ; তার এমনিতে তাই মৃত্যু নেই। কেউ মারলেও, সে অন্য দেহ নিয়ে আবার সাপ হয়েই জন্মায় ॥

॥ নয় ॥ রা দেবতার পরাজয় আর প্রতিহিংসা ॥

[মিশরীয় পুরাণবৃত্ত ; লোকপুরাণের পরিশীলিত রূপ]

মাতাদেবী আইসিস চেয়েছিলেন দেবশ্রেষ্ঠ রা-এর সমান হতে। শুধুমাত্র রা-এর গোপন নাম জানাতে পারলেই তা সম্ভব ছিল। রা-কিন্তু কখনোই চাননি নিজের সম্মানের কেউ অংশীদার হোক ; তাই আইসিসের সব চেষ্টাই বিফল হল।

কিন্তু রা-দেবশ্রেষ্ঠ হলেও মানুষের মতোই বৃদ্ধ হতে শুরু করলেন। তাঁর শারীরিক অপটুতাব সুযোগ নিয়ে আইসিস তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ-দিয়ে গড়ানো লালার সাহায্যে তৈরী করলেন এক কালসর্প। রা-দেবতার পথে লুকিয়ে রইল সেই সাপ। তার আকস্মিক দংশনে মরণোন্মুখ হলেন দেবশ্রেষ্ঠ। আইসিস এসে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁকে তিনি নিজের মহাজ্ঞানের সাহায্যে বাঁচাবেন, শুধু তিনি যদি নিজের সংগোপন করা নামগুলি বলে দেন। তাঁর গোপন নাম খেপ্‌রা এবং তেম তাঁর অন্তর থেকে আইসিসের অন্তরে সঞ্চারিত করলেন তিনি। বিনিময়ে আইসিস বাঁচালেন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে। রা-এর একচ্ছত্র সম্মান সেই দিন থেকে হল খর্ব।

সম্মানের এই আসন টলে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ রা স্থির করলেন মানব জাতিকে ধ্বংস করে এর প্রতিশোধ নেবেন ! মানুষ তাঁকে আর আগের মতো ভক্তি করছে না বুঝতে পারলেন তিনি। আর সব দেবতাদের পরামর্শে রা পাঠালেন মৃত্যুদেবী হাথোর সেখেৎকে, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন রা-এর মাতা এবং কন্যা এবং তাঁর অক্ষিতারকা এবং আকাশ ; আর আলোর উৎসও ছিলেন এই বিচিত্ররূপা দেবী। হাথোর দেবীর অমোঘ আক্রমণে পৃথিবী থেকে মানুষের বংশ প্রায় বিলুপ্ত হয়েই যেত, যদি না শেস মুহূর্তে স্বয়ং রা তাঁকে নিরস্ত করতেন। মদ্যের প্লাবনে রা পৃথিবী ভাসিয়ে দিলেন ; সূর্যদেবতার এই কূটকৌশলে হার মানলেন মৃত্যুদেবী। মদের নেশায় তিনি ঘোর হারালেন। রা তখনও চাইলেন বিশ্ব-চরাচরের প্রভুত্ব করতে। তাই তিনি ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেন শান্তির পরি-মণ্ডলে। যারা পুণ্যচেতা মৃত্যুর পর তারা সেখানে আশ্রয় পায় ॥

॥ ঘ ॥ ইউরোপ ॥

॥ এক ॥ দিউক্যালিওন আর তাঁর বংশের কথা ॥

[গ্রীক লোকপুরাণ ; পরবর্তীকালে ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্তে সংযুক্ত ও পরিশীলিত হয়েছে।]

দেবতাদের কাছ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিলেন যে প্রমেথিউস, তাঁর ছেলের নাম ছিল দিউক্যালিওন। তাঁর মা হয় ছিলেন ক্লুমেনে আর নয়ত প্যাণ্ডোরা—যাঁর বাক্স খোলবা মাত্র পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট শোক রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল ; সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা নামে একটা ছোট্ট পাখিও ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়েছিল। এখনও সেটা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়।

দিওক্যালিওনেব সন্তানেরাই হল পৃথিবীর প্রথম মানুষ। থেসালিতে তিনি রাজত্ব কবতেন রাণী পাইরহাকে নিয়ে। দেবতাদের রাজা জিউস যখন মানুষ জাতকে ধ্বংস কববার জন্য বানের জলে পৃথিবী ডুবিযে দেবাব উপক্রম কবলেন যখন, তখন প্রমেথিউস ছেলে আর ছেলের বউকে আগেই সাবধান করে দিলেন। বাপের পরামর্শে দিওক্যালিওন বানালেন এক জাহাজ—আর তাইতে চড়ে বন্যার ন' দিন তিনি আর পাইবহা ভেসে বেড়ালেন এথোস থেকে এতনা, সেখান থেকে ওথরুস, আবার সেখান থেকে পার্ণাস্যুস অবধি। পার্ণাস্যুসে পৌছে তাঁরা নামলেন ডাঙাতে। থেমিসের আশ্রয়ে গিয়ে দুজনে শুধোলেন কেমন করে আবার মানুষ জাতিকে গড়ে তুলতে পারবেন তাঁরা।

জিউসের উত্তর নিয়ে এল এক দূত। সে বলল : "তোমাদের দুজনের মাথাদুটো আড়াল করো আর পিছনে ছুঁড়তে থাকো তোমাদের মায়ের হাড়।" মায়ের হাড় বলতে জিউস বুঝিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে জমে থাকা পাথরগুলোকে।

দিউক্যালিওন যে পাথরগুলো ছুঁড়েছিলেন তাদের থেকে জন্মাল পুরুষেরা ; আর মেয়েরা জন্মাল পাইরহার ছোঁড়া পাথর থেকে। তাঁরা তারপর নেমে এলেন পাহাড়ের চূড়া থেকে। দিউক্যালিওন ওপুসে তৈরী করলেন তাঁর নতুন বাড়ি। ওপুসের প্রথম রাজা হলেন তিনিই। পাইরহার গর্ভে তাঁর অনেকগুলি

ছেলেমেয়েও হয়েছিল : হেলেন, অ্যামফিকতুওন, আইদোমেনেউস তাদের কয়েকজন ॥

॥ দুই ॥ জানুস ও ডায়ানা ॥

[রোমানপুরাবৃত্ত ; লোকপুরাণের ঐতিহ্য এতে সুস্পষ্ট]

জানুস দেব হলেন বিশ্বের ধাতা, সমস্ত কিছুরই আদি এবং অন্ত নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। ঘরের দরজায় থেকে তিনি ভিতর এবং বাহির দুদিকেই লক্ষ্য রাখেন শোনা যায়। এই জন্যেই তাঁর মুখ হল দুটি, সামনে এবং পিছনে ফেরানো ; তার দুটি মাথা আবার একটি অন্তটির সঙ্গে যুক্ত। এটা নাকি তিনি-যে অতীত আর ভবিষ্যৎ দুই-ই দেখতে পান, তারই প্রমাণ। আসলে তাঁর এই দুই মাথা হল জ্ঞানীর লক্ষণ।

এই সব কারণেই তাঁকে বলা হয় মহেশ্বর কিংবা দেবতাদের দেবতা। সমস্ত পূজো-অর্চনা করার আগেই তাই তাঁর পূজো করার নিয়ম করেছিলেন পূর্ব-পুরুষেরা। তাঁকে স্মরণ করা সব কিছু শুরু করার বিধানও তাঁদেরই করা। দিনের প্রথম ঘণ্টা, বছরের প্রথম মাস সবই এই জন্যে তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁকে কেউ কেউ ডায়ানুসও বলেন কেননা তিনি নানা কারণেই ডায়ানা দেবীর পুরুষ-প্রতিকল্প। ডায়ানুস আলোকদেবতা রূপে স্বয়ং ; আর তাই আলোকদেবী ডায়ানা হলেন চন্দ্র।

ডায়ানা হচ্ছেন সাধারণ লোকেদের দেবী। দাসেরাও তাঁর পুজো করে থাকে। বিশেষ করে তাঁর পূজো করে মেয়েরা। আসলে তিনি ছিলেন বন-জঙ্গলের সত্তা ; এক চাষী আর তার বউ ছেলে-মেয়ে তাঁর সুনজরে পড়ায় তিনি তাদের বন্ধু হয়ে যান, তখন থেকে তিনি সুন্দরী এক নারীর রূপ ধরেন। সেই মূর্তিতেই তাঁর পূজো করা হয়। সঙ্গে থাকেন অরণ্যদেবতা ভিরবিউস।

ডায়নাকে কেউ যেমন বলেন চন্দ্রদেবী, কেউ কেউ তেমনই মনে করেন ধরিত্রী মাতা বলে। এরিসিয়ার বনের ধারে নিভে যাওয়া আগুন-পাহাড় আলবানের জ্বালামুখীতে বৃষ্টির জল জমে-জমে নেমি বলে যে হ্রদ তৈরী হয়েছে, সেটা হল তাঁর আয়না। পাশে তাঁর মন্দির। সেখানে পুরোহিত বা রেক্স হল এক পলাতক দাস—নিজে সে আগের পুরোহিতকে হত্যা করে ঐ পদ কেড়ে নিয়েছে, আবার তাকেও হত্যা করে পুরোহিত হয়ে বসবে আর এক পলাতক দাস। এটাই

ডায়নার নিয়ম, এভাবেই চলে আসছে বহুকাল ধরে। গাছের পাতাভরা ডাল হাতে নাকি লড়তে হয় দাস পুরোহিতদের। শোনা যায় এতে নাকি পরলোকের পথে কোনো বিঘ্ন দেখা দেয় না। জীবন এবং মৃত্যু, আলো অন্ধকার—সবেরই অধিষ্ঠাত্রী তাই ডায়ানা ॥

।। তিন ।। চাঁদ-সূর্য পৃথিবী ।।

[স্লাভীয় লোকপুরাণ ; লিথুয়ানিয়া অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষভাবে]

সৃষ্টির পর যখন প্রথম বসন্তকাল এসেছিল, তখন চন্দ্রদেব বিয়ে করেছিলেন সূর্যাদেবীকে। পৃথিবী আর অন্যসব গ্রহ-নক্ষত্রেরা হল তাঁদের সন্তান। সূর্যা অত্যন্ত ভোরে উঠে প্রতিদিনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন বলে, চন্দ্রদেবতা ভোরবেলা একাই বেড়াতে যেতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে শুকতারার দেখা হয়ে গেল বেড়াতে-বেড়াতে। চন্দ্রদেব প্রবলভাবে তার প্রেমে ডুবে গেলেন।

বজ্রদেবতা পেরকুন্যাস এই অন্যায়ের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যে ওক গাছের তলায় চন্দ্র এবং শুকতারার মিলন হয়েছিল তিনি সেটিকে বিদ্যুতেব আগুনে ঝল্‌সে দিলেন। আর নিজের তরবারির আঘাতে চন্দ্রদেবের মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন। সেই থেকেই আমরা চাঁদের মুখে কলঙ্কচিহ্ন দেখতে পাই।

পূর্ব দেশের কুটুমরা আবার চন্দ্র-সূযের বিবাহিত জীবন নিয়ে অন্য একটা গল্প বলে। তখন নাকি চাঁদ আর সূযদেবী একটা ছোট্ট বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে থাকতেন। ধীরে-ধীরে তাঁদের মধ্যে ভালবাসা জন্মাল। দু-জনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করতে লাগলেন। পৃথিবী নামে তাঁদের মেয়ে জন্মাত অল্পদিন পরে।

পরে চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে আর বনিবনা না-হতে শুরু করল। দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল এমন সাব্যস্ত করলেন তাঁরা। কিন্তু পৃথিবী কার ভাগে যাবে? এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভগবান পেরকুন্যাসকে পাঠালেন তাঁদের কাছে। পেরকুন্যাসের নির্দেশ হল এই যে দিনের বেলায় পৃথিবীকে দেখাশোনা করবেন তার মা সূর্য, রাতের বেলায় বাবা চন্দ্র। এই বিধানই আজো চলে আসছে। যদি কোনো সময়ে দু-জনের একই সঙ্গে মেয়েকে দেখতে ইচ্ছা করে, পেরকুন্যাস সঙ্গে-সঙ্গে মাঝখানে এসে একজনকে সরিয়ে দেয়। তখনই গ্রহণ লেগেছে বলি আমরা।

পূবের কুটুমদের এই গল্পের শেষটা আবার পশ্চিমী জাতিদের কাছে আর একভাবে শোনা যায়। ঝগড়ার পর মেয়ের তদারকীর ফয়সলা করবার জন্য চন্দ্র এবং সূর্য দৌড়ের বাজি রাখলেন। দৌড়ে সূর্যদেবী জিতে মেয়ের ওপর দিনের বেলার খবরদারীর অধিকার লাভ করলেন। চন্দ্রদেবতা হেরে গিয়ে রোজ রাত জাগতে বাধ্য হলেন। গ্রহণের ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটে শোনা যায় যে, একলা সূর্যদেবীকে দেখতে পেয়ে এক দানব তাঁকে ধরে ফেলে যখন, তখন এই ব্যাপার ঘটে। সেই দানোকে তাড়াতে তখন আমরা ভেঁপু বাজাই, ক্যানেস্তা পিটি। এমনও আবার শুনি চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে যখন সাময়িকভাবে মিটমাট হয়ে যায়, তখন তাঁদের ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য যাতে মেয়ে পৃথিবীর চোখে না-পড়ে সে জন্যে তারা একটা কালো পর্দা খাটিয়ে দেন॥

।। চার ।। কল্লোলার কূয়ো ।।

[আয়ারল্যাণ্ডের লোকপুরাণ, কেল্টীয় ঐতিহ্যানুসারী]

সমুদ্রের তলায় যেখানে কম বয়সের দশ, সে-ই সেখানে, অনেক নীচে আছে কল্লোলার কূয়ো। ন'-ন'টা বাদাম গাছ ঝুঁকে থাকে তার ওপরে, তাদের পাতা গজায়, ফুল ফোটে, ফল ধরে—সব একই সময়ে। এগুলো হল জ্ঞান, বুদ্ধি আর উৎসাহে-ভরা গাছ। এদের ফলের মধ্যে জমা হয়ে থাকে সে-সব। টুপটাপ করে গাছের ফলগুলো জলে যেই পড়ে, অমনি সেগুলো কপ্ করে গিলে নেয় সাঁতরে-বেড়ানো স্যামন মাছেরা। মাছগুলোর গায়ের ফুটকি গুণে বলে দেওয়া যায় তাদের কে ক'টা বুনো গাছের বাদাম খেয়েছে। যে-সব মানুষ সেই কূয়োর জল কিংবা ঐ ফল অথবা ঐ মাছ খেয়েছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কিংবা উৎসাহের পরিমাণ প্রায় দেবতাদের মতো হয়ে ওঠে।

শোনা যায় একবার না-কি সমুদ্রের দেবতা লির্-এর নাতনী সাইনেণ্ড জ্ঞানবুদ্ধির খোঁজে সেই কূয়োয় গিয়েছিলেন। কিন্তু কূয়োর জমা জলের ছিল তাতে আপত্তি। জল হঠাৎ বেড়ে উঠে সাইনেণ্ড ওকে ডুবিয়ে মেরে ফেলল তার ওপর আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল তার মৃতদেহটা শ্যানন্ নদীর পাড়ে। শ্যানন নদীকে কেউ-কেউ আবার সিণ্ডনেনও বলে আমাদের দেশে। টিপ্পেরারির কাছে এখনো কল্লোলার কূয়ো দেখা যায়। কিন্তু মেয়েদের আজও সেখানে জল খাওয়া বারণ॥

॥ **পাঁচ** ॥ **থর দেবতার ক্রোধ** ॥

[টিউটনীয় লোকপুরাণ]

থর ছিলেন বজ্রবিদ্যুতের দেবতা। ওডিন দেবের সঙ্গে ছিল তাঁর দ্বন্দ্ব, কার মর্যাদা বেশি এই নিয়ে। থরকে পূজা করত চাষীরা, নৌকোর মাঝিরা। আর ওডিনের ভক্ত ছিল যাদের অবস্থা ভাল, তারা। এই থর দেব মাঝে-মাঝেই এক চাষীর কাছে নিজের রথ আর ছাগলগুলোকে রেখে যেতেন। তার নাম ছিল এগাইল।

একবার এগাইলের কুঁড়েতে ছাগল রাখতে এসে থর দেবতা দেখলেন যে সে-বাড়িতে এক কণাও খাবার জিনিষ বলতে কিছুই নেই। দয়ার বশে তিনি এগাইলকে অনুমতি দিলেন তাঁর ছাগলগুলিকে কেটে খেতে। শুধু একটাই তাঁর আদেশ ছিল যে, খাবার পরে হাডগুলো না-চিবিয়ে সেগুলোকে ছড়িয়ে-রাখা ছাগগুলোর ওপব তৎক্ষণাৎ ছুঁডে দিতে হবে। এই বলে চলে গেলেন থর।

আগুন আব নষ্টামির দেবতা লোকি ঠিক এই সময়ে হাজির হলেন এগাইলের বাড়িতে। লোকি এগাইলেব ছেলে থিয়াল্‌ফিকে ভুলিয়ে রাজি করলেন অন্তত একটা হাডও চিবিয়ে ভেতরের মজ্জাটুকুর স্বাদও নেয় যাতে সে! লোকির ফাঁদে পা দিলে থিয়াল্‌ফি কিছু না-ভেবেই।

থর যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে পড়ল ছাগলগুলোকে নতুন করে জিইয়ে তোলার কথা। একটা করে হাতুড়ির বাড়ি মারেন তিনি, আর সেই মারের চোটে ছাগলের ছাল আর হাড়গোড সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে যায় আস্ত একটা ছাগল। কিন্তু যে-ছাগলটার হাড় ভেঙে মজ্জা চুষে খেয়েছিল থিয়াল্‌ফি, সেটা জ্যান্ত বেঁচে উঠল, কিন্তু খোঁড়া হয়ে। কাজে-কাজেই থর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। এগাইল তাঁর রাগ কমানোর জন্যে থিয়াল্‌ফি আর তার বোন রসকোভাকে উৎসর্গ করল তাঁর কাছে দাসত্ব করার জন্যে। তখন থর শান্ত হয়ে সব ছাগলগুলো আর এই দুই ভাইবোনকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলেন॥

॥ **ছয়** ॥ **থ্রাইমের বিয়ে** ॥

[নর্স লোকপুরাণ]

থর দেবতা একদিন ঘুম থেকে উঠে আর তাঁর হাতুড়িটা দেখতে পেলেন না। অতএব লোকির ডাক পড়ল, কারণ তিনি দেবতাদের বন্ধু এবং শত্রু

একই সঙ্গে। লোকি আবার গেলেন ফ্রেইয়া ঠাকরুণের কাছে, তাঁর বাজপাখির পোশাকটা ধার নিতে। সেই পোশাক চাপিয়ে তিনি উড়ে গেলেন দৈত্য থ্রাইম্রর কাছে। লোকির জিজ্ঞাসার উত্তর দিল হাতুড়ি-চোর থ্রাইম্র: সে বলল: "ওটা আছে মাটির তলায় আট রশি নিচে।"

লোকি বহুৎ অনুরোধ-উপরোধ করলেন থরের বাজডাকানো হাতুড়িটা ফেরৎ দেবার জন্যে। কিন্তু থ্রাইম্রর সেই এক গোঁ: যদি ফ্রেইয়া দেবী তার বউ হতে রাজি থাকেন ওডিন দেবতাকে ছেড়ে এসে, তবেই মিলবে হাতুড়ি, নইলে নয়!

ফ্রেইয়া ত এই কথা শুনেই আগুন। তাঁব সেই রামধনুর হার—যেটা নাকি পাবার জন্যে তিনি চার বাঁটুল সেক্‌রার সঙ্গে পালা করে ঘুমিয়েছিলেন আর যা নিয়ে দেবতাদের মধ্যে অনেক গণ্ডগোলও হয়েছিল—বাগে ছিঁড়ে ফেললেন দেবী, আর চারিদিকে ভূমিকম্প হতে লাগল। তখন থর আর কি করেন, ফ্রেইয়ার ছদ্মবেশ ধরে তিনি নিজেই গেলেন থ্রাইম্রর কাছে; গিয়ে তাকে বললেন যে বিয়ে করতে রাজি আছেন তাকে। বোকা দৈত্য থ্রাইম্র তো মহা খুশি। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, চির যুবতী ফ্রেইয়া তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন স্বয়ং ওডিন দেবতাকে ছেড়ে এসে—এই কথা ভেবে ত সে আহ্লাদে আটখানা! সঙ্গে সঙ্গে এক দারুণ ভোজের ব্যবস্থা করে ফেলল সে।

কিন্তু খেতে বসে কনের খাওয়া দেখে তার চোখ কপালে উঠল! থর ছিলেন দারুণ খাইয়ে লোক; ফ্রেইয়া সেজে থাকলে কি হয়, থরে থরে সাজানো খাবার দেখে তিনি আর লোভ সামলাতে পারলেন না, একটা আস্ত ষাঁড়, আটখানা স্যামন মাছ, আর তিন জালা মদ তিনি দেখতে দেখতে উড়িয়ে দিলেন। লোকিও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন নিতকনে সেজে; তিনি ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করলেন এই বলে যে থ্রাইম্রকে বিয়ে করার কথা শুনে 'ফ্রেইয়া' নাকি এমন ব্যাকুল যে আট দিন পথে তিনি আর কিছু দাঁতেই কাটেন নি, পাছে খেতে গিয়ে দেরী হয়ে যায়!

হাঁদারাম থ্রাইম্র এক কথায় বিশ্বাস করে ফেলল সব। বিয়ের উপচার হিশেবে থরের হাতুড়ি লাগে আমরা তো সবাই জানি। থ্রাইম্র কাজে-কাজেই আনাল সেটা মাটির তলা থেকে। যেই না হাতুড়ি আনা হয়েছে বিয়ের আসরে, অমনি থর উঠলেন একেবারে অট্টহাস্য করে—খপ্ করে হাতুড়ি কেড়ে নিয়েই তিনি এক এক বাড়িতে এক একটা করে দৈত্যকে খতম করলেন। বরফ জমানো দৈত্যের গুষ্ঠি এই ভাবে বাজ বৃষ্টির হাতুড়ির বাড়িতে খতম হয়ে গেড়॥

।। এক ।। চন্দ্র-সূর্যের কথা ।।

[মুনিভাক দ্বীপের এস্কিমোদের লোকপুরাণ]

এককালে এখানে একটা লোক আর তার বউ থাকত। ওদের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। কাজেই লোকটাব বাপ-মা-মরা ভাইপোকে ওরা নিজের ছেলের মতো কবে মানুষ করত, পরিচয়ও দিত তাই বলে।

দিন যেতে লাগল। ইতিমধ্যে দু-দুবাব একই ঘটনা ঘটল রাত্তিরবেলায়। পুরুষ মানুষেরা যখন তাদের বড ইগলুর মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, এমন একটা সময়ে ঘুট্‌ঘুটে রাতে লোকটার বউ বুঝতে পাবল তার পাশে কে যেন শুয়ে রয়েছে। যেই সে উঠে বসেছে, অমনি সেই শুয়ে থাকা অচেনা লোকটা হুডমুড করে উঠে পালায়। এমনি ঘটল দু-দুবাব।

তখন বউটা তার ববকে বলল সব ব্যাপার। পরেব রাতে লোকটা পুরুষদের ইগলুতে জেগে-জেগে শুয়ে রইল কে উঠে বাইরে যায় দেখবার জন্যে। সে আর কেউ না, তারই ভাইপো। ছেলেটা সেই রাতে আবার তার কাকীর ইগলুতে ঢুকল ; কাকা নিজেদের ইগলুর দরজার পাশে শুয়ে-শুয়ে তাকে বেরোতে দেখল।

ওদিকে ছেলেটা তখন অন্য ইগলুব মধ্যে তার কাকীর পরণের পার্কা আর পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলার চেষ্টা করছে—এমন সময় বাতির আলোটা জ্বালিয়ে নিয়েই কাকী দিল প্রাণপণে ছুট—ছেলেটাও ছুটল তার পিছনে সমান জোরে। তারও হাতে তার নিজের জ্বালানো বাতি। দৌড়তে দৌড়তে লোকটার বউটা আকাশে উঠে পডল, ছেলেটাও উঠল তার পিছু-পিছু। বউটাই হযে সূর্য, আর ছেলেটা চাঁদ ; বরাবর সে তাড়া করে চলেছে সূর্যকে।

একবার সে ধরেও ফেলেছিল বউটাকে। ধরে ধাক্কা মারতেই ছোট সমুদ্দুরের ওপারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সে—এই মিকিরিয়ুক গাঁয়ের উল্টোদিকে। সেখানে মাটি ঝল্‌সে যায তাইতে। লোক ভয় পেল আর কিছু সেখানে জন্মাবে জন্মাবেনা, চারদিকে জ্বলে-পুড়ে যাবে এই ভেবে। তখন ওঝারা নানারকম ব্যাপার-স্যাপার করে সূর্যকে আবার তুলে দিল আকাশে॥

[পার্কা হল ঘাগরা ধরণের জিনিষ ; ছোট সমুদ্দুর অর্থে উপসাগর]

।। দুই ।। সেড্‌নার শাস্তি দেওয়া ।।

[আলাস্কা অঞ্চলেব এস্কিমোদের লোকপুবাণ]

সেড্‌নার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফুল্‌মাব নামে এক সমুদ্দুরেব পাখিব। সেড্‌না কিন্তু সব সময়েই চাইত তাব পাখি-ববেব হাত থেকে পালাতে। একদিন সুযোগও মিলল; সেড্‌না আব ওব বাবা দুজনে মিলে সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু কবল একটা উমিযাকে চড়ে। একটু পবেই পিছু-পিছু তেড়ে এল ফুল্‌মাব —তাব ডানাব ঝাপটে ঝড় বইতে লাগল সমুদ্রেব ওপব। তাকে ঠাণ্ডা কবাব জন্যে বাপ মেযেকে উমিযাক থেকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। সেড্‌না কিন্তু খপ্‌ কবে নৌকাব কানাটা ধবে ভাসতে-ভাসতে চলল। তাব বাবা তখন একটা কুড়ুল নিয়ে মেযেব হাতেব ওপব কোপ মাবতে শুরু কবল। কুড়ুলেব গাযে প্রথম যে আঙুলগুলো কাটা পড়ল, সেগুলো সঙ্গে-সঙ্গে হযে গেল তিমিমাছ, দ্বিতীয় কোপে-কাটা আঙুলগুলো হল সীলমাছ আব শেষ দফায়-কাটা আঙুল হল সিন্ধুঘোটক।

সেড্‌নাব পক্ষে কাজে-কাজেই আব সম্ভব হলনা নৌকো ধবে ভেসে-থাকা তলিযে গেল ও সমুদ্রেব তলায়। তার পাহাবাদাব আব সঙ্গী হিসেবে সেখানে জুটল এক কুকুব। কেউ-কেউ বলে তাব বাবাই নাকি আবাব জলেব তলায় গিযে মেযেকে পাহাবা দিতে শুরু কবেছিলেন। এখন আঙুল না-থাকায় সেড্‌না চিরুণী দিযে চুল আব আঁচড়াতে পারত না। এদিকে পৃথিবীর ওপবে মানুষ কবতে-নেই এমন যত সব কাজ যখনই কবে, সেই পাপ এক-একটা পোকা হয়ে তাব জট-পাকানো চুলেব মধ্যে ঢুকে কুটকুট্‌ করে কামড়ে তাকে রাগিযে তোলে। আব এই জন্যেই মাঝে-মাঝে আমাদেব শিকাব জোটে না, কেননা সে তাব আশ্রিত সব জন্তু ঐ তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক—লুকিযে বেখে আমাদেব পাপের শাস্তি দেয়॥

॥ চ ॥ উত্তর আমেরিকা ॥

॥ এক ॥ সৃষ্টিপুরাণ ॥

[ইরোকোয়া রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকপুরাণ]

মানুষেরা তখন বাস করত আকাশের ওপারে। একদিন তাদের সর্দারের মেয়ের হল খুব কঠিন অসুখ। বারান্‌জের ওঝারা বলল: "এই রোগ সারানোর জন্যে জঙ্গলে-জন্মানো বালেত গাছের শেকড় দরকার—জঙ্গলে গিয়ে গাছ খুঁজে বার কর।" গাছ খুঁজে পাওয়া গেল যখন, তখন ওঝারা বলল: "শেকড়ের চারপাশ খুঁড়ে ফেল তোমরা, আর তারপরে সেই গর্তের মধ্যে মেয়েটার গায়ে শেকড়ের ছোঁয়া-লাগে এমন ভাবে ওকে শোয়াও।"

মেয়েটাকে শোয়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু ও গেল সেই বিরাট ফুটো দিয়ে গলে। আকাশের সেই ফুটো দিয়ে পড়ে গিয়ে ও এসে পড়ল পৃথিবীর সমুদ্রের জলের মধ্যে ঝপাং করে। বুনো হাঁসেরা ওকে দেখতে পেয়ে উড়ে এল, তারপর পিঠের পাখ্‌নায় শুইয়ে ওকে নিয়ে গেল ধেড়ে কাছিমের কাছে।

কাছিম ডাকল সমস্ত সাঁতার জানা জীব-জন্তুদের। বলল: "ওকে আমরা বাঁচাবই। আগে ওর জন্যে একটা থাকার জায়গা বানিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে।" কাছিমবুড়ো কোলাব্যাংকে হুকুম দিল: "ডুব দিয়ে জলের নিচে গিয়ে গাছের তলা থেকে মাটি তুলে আন।" কোলা অনেকবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না শেষ অবধি। তারপর চেষ্টা করল ইঁদুর, কিন্তু সেও পারল না। তখন বুড়ো সোনাব্যাং বলল: "আমিই তবে একবার চেষ্টা করে দেখি।" অন্য সবাই থপ্‌থপে বুড়োর কথা শুনে ঠাট্টা করে হেসে উঠলেও, কাছিম কিন্তু বলল: "তুমিই হয়ত পারবে। খুব জোর চেষ্টা কোর বাপু।"

সোনা-বুড়ো লম্বা দম নিয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করল। জলের তলা থেকে ওপরে বুদ্‌বুদ্ উঠে আসতে লাগল একটু-একটু করে। মুখভর্তি বালি নিয়ে সোনাব্যাং উঠে এল বুদ্‌বুদের বুড়্‌বুড়ি ধরে-ধরে। উঠে এসে ব্যাং বালির দানাগুলো ছড়িয়ে দিল ধেড়ে কাছিমের খোলার চারদিকে। দেখতে-দেখতে গড়ে উঠল সেখানে একটা দ্বীপ। এখন সেটারই নাম বোহোল্ হয়েছে। তারপর থেকে মেয়েটা সেখানেই থাকতে লাগল।

সেই হল পৃথিবীর মানুষের মা। কাছিম বুড়োর খোলার ওপর সমস্ত

পৃথিবীটাই রাখা আছে। বুড়ো একটু যেই নড়াচড়া করে অনেকদিন পরে-পরে, অমনি ভূমিকম্প হয় ॥

॥ দুই ॥ রাত্রি এল কেমন করে ॥

[অনম্বে রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকপুরাণ]

প্রথমে রাত্রি বলতে কিছুই ছিল না। তখন সব সময়েই ছিল দিন। জলেব তলায় রাত্রি তখন ঘুমিয়েছিল। তখন কোথাও কোনো জীবজন্তু ছিল না। এই জগতের সব কিছুই তখন কথা বলতে পারত।

সাপেদের সর্দারের মেয়ে বিয়ে করেছিল এক অল্প-বয়সী তরুণকে। সেই যুবকের ছিল তিনটি খুব বিশ্বাসী চাকর। একদিন সে তাদেরকে ডেকে বলল : "তোরা দূর হয়ে যা। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ঘুমোতে যেতে আপত্তি করেছে।" তারা তখন তাকে ছেড়ে চলে গেল।

তারপর সে তার বউয়ের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে ঘুমোতে যেতে চাইলে, বউ বলল : "এখনো তো রাত্রি হয়নি।"

সে বলল : কিন্তু রাত্রি বলে তো এখানে কিছু নেই, এখানে সবটাই দিন।"

সর্দার সাপের মেয়ে তখন বরকে বলল : "আমার বাবার কাছে রাত্রি আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে ঘুমোতে চাও, তাহলে নদীব ধারে লোক পাঠাও এখানে রাত্রি নিয়ে আসার জন্য।"

ছেলেটি কাজে-কাজেই তার সেই তিন-অনুচরকে ডেকে পাঠাল। সর্দার সাপের মেয়ে তাদেরকে তার বাপের বাড়ীতে পাঠাল 'টুকুমা' গাছের বাদাম আনবার জন্য। ওরা বেরোল ডিঙি নৌকো নিয়ে।

সর্দার সাপের বাড়ীতে তারা গিয়ে পৌছল অবশেষে। সে তাদের হাতে বাদাম দিল খোলা বুঁজিয়ে ; বলল : "এই নাও কিন্তু সাবধান! পথে কক্ষণো খুলো না যেন ; যদি খোল তবে কিন্তু হারিয়ে যাবে তোমরা সবাই!"

নৌকোয় করে বাদাম বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তারা হঠাৎ তার ভেতর থেকে একটানা একটা শব্দ শুনতে পেল : "ট্যান্ ট্যান্ ট্যান্,ট্যান্ ট্যান্ ট্যান্—আওয়াজ-টা ঠিক রাত্রিবেলায় ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাকের মতন শুনতে!

কিছুক্ষণ দাঁড় টানার পর তিনজনের মধ্যে একজন সঙ্গীদেরকে বলল : "এটা

কিসের শব্দ ? চল আমরা দেখিই না একবার বাদামের খোসা খুলে ?"

কিন্তু ওদের সর্দার আপত্তি করল : উঁহু কক্ষণো না তাহলে আমরা সবাই হারিয়ে যাব। জোরে দাঁড় চালাও।"

দাঁড় বাইতেই লাগল ওরা। আর সেই শব্দটাও হয়েই চলল। তারা কোনো ধারণাই করতে পারল না সেটা যে কিসের শব্দ। অবশেষে যখন তারা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে, তখন তারা ডিঙির মধ্যিখানে জড় হলো 'টুকমা' গাছের বাদামের মধ্যে কি আছে তা দেখার জন্যে।

ওদের মধ্যে একজন আগুন জ্বালল। 'টুকুমা' গাছের বাদামের খোলার উপরের গর্তটাকে যা দিয়ে বোঁজানো ছিল ওবা সেটাকে গলিয়ে খুলে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল সেখানে গাঢ়, অন্ধকাব বাত্রি।

ওদের সর্দার চেঁচিয়ে উঠল : "আমবা হারিয়ে গেলাম ! বাড়ীতে মনিব ঠাকরুণ ঠিক জেনে গেছেন যে আমরা 'টুকুমা-বাদাম' ভেঙে ফেলেছি।" ম্লানমুখে অন্ধকারের মধ্যেই-দাঁড় বাইতে লাগল তিনজনে।

ওদিকে বাড়ীতে মেযেটি ওর বরকে বলল, "ওরা নিশ্চয় রাত্রিকে বের করে ফেলেছে ! এখন আমাদের ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।"

এদিকে তখন জঙ্গলের মধ্যে যত-সব জিনিষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল তারা পশু-পাখিতে পরিণত হতে লাগল। নদীর জলে ছিল যে-সব জিনিষ সেগুলো হলো হাঁস, মাছ এইসব। ডিঙি নৌকোটি হয়ে গেল একটা পাতিহাঁস। নৌকোর গলুইটা হয়ে গেল হাঁসের মাথা ; দাঁড়গুলো হয়ে গেল হাঁসের পা ; আর ডিঙির গা হয়ে গেল হাঁসের শরীর।

সর্দার সাপের মেয়ে দেখল আকাশে শুকতারা উঠেছে ; স্বামীকে ডেকে সে তখন বলল, "ভোর হয়েছে। আমি দিন আর রাতকে আলাদা করে দেব এবারে।" তারপর সে একটা সরু সুতোকে গুলি পাকিয়ে নিয়ে বলল : "আজ থেকে তুমি হলে কুজুবি পাখি, ভোব বেলায় গান গাইবে তুমি। এইভাবে কুজুবির জন্ম হলো : সাদা মাটি দিয়ে তার সাদা মাথা তৈরী হলো, উরুকু দিয়ে তার পা দুটো লাল রঙে রাঙানো হল। নাগকন্যা তাকে বলল : "এরপর থেকে যখনই ভোর হবে, তুমি গান শোনাবে।"

আবার সে একটি সুতো নিয়ে গুলি পাকাতে লাগল, বলল : "তুমি হও ইনাম্বু পাখি।" একটু পোড়া ছাই তুলে নিল সে তাই দিয়ে গুলিটা ঘষতে-

ঘষতে বলল : "তুমি হবে ইনাম্বু, তুমি গান শোনাবে সন্ধ্যেবেলায়, রাত্রিবেলায়, মাঝরাতে, শেষরাতে আর ভোরে।"

তখন থেকে এই পাখিরা বাঁধা সময়ে গান গেয়ে থাকে ; আর তখনই দিনকে ঝক্‌ঝকে করে তুলতে ভোর আসে।

তিন অনুচর যখন ফিরে এল, সর্দার সাপের জামাই বলল : "তোরা আমার বিশ্বাস ভেঙেছিস, তোরা রাত্রির বাঁধন খুলে দিয়েছিস। সব কিছু হারিয়ে যাবার জন্য তোরাই দায়ী। তাই এখন থেকে তোরা বাঁদর হয়ে গেলি ববাবরের জন্য। তোরা এবার থেকে গাছে থাকবি।" রাত্রির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে বাঁদর-দেরও আবির্ভাব হলো ॥

॥ তিন ॥ রাত্রি চুরি হল ॥

[তেনেতেহারা রেড ইণ্ডিয়ানদেব লোকপুবাণ]

অনেকদিন আগের কথা : সূর্য তখন সারাদিনই আকাশে থাকত তাই রাত্রি বলে তখন কিছুই ছিল না। কাজে-কাজেই তেনেতেহাবারা সারাদিন ধরেই ঘুমোত। সেই সময়ে গহীন্ এক বনে থাকত এক থুন্‌থুনে বুড়ী। রাত্তিরটা ছিল তার সম্পত্তি, খান কতক বাসন-কোসনের মধ্যে সে পুরে রাখত সেটাকে। আর মকয়ানি ছিল এক দারুণ দৌড়বাজ ছোকরা। তা সে একবার ঠিক করল বুড়ীর কাছ থেকে রাত্রি চুরি করে আনবে।

গেল মকয়ানি জঙ্গলের মধ্যে বুড়ীর বাড়িতে। ঠাকুমা ডেকে মকয়ানি তাকে শুধোল রাত্রি দেবে কি-না ? বুড়ী ওকে বাসনগুলো দেখাল, একটা তার থেকে বেছেও নিতে বলল। মকয়ানি নিল ছোট্ট একটা পাত্তর তুলে। তুলে নিয়েই মারল আছাড়—আর অমনি অন্ধকার বেবিয়ে এল, সঙ্গে এল পেঁচা আর বাদুড়। রাত্রির পিছু-পিছু ছুটল মকয়ানি। কিন্তু নিজের গাঁয়ে গিয়ে যখন পৌঁছুল সে, তখন রাত্রি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ফের ; চারদিকে ঝক্‌ঝকে সেই দিনের আলো।

গাঁয়ের লোকের কাছে সব ব্যাপারটা খুলে বলল মকয়ানি। তারা ওকে বলল, ও যেন আর একবার যায় বুড়ীর বাড়িতে সেই জঙ্গলে। গেল মকয়ানি। এবারেও বুড়ী ওকে একটা পাত্তর বেছে নিতে বলল। ও নিল এবার একটা বড মাপের হাঁড়ি। সেটাকে আছড়ে ভাঙতেই বেরিয়ে এল অনেক বেশি অন্ধকার আগের বারের চেয়ে। মকয়ানি ছুটতে লাগল গাঁয়ের দিকে, কিন্তু রাত্রি পিছন

থেকে এসে ধরে ফেলল ওকে, তার পর কাটিয়ে এগিয়ে গেল গাঁয়ের দিকে। তখন মকয়ানি হয়ে গেছে একটা পাখি।

আজও লোকেরা নিশুতি রাতে জঙ্গলে থেকে ভেসে আসা সেই পাখির গান শুনতে পায়॥

॥ চার ॥ মৃত্যুর জন্ম ॥

[ইয়াকুৎ রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকপুরাণ]

আগে মানুষের মৃত্যু ছিল না। পরে কয়োটের জন্যে মানুষ মরতে আরম্ভ করল। কয়োটের দু হাতে কোনো আঙুল ছিল না; সেজন্যে তাঁর ইচ্ছে ছিল মানুষের হাতও যাতে ঐ রকম হয়। কিন্তু একটা গিরগিটি কোথা থেকে হাজির হয়ে বলল: "উহুঁ, মানুষদের হাত হবে আমার মতো পাঁচ-আঙুলে।" কয়োটে তখন বললেন: "ঠিক আছে, তাই হবে; কিন্তু তাহলে মানুষ আর চিরকাল বেঁচে থাকতে পাবে না, তাদেরকে এবার থেকে মরতে হবে।" সেই থেকে মানুষের দুহাতের পাঞ্জায় পাঁচটা করে আঙুল হল, আর তার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী হল॥

[কয়োটে রেড ইণ্ডিয়ান লোকপুরাণের একটি বিশেষ ধরণের চরিত্র; ঠিক দেবতা নয়, অথচ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নানা-কিছু পার্থিব বস্তু সৃষ্টি করেছেন ইনি। এই চরিত্র মানবমূর্তি বা অর্ধপশু-অর্ধমানব মূর্তিতেও দেখা দেন। সংস্কৃতি-পত্তনকারী [কাল্‌চার হিরো] কিংবা চতুরাল [ট্রিক্‌স্টার] হিশেবেই ইনি সর্বদা পরিচিত। অ্যাপাচে রেড ইণ্ডিয়ানরা প্রেইরী অঞ্চলেব নেকড়ে বাঘকে কয়োটে বলেন।]

॥ পাঁচ ॥ সব-মানুষের মা ॥

[ওকানাগোন রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকপুবাণ]

আদ্যিকালে বুড়ো কর্তাবাবা পৃথিবীকে তৈরী করেছিলেন একটি মেয়ের শরীর থেকে। কর্তা বলেছিলেন, সে-ই হবে সমস্ত মানুষ জাতের মা। এইভাবে ধরলে অবিশ্যি, পৃথিবী এক সময়ে মানুষ ছিল, আর এখনো সে বেঁচে আছে। তাকে যদিও আমরা আর মানুষের চেহারায় দেখতে পাই না। সে যাই হোক,

তার কিন্তু হাত-পা-মাথা-ফুস্‌ফুস্‌-হাড়-মাস-রক্ত—সবই আছে।

পৃথিবীর মাটিটা হল তার গায়ের মাংস, পৃথিবীর জল হল তার রক্ত, গাছ-পালা হল তার চুল, তার হাড় হচ্ছে পাথরগুলো, আর বাতাসই তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

এইভাবে সে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। আমরা তার গায়ের ওপরেই শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে থাকি। যখন তার শীত করে, সে কাঁপে, কুঁকড়ে যায়: গরম লাগলে ছড়িয়ে বেড়ে যায় গায়ে-গতরে আর ঘামতে থাকে সে। তার নড়াচড়াতে হয় ভূমিকম্প।

আদ্যিকালে কর্তাবুড়ো যে মেয়ের গা থেকে খানিকটা করে মাংস নিয়ে কাদা-মাটির তাল পাকানোর মতো কয়েকটা গোলা করেছিলেন, আব সেগুলোই হয়ে দাঁড়াল মানুষ আর অন্য সব জীবজন্তু॥

॥ ছয় ॥ প্রজ্ঞার জন্ম ॥

[ডিয়েগুয়েনো রেড ইণ্ডিয়ানদের লোকপুরাণ]

ধরিত্রী ছিল নারী, জল ছিল পুরুষ। ধরিত্রী ছিল জলেতলে বিলীন। চাকোপা আর চাকোমাট নামে তাদের দুটি ছেলে হল। দুই ভাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে জলকে ঠেলে তুলতে লাগল। যতক্ষণ অবধি না সৃষ্টি হল আকাশের। তখন তারা দাঁড়াল পৃথিবীর মাটিতে। আর হ্যাঁ, ছোট ভাই চাকোমাট ছিল জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন।

প্রথমে তারা তৈরী করল সূর্য, তারপরে চন্দ্র, তারো পরে নক্ষত্রমণ্ডলী। চাকোমাট একটা কাদার চাকতি বানিয়ে ছুঁড়ে দিল পশ্চিম আকাশে; দুবার ছুঁড়ল, দুবারই পিছলে নেমে এল সেটা। ছুঁড়ল দক্ষিণে—ঐ দুবার, সেদিকেও সেটা স্থির হয়ে রইল না, নেমে এল। একই ব্যাপার ঘটল উত্তর আকাশে দুবার ছুঁড়ে দেবার পরও। কিন্তু পূবে যখন ছুঁড়ল, তখন আর অত তাড়াতাড়ি চাকতিটা পিছলে নেমে এল না। চাকোপা বলল যে ওটা বড্ড গরম, কাজেই আরো ঠেলে তুলে দিল যে কাদার চাকাটাকে। বারবার তিনবার চাকতিটাকে তুলে দেওয়া হল ওপরে, আরো ওপরে, তারো ওপরে। তখন গরমও লাগল কম। ঠিক একই ভাবে চাঁদকে বসানো হল আকাশে। কিন্তু চাঁদ আবার বড্ড

ঠাণ্ডা! কাজে কাজেই তিনবারে তাকেও দফায়-দফায় ওপরে তুলল দুই ভাই; অবশেষে চাঁদ বসল তার নিজের জায়গায়।

টুকরো-টুকরো মাটির ঢেলা আকাশের চারিদিকে ছুঁড়ে দিতেই তারা হয়ে গেল নক্ষত্র। তার পরে মানুষ তৈরীর পালা; ঐ কাদা থেকেই। কাদার ওপরে ঘুমিয়েছিল তারা। তার পরে তারা জীবন্ত হয়ে উঠল; প্রথম মানুষ জীবন পেলে উইকামি পাহাড়ের কোলে।

মানুষেরা ঠিক করল উৎসব করবে একটা। ঝাড়ু বেঁধে-বেঁধে সেজন্যে তারা একটা বেড়া দেওয়া জায়গাও ঠিক করল। ওদের দূত গেল সমুদ্রের গভীরে মহানাগ উমাই-হুহল্যা-উইটকে নিয়ে আসতে। কিন্তু হায়! ঝাড়ুর বেড়া-ঘেরা জায়গার মধ্যে তার পুরো শরীরটা কিছুতেই ঢুকল না। দুদিন ধরে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভিতরে পুরোপুরি ঢোকবার চেষ্টা করল মহানাগ। এদিকে তিন দিনের দিন সকালে লোকেরা আগুন লাগিয়েছিল। তার বাইরে পড়ে-থাকা শরীরটায়। পুড়ে খাক্ হল মহানাগ—বিশাল দেহটা ফেটে-ফুটে একেবারে চৌচির হয়ে বেরিয়ে এল সমস্ত জ্ঞান—সঙ্গীত, যাদুর গোপন রহস্য, উৎসবের প্রথা, ভাষা—এই সব কিছু। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সেগুলি; দেশবিদেশের মানুষ তাদের ওপর অধিকার অর্জন করল সেই থেকে॥

[ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলের আদিবাসী এরা; নিজেদের উচ্চারণে 'ডাইয়ে-গ্যে——নাইয়ো;' উইকামি পাহাড়ে প্রথম মানব মানবীর সন্তানেরা জন্মায় বলে এদের বিশ্বাস। কান পাতলে সেখানে নাকি নানা ভাষার কথা ও গান শোনা যায় মৃতদের কণ্ঠে। ছোট ভাই চাকোমাট নোনাজলে অন্ধ হয়েছিল; সেই হল নাকি শয়তান।

॥ এক ॥ সূর্য ওঠে কেন ॥

[মেক্সিকোর আজটেকদের লোকপুরাণ]

চাঁদের দেবী মেট্‌জ্‌তিল চাইলেন পৃথিবীকে রাত্রির অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে। বলি না দিলে সূর্যকে ওঠানো যাবে না যেহেতু, তাই দেবী ধরে আনলেন রাত্রির আকাশের দেবতা নানাহুয়াটল্‌কে বলি দেবার জন্যে। তার আবার সারা গায়ে ছিল অজস্র ক্ষত, যেগুলো তারা বলেই পরিচিত। বিরাট এক চিতায় চড়ানো হল নানাহুয়াটল্‌কে। আগুন জ্বলে উঠলে মেট্‌জ্‌তিল নিজেও তাতে ঝাঁপ দিলেন। তারাভর্তি আকাশ আর চাঁদ এই ভাবে রোজ চিতায় ঝাঁপ দেন বলেই ত সূর্য উঠে চারিদিকে আলো দেন ॥

॥ দুই ॥ প্রপিতামহদের কথা ॥

[গুয়াতেমালার 'পোপোল ভুঃ' গ্রন্থে সংকলিত লোকপুরাণ]

দেবতারা সৃষ্টি করলেন চারজন মানুষ: বালামকুইৎজ্‌য়ে, বালাম-আগাব, মাহুকুটাঃ আর ইক্‌ইবালাম। প্রথম তিনজন হল কিচে জাতের প্রধান তিন গুষ্টির আদিপুরুষ। অন্যজনের কোনো বংশ থাকেনি। শুধুমাত্র প্রথম জনের বংশ কাভেক কিচে, দ্বিতীয়ের নিহাইব কিচে আর তৃতীয়ের আহউ কিচেরাই যে পৃথিবীতে জন্মেছিল, তা নয়; ইয়াকুই মানে মেক্সিকোর লোকেরাও ছিল আর পূবদেশের অন্যসব জাতিগুষ্টি জাতেরাও ছিল পৃথিবীর বাসিন্দে।

কর্তাবাবারা কিচেদের জন্ম দিলেন নিখুঁত করে। এতই ছিল তাদের বোধবুদ্ধি যে দেবতারা ভয় পেয়ে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সব চাকা চাপা দিয়ে দিলেন যেন! তার বদলে তাঁরা তাদেরকে একটা করে বউ দিলেন। কিন্তু তখন না ছিল সূর্যের আলো, না ছিল ধর্মকর্ম করার স্বস্তি। বউ নিয়ে কিচেদের থাকতে হত ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই। যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে হাজির হল তুলান-জ্‌উইভায়। সেখানে তিনি গুষ্টির আলাদা আলাদা দেবতা মিলল। তিন গুষ্টির দরকার হল আগুন; তখন বাজ বিজুলির দেব্‌তা তোহিল দু'পায়ের চক্‌মকি পাথর বসানো জুতো ঠুকে আগুন তৈরী করে দিলেন তাদের।

অন্য সব জাতের লোকেরা এসে কিচেদের কাছে এসে আগুন চাইল। কিন্তু ক্সিবালবা থেকে বাদুড় এল দূত হয়ে। দেবতারা কিচেদের হুকুম পাঠিয়েছিলেন যে, অন্য সব জাতের মেয়েরা যদি তাঁদের সঙ্গে "কোমরের কষির আর বগলের নীচে" মিলিত হতে রাজি হয় তবেই যেন তারা তাদেরকে আগুনের ভাগ দেয়। কাকচিকৃওয়েলদের বাদুড় দেবতা আগুনের বীজ চুরি করে এনে দিয়েছিলেন বলেই তারা দেবতাদের অবাধ্য হতে পারল, অন্য পক্ষে আর সব জাতই এতে রাজি হল। কিন্তু এই ধাঁধার মতো শর্তের পূরণ করতে হলে তাদের উৎসর্গ করতে হোত বুকের কলজে। কাজে কাজেই সবাই তুলান-জ্‌উইভা ছেড়ে চলল গুয়াতেমালার দিকে।

পাহাড়ের ধারে সকলে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ভোর হবার জন্যে। সূর্য ওঠার আগে উঠল শুকতারা। তারপর যখন আকাশের গন্‌গনে আলো এসে হাজির হলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল তিন গুষ্টির দেবতারা। কিচেদের কর্তাবাবারা সংসার থেকে সরে গেলেন তপস্বী হয়ে নির্জন আস্তানায়। মাঝে শুধু গহন বনের মধ্যে দেব্‌তাদের সঙ্গে কথা কইতে দেখা যেত তার পর থেকে।

এরপর চালু হল মানুষ-বলির রেওয়াজ। পড়শীদেব মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও শুরু হল। কিচেদের দেব্‌তাদের কেড়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তাদের পাহাড়ঘেরা রাজ্যে হানা দিল অন্যেরা—অবশ্য তারা হটেও গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে। কিচেদের কর্তাবাবাদের মরবার তিথি তখন প্রায় এসেই গিয়েছিল অবশ্য। প্রথম সূর্য উঠলে সবাই মিলে যে গান ধরেছিল, সেই গান ফের গাইতে বললেন তাঁরা। তার পর থেকে তাঁদেরকে আর দেখা যায় না। যাবার আগে তাঁরা রেখে গিয়েছেন এক বোঁচ্‌কা ওষুধ-বিষুদ বংশধরদের রোগ বালাই যাতে সারে, সেই

[যে সাংকেতিক ভাষায় দেবতাদের সঙ্গে অ-কিচে মেয়েদের মিলিত হবার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য অবশ্য খুব জটিল নয়। স্পষ্টতই সঙ্গত হবার কথা বলা হচ্ছে এর মাধ্যমে]

।। তিন ।। বিরকোচার কথা ।।

[পেরুর ইন্‌কাদের লোকপুরাণ]

টিটিকাকা হ্রদ থেকে উঠে এসেছিলেন বিরকোচা দেব। সে যে কতকাল আগে, তা অবশ্য কেউ জানে না। কেননা তখন কারুরই জন্ম হয়নি। আকাশ,

আকাশের চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা— সবই হয়েছে তার পরে। বিরকোচা দেবই তাদের গড়েছেন। টিটিকাকার জল থেকে পৃথিবীও।

বিরকোচা ঠাকুরের নাম আসলে অনেক বড: কন-টিক্সি-বিরকোচা-পাচাইয়াচাচিক। এর মানে হল কর্তা, পুবোনো বনেদ, দুনিয়ার গুরু। কেউ আবার বলে ওঁর নামের মানে হচ্ছে, জলেব ফেনা।

চাঁদ-সূর্য-গ্রহ এই সব তৈরী করার পরে বিরকোচা দেব পৃথিবীর মাটি নিয়ে প্রথম মানুষদেব চেহাবা গডে তাদেব জ্যান্ত করে তুললেন। তাদের চেহারা ছিল বিরাট, কালো নিকষ ছিল গায়ের রং। ততদিনে আকাশেব চাঁদ-সূর্য-এই সবকেও তিনি চালিয়ে দিয়েছেন নিজেব-নিজের মতো করে। প্রথম মানুষদের ওপব বিবক্ত হয়ে ঠাকুর বিরাট বানের জলে তাদেরকে ভাসিয়ে দিলেন। তাবপরে পাথর কেটে-কেটে তৈবী করলেন আমাদেব মতো মানুষ আর তাদের হুকুম কবলেন ওঁব পিছু-পিছু কুজ্‌কোতে গিয়ে রাজধানী বসাতে। সেখানে গিয়ে তিনি অল্‌কা ভিকাকে করলেন আমাদের প্রথম রাজা। কুজ্‌কোতে রাজাকে বসিয়ে বিবকোচা আমাদেব পেরু দেশ জুড়ে ঘুবে-ঘুরে সব আইন-কানুন শেখালেন মানুষজনকে। মুখেব ভাষা, গান, ভাল-মন্দ,উচিত-অনুচিত, হাতেব কাজকর্ম সব কিছুই শিখলেন আমাদের কর্তাবাবাবা। চাষবাসের শুরু হল তখন থেকে। সব কিছু শিখিয়ে-পডিয়ে দেবতা গেলেন পশ্চিম দিকে। তিনি নাকি বলে দিয়েছিলেন আবার ফিবে আসবেন। কেউ আবার বলে যে তিনি টিটিকাকাব জলেব তলায বরাবরের মতো চলে গেলেন। আবার এমনও বলা হয় যে, বরাবরেব মতো নয়—তিনি এক সময়ে উঠে আসবেনই: তাঁকে চিনতে পারা যাবে জলেব গাছপালাব মতো দাডি-গোঁফ দেখে—আর তাঁর গায়ে হাড়-মাংস থাকবে না। আদ্যিকালেও নাকি তাঁকে ঐ রকমই দেখতে ছিল॥

[স্বয়ং বিরকোচা ফিরে এসেছেন ভেবে ইনকারা পেরু-বিজয়ী স্পেনীয় দস্যুনেতা পিজারো এবং তাঁর বাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, শোনা যায়]

॥ চার ॥ মিলোমাকির বাঁশি ॥

[ব্রাজিল-কলাম্বিয়ার নরখাদক ইয়াহুনা গোষ্ঠীর লোকপুরাণ]

অনেক-অনেক বছর আগে সূর্যের দেশ—যেখানে বিরাট জলের বাড়ি—সেখান থেকে মিলোমাকি নামে একটা ছোট ছেলে নেমে এসেছিল। এত ভাল গান গাইত মিলোমাকি যে ঝাঁক বেঁধে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরত সেই

গান শোনবার জন্যে। তাকে দেখার জন্যেও। কিন্তু গান শুনে বাড়ি-ফেরার পর যদি কেউ মাছ খেত, সঙ্গে-সঙ্গে ঘটত তার মৃত্যু। এইভাবে যারা মারা গিয়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজনেরা মিলোমাকিকে একদিন পাকড়াও করে ফেলল। ততদিনে সেও যুবক হয়েছে। মিলোমাকি তাদের আপনজনদের মৃত্যুর উপলক্ষ হয়েছে. কাজেই সে তাদের চোখে অতি বিপজ্জনক লোক। ওরা তাকে এক বিরাট চিতায় চাপিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চাইল অতএব।

কিন্তু চিতায় চড়ানোর পরও মিলোমাকি গান গেয়েই চলল: "আমি এখন মরলাম, এখন আমি মরছি, মরছি এখন আমি, খোকন আমার, দুনিয়া থেকে যাচ্ছি এখন চলে।" আগুনের ভাপে যখন সারা গা ফেটে-ফেটে যাচ্ছিল, তখনও তার গান থামে না; মিষ্টি সুরে মিলোমাকি গেয়ে চলে: "শরীর আমার ছিন্নভিন্ন, এবার আমি মরছি!" তারপরে ওর শরীর একেবারে ফেটে ছত্রখান হয়ে গেল। আগুনে মিলোমাকির ফুটি-ফাটা শরীরটা গ্রাস করে ফেলল, তার আত্মা উঠে গেল স্বর্গের দিকে। যেখানে তার শরীর পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল, সেখানে ছড়িয়ে-থাকা ছাইয়ের পাঁজা থেকে সেই দিনই গজিয়ে উঠল একটা সবুজ, লম্বা ফলা, ধীরে-ধীরে সেটা হয়ে উঠতে লাগল বড়, আরও বড়, আরও, আরও। পরের দিনই সেটা হয়ে গেল একটা লম্বা, উঁচু তালগাছ। পৃথিবীর প্রথম তালগাছ.........

এই গাছের কাঠ দিয়ে লোকে এরপর থেকে বাঁশি বানাতে লাগল। ঠিক মিলোমাকির গলায় যেমন মিষ্টি সুর শোনা যেত, সেই রকম সুরই বাজত সে-সব বাঁশিতে। তারপরে আরও কথা রইল। আজও যখন গাছের ফল পাকে, তখন পুরুষেরা দল বেঁধে ঐ বাঁশি বাজায় আর নাচে, এই সব ফলের স্রষ্টিকর্তা আর দাতা মিলোমাকির স্মৃতিতে। মেয়েদের আর ছোটদের কিন্তু ঐ বাঁশি দেখা বারণ। দেখলে, তাদেরকে আর বাঁচানো যায় না॥

[তালগাছ—ইংরাজীতে আছে Paxiuba Palm, বাংলায় যার প্রতিশব্দ পাওয়া দুরূহ বলে 'তালগাছ' বলছি]

॥ পাঁচ ॥ মেয়ে-পুরুষ ॥

[দক্ষিণ আর্জেন্টিনার ইয়াঘান আদিবাসীদের লোকপুরাণ]

আদ্যিকালে পুরুষেরা চলত মেয়েদের শাসন মেনে। বাড়ির কাজকর্ম পুরুষেরাই করত, নৌকোর গলুইতেও বসত তারাই। মেয়েরা যে ছেলেদের দাবিয়ে রাখতে পারত, তার কারণ তারা যে একটা বিরাট কুঁড়ে ঘরে থাকত, সেখানে পুরুষেরা ঢুকতে পেতনা। ঐ কুঁড়ের ভেতরে মেয়েদের দল ছুঁচলো চেহারার কাঁধছোঁয়া মুখোস পরে ভূতপ্রেতদের নকল করত আর তাতেই বাইরে থেকে পুরুষেরা সিঁটিয়ে যেত ভয়ে।

ঐ-সব মেয়েদের এবং তাদের কুঁড়েতে যে-সব ভূতপ্রেত বাস করত বলে মনে করা হত—তাদের সকলের জন্যে লেমকে শিকার করে খাবার জোগাড় করতে হত। একদিন শিকার সেরে ফেরবার সময় লেমের নজরে পড়ল দুটি মেয়ে পুকুরের পাড়ে বসে-বসে গায়ের মাখানো-রঙ ধুচ্ছে। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে লেম ওদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। মেয়েদুটোর কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনতে লাগল ও। বড় কুঁড়ের ভেতরে ওরা কি-কি করে আর কেমন করে পুরুষ-মানুষদের বোকা বানায় সেই সব কথাবার্তাই হচ্ছিল তাদের মধ্যে। শুনতে শুনতে হঠাৎ লেম যেই-না ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়ে দুটোর ওপর, অমনি তারা হয়ে গেল দুটো মাদী হাঁস।

পুরুষদের আড্ডায় ফিরে লেম বলল সমস্ত ব্যাপার। সুতরাং সবচেয়ে ছোট্ট মাপের আর সকলের চেয়ে জোরে দৌড়তে-পারা লোকটাকে তারা পাঠাল মেয়েদের কুঁড়েতে। বেঁটে দৌড়বাজ সমস্ত মুখোসগুলো ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে লাফ-ঝাঁপ করে যেই দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেল জলার পাখি।

এর পরে গেল বাকি পুরুষদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেঁটে আর সবচেয়ে জোরে দৌড়য়; তারও পরিণাম ঘটল আগের লোকটার মতোই। এইভাবে পুরুষ-মানুষেরা একের পর গেল কুঁড়ে ঘরের মধ্যে। বাকি রইল শুধু দৌড়ের বেলায় থপ্‌থপে লোকেরা। যেই একজন করে কুঁড়ে থেকে বেরোচ্ছে অমনি মেয়ের দল তাদের পেছনে তীর কিংবা বল্লম ছুঁড়ে মারছে আর সেটা হয়ে যাচ্ছে লেজ, লোকগুলো হয়ে যাচ্ছে একটা-না-একটা জন্তু। থপ্‌থপে দৌড়বাজ পুরুষেরা তখন গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে লড়াই শুরু করল। কিন্তু দুজন বাদে তারাও সবাই

হয়ে গেল এক একটা জন্তু। কুঁড়েতে ইতিমধ্যে আগুন ধরে গেল; লেম গামলা-গামলা জল এনে তার ওপর ঢালতেই বিরাট এক ঢেউ উঠল—ভেসে গেল অনেক জীবজন্তু। তারাই হল সমুদ্রের প্রাণী।

তখন লেম, তার ভাই রামধনু আর ভাইয়ের বউ চাঁদ উঠল আকাশে লেম হল সূর্য। মানুষ যারা টিঁকে রইল তাদের প্রায় সকলেই কচি-কাঁচা, গুণতিতেও মাত্র কজন। পুরুষ মানুষে ততদিনে মেয়েদের লুকিয়ে রাখা গোপন কথার খোঁজ পেয়ে গেছে; তখন থেকে সেই রহস্যের হদিশ রইল তাদেরই হাতে। পুরুষ-মানুষ তখন থেকেই হল কর্তা, আহার-বিহার, সব কিছুর সময়েই তারা থাকতে আরম্ভ করল মেয়েদের ওপরে। তার আগে ব্যাপারটা ছিল ঠিক এর উল্টো॥

[লেম নামও হতে পারে, 'মদ্দা পাতিহাঁস' হওয়াও অসম্ভব নয়, বিশেষত যেখানে প্রথম মেয়েদুটি মাদী পাতিহাঁসে পরিণত হচ্ছে।]

॥ এক ॥ গিরগিটির গল্প ॥

॥[অস্ট্রেলিয়ার আরাণ্ডা আদিবাসীদের লোকপুরাণ]

প্রথম মানুষ ছিল গিরগিটির মতো দেখতে। কিন্তু এতই শক্ত ছিল তার সারা শরীর, যে সে আর নড়া-চড়াই করতে পারত না। কাজেই রোদ্দুরের তলায় গা-মেলে শুয়ে থাকত সে। নিজের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল: "আরে আমি যে একটা গিরগিটি!"

সুতরাং সে শুয়েই রইল রোদের মধ্যে। খানিক পরে সে দেখল ওর শরীর থেকেই আর একটা গিরগিটি বেরিয়ে এল। সেটাও শুয়ে রইল তার পাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গা থেকে অনেকগুলো গিরগিটি বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একটা আবার মরেও গেল। ও বলল: "এটা আমিই।" আর তার খানিক বাদে সব গিরগিটিগুলোই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল মানুষের মতো।

সূর্য-ডোবার দিকের জাতিরা আবার বলে ম্যাঙ্গার-কুঙ্গার-কুঙ্গা নামে প্রথম গিরগিটি বড়ো সমুদ্দুরের জল থেকে মানুষদের তুলে এনেছিল অনেককাল আগে। পাথরের ছুরি দিয়ে সে তাদের চোখ, কান, নাক, মুখ আর অন্যান্য সব গায়ের ফুটো করে দিয়েছিল, আর শিখিয়েছিল কেমন করে আগুন জ্বালাতে, বল্লম বানাতে, ঢাল তৈরী করতে, বুমেরাং গড়তে হয়। আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুর পিছনেই আছে গিরগিটি॥

[স্পষ্টতই গিরগিটি এখানে একই সঙ্গে টোটেম এবং কালচার-হিরো]

॥ দুই ॥ তাইপানের বিধিনিষেধ ॥

॥[অস্ট্রেলিয়ার উইক্‌মুনকুন জাতির লোকপুরাণ]

তাইপান দেবতার ছেলে নিয়ে পালিয়েছিল নীলজিভ গিরগিটির রূপসী বউকে। রাগে আগুন হয়ে গিরগিটি বেরোল তাদেরকে খুঁজতে। এখানে, ওখানে, নানাখানে খোঁজাখুঁজি করতে-করতে অবশেষে ওদেরকে ধরে ফেলল এক সময় অনেক দূরের এক মুল্লুকে গিয়ে। বউচোরের কলজে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে

এল গিরগিটি ; ও সেটা এনে দিল খোদ তাইপানেরই হাতে তার ছেলের গুণপণা দেখাতে।

তাইপান ছেলের কলজের সমস্ত রক্তটুকু নিংড়ে নিয়ে, সেটা দিল মানুষকে। মানুষের শরীরের শিরায়-শিরায় যে রক্ত বয়, তা হল ঐ কলজের রক্ত। তাই-পানের হুকুমেই সেই রক্তের চলাফেরা। মেয়েদের শরীরে চাঁদের বাড়া-কমার হিশেবে রক্ত যা ঝরে, তাও হয় তারই হুকুমে। নীলজিভ গিরগিটির বউয়ের জন্যে সব মেয়েকে সেই শাস্তি পেতে হয়।

সব রোগব্যামো-সারানো জাদু জানত তাইপান। মেয়ে-পুরুষের শরীরের সম্বন্ধ কেউ যদি আইন না-মেনে গড়ে, তখন তাইপানের রাগ জ্বলে ওঠে। ঐ রকম সম্বন্ধ গড়তে নেই—এমন কারুর সঙ্গে যদি সে রকম কিছু ঘটে, কিংবা অন্যের বউকে বা বউ-হবে এমন মেয়েকে যদি নিয়ে পালায়, তাহলে তাইপান সাতরঙা ফণা তুলে আকাশে ওঠে—লম্বা দড়িতে টক্‌টকে রাঙা বিজলীর বাঁকা-বাঁকা ছুরি ছুঁড়ে মারে সে তখন। আর আকাশে গুম্-গুম্ করে মেঘ ডাকে, বাজ পড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়।

যে মেয়েদের বাচ্চা হবে কিংবা যারা চাঁদের রক্তে ভিজে রয়েছে তারা তাই-পানের বড়ো পুকুরের জল ছুঁলে বিপদে পড়বেই। পুবের দিকের ওপরের এলাকায় ছোট বাচ্চারা—যাদের এখনও ছুনত্ হয়নি, তারাও ঐ জল ছোঁয় না, পাছে কালেরু এসে ধরে !!

[চাঁদের রক্ত অর্থে ঋতুরক্তঃ। সাত-রঙা ফণা অবশ্যই রামধনু। বড়ো পুকুর সম্ভবত সমুদ্র। কালেরু, হাঙর হওয়া সম্ভব]

।। তিন ।। সুপুরির জন্ম ।।

[নিউগিনির সেপিক নদীর উৎসভূমি-অঞ্চলের লোকপুরাণ]

এক লোকের ছিল দুই বউ। আর ছিল বাচ্চা-কাচ্চারা। একদিন 'লোকটা' দেখল নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে একটা সুপুরি। আর একটা লোক একটা ডোঙার ওপরে বসে কি-সব যেন করছিল সেই সময়, সেই-সব আওয়াজও শুনল আগের লোকটা—পরের লোকটাকে দেখতে পেল। দ্বিতীয় লোকটার নাক ছিল ভাঙা আর কুঞ্চিত। এই লোকটা আসলে এসেছিল সূর্যের দেশ থেকে।

প্রথম লোকটা হেঁকে জিজ্ঞেস করল : "আরে ভাই, কি করছ তুমি ওখানে ?" সুন্দর নাকওয়ালা পৃথিবীর লোকটাকে দেখল সূর্যের নাক-বিচ্ছিরি লোকটা। সে জবাব দিল : "আমি ডোঙা সারাচ্ছি। কিন্তু তুমি কোত্থেকে এলে বাপু ?" সুন্দর-নাক জবাবে বলল : "আরে, আমি ত জলে তোমার ডোঙার টুকরো (ও তখন সুপুরি চিনত না, কেন-না পৃথিবীতে সে জিনিষ সেই প্রথম দেখা গিয়েছিল) ভাসছে দেখে এদিকে এসে তোমাকেও দেখতে পেলাম।"

ঠিক এমন সময়ে সূর্যের লোকটার গা-থেকে একটা আলো বেরোতে লাগল। এই পৃথিবীর লোকটা সেই আলোর পিছু-পিছু চলতে লাগল। মেঘের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে শেষ অবধি ও গিয়ে পৌঁছুল সূর্যের দেশে। ওর নাক দেখে সেখান লোকেদের খুব ভাল লাগল। তারা সেখানেও ওর দুটো বউ জুটিয়ে দিল, ভাবল এতে ওর ছেলেমেয়েদেরও ওর মতোই সুন্দর নাক হবে। এক বউয়ের হল ছেলে, আরেকজনের হল মেয়ে। বাচ্চাদুটোর নাকও হল মানুষ-বাপের মতো সুন্দর। সূর্যদেবতার দেশের লোকেরা খুশি হল খুব। ওরা পৃথিবীর সেই লোকটাকে শুধোল যে নিচের মাটির দেশে তার বউ আছে কি না। আছে, শুনে ওরা ওকে পৃথিবীতে ফিরতে দিল যাতে সে আগের বউ-বাচ্চাদের ফের দেখতে পায়। পথে যাতে ও খেতে পারে সেজন্য তারা সঙ্গে দিল প্রচুর খাবার-দাবার। আর দিল সুপুরি। সেই ডোঙা-সারানো সূর্যের লোকটা ওকে পিঠে-করে পৃথিবীর মাটিতে আবার পৌঁছে দিয়ে গেল।

এদিকে লোকটার আগের বউরা ধরে নিয়েছিল, ও বুঝি মরেই গেছে। ওকে না চিনতে পেরে ভয় পেয়ে তারা শুধোল : "তুমি কে ?" ও বলল : "ভয় নেই, আমি-আমি !" সব কথা শুনে খুব খুশি হল বউরা আর ছেলেমেয়েরা। আর সুপুরির গাছ লাগাল মাটিতে ॥

।। চার ।। আগুন এল কোত্থেকে ।।

[পলিনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বৈপায়ন জাতির মধ্যে প্রচলিত লোকপুরাণ]

বহু বছর আগে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা-একা একটা ভরযুবতী মেয়ে। এমন সময়ে হঠাৎ তার সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল এক এক সাপ, ওকে বিয়ে করতে চাইল সে। মেয়েটা রাজি হল না প্রথমে

কিছুতেই। সাপ ওকে বোঝাতে লাগল যে, কেবল মাত্র তার চেহারাটাই সাপের, তা বাদে পুরুষ মানুষের মতো আর সব গুণই তার আছে। অবশেষে মেয়েটি রাজি হল তার কথায় !

তখন তাদের বিয়ে হল। দুটি ছেলেও হল ওদের। সাপ আনত সংসারের খাবার-দাবার জোগাড় করে। একদিন সাপের ইচ্ছে হল রাঁধা-খাবার খেতে। বউকে রান্না করতে বলল ও। সেদিন সূর্য নিভে গিয়েছে তখন। কাজে-কাজেই ওরা বসে রইল পরদিন সকালের জন্যে। কিন্তু রোদে-সেঁকা খাবার খেয়ে সাপের পছন্দ হল না। এক ছেলেকে সে বলল তার পেটের মধ্যে ঢুকে আগুন নিয়ে আসতে। ছেলে আগুন নিয়ে বাইরে এলে, তাতেই রান্না করল সাপের ভর-যুবতী বউ। মানুষ সেই থেকেই আগুনের ব্যবহার করতে শিখল ॥

॥ **পাঁচ** ॥ **রামধনু মামা** ॥

[ওশ্যেনিয়ার কোনো কোনো দ্বীপে প্রচলিত লোকপুরাণ]

এক সর্দার মরার আগে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ডেকে, দুটি ব্যাপারে সব সময়ে খেয়াল রাখতে বললেন। এক, সে যেন তার বোনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার কথা না ভোলে ; আর দুই, নিজে বিয়ে করার সময় যেন সে এমন মেয়েই পছন্দ করে যাতে সে মেয়ে এই দ্বীপেরই হয় আর ননদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

কিন্তু বাবা মারা যাবার পর ছেলেটি নিজের দ্বীপের কারুর বদলে বিয়ে করল অন্য একটি দ্বীপের মেয়েকে। বউটা ছিল বড়ই হিংসুটে ; বরকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে কান-ভাঙিয়ে সে পাঠাল ননদকে দ্বীপান্তরে !

নতুন দ্বীপে যাবার পর মেয়েটি নজরে পড়ল ওলোফ্যাট দেবতার। তাঁর দুটি ছেলেও তার কোলে জন্মাল। ছেলেদুটো একটু বড় হবার পর এল মামা-বাড়ির দ্বীপে বেড়াতে। তাদের মামা রামধনু চেষ্টা করতে লাগল কিভাবে খতম করা যায় ভাগনে দুটোকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না ; লড়াইতে জিতল ভাগনেরাই। তাদের মাও তখন নিজের বাপের দ্বীপে ফিরে এল। রামধনুর বদলে ওলোফ্যাটই তখন সেই দ্বীপের হর্তাকর্তা হয়ে উঠল। রামধনু মামার অবশ্য কোনো ক্ষতি হল না তাতে ; তাকে তাড়ানোও গেল না দ্বীপ থেকে ॥

॥ ছয় ॥ নারকেলের জন্ম ॥

[টোঙ্গাদ্বীপের লোকপুরাণ]

বন্ধুদের দ্বীপে থাকত একটা লোক আর তার বউ। তাদেব ছিল দুই মেয়ে। বউটার পেটে একটা ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল একটা বান মাছ। সে থাকত একটা পুকুরে।

একদিন দুইবোনের দিকে যেই-না সে আহ্লাদ করে সাঁতরে এগিয়ে এসেছে, অমনি ভয় পেয়ে তারা লাফ দিল সমুদ্রের ভেতরে। সেখানে সঙ্গে-সঙ্গে দুই বোন হয়ে গেল দুটো বিশাল-বিশাল পাথরের চাঁই। এখনো টোঙাটাবুর সমুদ্রতীরে পাথরদুটোকে দেখতে পাবে তোমরা।

বান মাছ মনের দুঃখে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে চলে গেল সামোয়া দ্বীপে। সেখানে গিয়েও সে একটা পুকুর খুঁজে নিয়ে তার মধ্যে থাকতে লাগল।

একদিন একটা বিয়ে না-হওয়া মেয়ে এল ঐ পুকুরে চান করতে কিন্তু বান মাছের পুকুর থেকে ওঠার পরই দেখা গেল যে পোয়াতী হয়েছে সে। সকলে বলল একজন্যে ঐ বানমাছই দায়ী। ওরা ঠিক করল শাস্তি দিতে মেরে ফেলবে ওকে।

বানমাছ মেয়েটাকে ডেকে বলল : 'মারা যাবার পর আমার মুণ্ডুটা চেয়ে নিও তুমি ওদের কাছ থেকে। মাটিতে পুঁতে দিও তারপর ওটা।' সেই পুঁতে-দেওয়া জায়গাটা থেকে আস্তে-আস্তে জন্মাল একটা নতুন গাছ। আমরা তাকে নারকেল বলি।

[বন্ধুদের দ্বীপ মানে টোঙ্গা আইল্যাণ্ড ; বানমাছ অর্থে ঈল্ মাছকে বোঝানো হয়েছে]

॥ সাত ॥ ফসল চাষের শুরু ॥

[ফিলিপাইনসের লোকপুরাণ]

এককালে মানুষের খাবার ছিল লুসাই নামে এক জাতের বাজরা আর এখন শুয়োরেরা যা খায়, সেই জুরির কন্দ। ক্যাগারাস বলে এক জায়গায় থাকতেন এই দুই খাবারের দুজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একদিন এক স্ত্রীলোক তাঁদের দর্শন করতে গেল। সে ফসল-বোনার রহস্য জানত বটে, কিন্তু দেবীরা কিছুতেই তাকে জোয়ার-জাতের কোনো শস্যদানা দিতে চাইলেন না। স্ত্রীলোকটি ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে।

কিছুদিন পরে দেবীরা পাইওয়ান থেকে এক ওঝাকে ডেকে পাঠালেন জোয়ার-ফলানোর কাজে তাঁদের সাহায্য করার জন্যে। সেই ওঝা দেবীদের নজর এড়িয়ে

এক ফাঁকে একটা জোয়ারের দানা আঙুলের নখের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে এল সেই স্ত্রীলোকটির কাছে। তখন থেকেই পৃথিবীর মানুষ জোয়ার আর নানান্ রকমের ফসল চাষ করতে শিখল ॥

॥ আদ্যিকালের কথা ॥

[ফিলিপাইনসের ব্‌গবো আদিবাসীদের লোকপুরাণ]

১. সৃষ্টির আদিতে সমুদ্র, মাটি এবং গাছপালা তৈরী করলেন ঈশ্বর। তারপরে, দুটি মাটির তাল নিয়ে মানুষের আকৃতি দিলেন তিনি। হাতের মৃদু চাপে-চাপে আদি মানব আর আদি মানবীর রূপ ধরল সে দুটি। পুরুষটির নাম হল টুগ্‌লে এবং নারীটির নাম হল টুগ্‌লিবং। ওরা একসঙ্গে থাকতে লাগল। টুগ্‌লে একটা মস্ত বড় বাড়িও তৈরী করল। ঈশ্বরের দেওয়া নানা রকমের ফসলের বীজও বুনল সে।

২. অনেকদিন আগে সূর্য পৃথিবীর ঠিক ওপরে ঝুলে থাকত। আদি মানবী মোনা, যাকে টুগ্‌লিবং-ও বলি আমরা, আকাশকে বলল : "তুমি বাপু একটু ওপরে উঠে যাও; এত নেমে এসেছ তুমি যে আমি ধান ভানতে পারছি না।" আকাশ অমনি উঠে গেল ওপরে।

৩. মোনা ছিলেন আদি মানবী, টুগলে ছিল আদি মানব। এক সময়ে পৃথিবীতে শুধু ঐ দুজন মানুষই ছিল। পরে তাঁদের ছেলে-মেয়ে হয় কয়েকটি। বড় ছেলের নাম ছিল মালাকি। বড় মেয়ের নাম ছিল বিয়া। এরা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে বাস করত।

৪. সেই আদ্যিকালে যখন সূর্য আর আকাশ নিচে ছিল, মোনা সূর্যের তাপ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে এক বিরাট গর্ত খুঁড়ে বাড়ীসমেত তার ভেতরে ঠাঁই নিয়েছিল। মোনার যখন অনেক বয়স সূর্য তখন উঁচুতে উঠে গেল। তখন তার আর টুগ্‌লিবং-এর ছেলেমেয়েরা জন্মেছিল।

৫. সৃষ্টির শুরুতে আকাশ পৃথিবীর এত গায়ে-গায়ে ঝুলে ছিল যে মানুষ কোনো কাজ করতেই পারত না। আকাশের এই ঝুলে-থাকার জন্যে মানুষেরা সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারত না। তাই পৃথিবীর মানুষ আকাশকে ডেকে বলল : 'উঠে এস।' তখন আকাশ উঠে সেখানে এল যেখানে এখন আমরা দেখি তাকে।

৬. টুগ্‌লে আর মোনা যেমন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু তৈরী করেছিল, তেমনই

তাদের তৈরী করেছিলেন ঈশ্বর। তারা তাঁকে দেখেছিল তাই ধান বুনতে শিখেছিল।

ওরা যেখানে থাকত, সেখানে থাকত একটা সাপও। সে ওদেরকে একটা ফল খেতে দিয়েছিল এই লোভ দেখিয়ে যে, ওটা খেলে ওরা সমস্ত কিছুই বুঝতে পারবে। লোভে পড়ে ফলটি খাওয়ায় ঈশ্বর ওদের ওপর রাগ করলেন। সেই থেকে তাঁকে আর কোনোদিন দেখতে পায়নি ওরা।

৭. এক জায়গায় ছিল একটা ফাঁপা গাছ, তার ভিতরে একদল মেয়েমানুষ বাস করত। এক রাতে তারা সবাই গাছটির ভিতর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এল। অনেক দূর থেকে একজন পুরুষ মানুষ তাদের দেখতে পেল। সে গিয়ে সঙ্গীদের এই কথা জানালে তারা সবাই মিলে এসে ঐ ফাঁপা গাছটিকে উপড়ে ফেলল আর বল্লম দিয়ে সমস্ত মেয়েদের হত্যা করল। তারপরে একজন মানাগানা নারী এসে একটি যুবতী মেয়ের নাভির অংশটা চাইলে পুরুষদের মধ্যে একজন সেটা খুঁজে পেতে বার করে দিল তাকে। বাকি সমস্ত মাংস তারা রান্না করল মাটির পাত্রে; খেয়েও ফেলল ভাগাভাগি করে।

মানাগানা স্ত্রীলোকটি সেই যুবতীর নাভিটি মাটিতে পুঁতে দিল আর তারপরে একটা মাটির তিজেল তৈরী করতে লাগল। হঠাৎ নাভিটি লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঘাসের ওপরে। স্ত্রীলোকটি তার ছেলেমেয়েদের বলল তাড়াতাড়ি সেটাকে ধরতে। তারা ধরে ফেলল নাভিটাকে; মায়ের কাছে এনে দিল ফের সেটাকে। স্ত্রীলোকটি আবার ওটা মাটিতে পুঁতল বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার নাভিটা লাফিয়ে একটা গাছের মাথায় চড়ে বসল। সেই বেটাছেলেটি তখন ধরতে গেল সেটা। কিন্তু নাভি গেল সড়সড়িয়ে আকাশে উঠে। তখন থেকে সেটাকেই আমরা চাঁদ বলে জানি।

ডোকু নামের সেই মানগানা মেয়েমানুষটি তখন পুরুষ মানুষটিকে ডেকে বলল: "যাও, একগাদা বাঁশের খোল নিয়ে এস।" খোল এলে সেগুলো দিয়ে তৈরী হল একটা মই-সেটাকে কাঁধে রেখে সে হুকুম দিল আর সব পুরুষদের মইয়ে চড়ে চাঁদ পেড়ে আনতে। একদল পুরুষ মইতে চাপল—তাদের মধ্যে তিনজন লাফিয়ে আকাশে চলে গেল। ডোকু মইটা মাটিতে ফেলে দিল তখন, বাকি যারা সেটায় চড়ে ছিল, তারা সবাই সেই আছাড়ে মরে গেল।

আকাশে-ওঠা তিনজনের মধ্যে দুজন ফিরতে চেষ্টা করে পারল না, সেখানেই মরে গেল। বাকি জনকে একটা উড়ন্ত শেয়াল নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এল শেষে।

লোকপুরাণ ও পুরাণবৃত্ত ঃ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

বাণী ঘোষ

লোকপুরাণ এবং পুরাণবৃত্ত সম্পর্কিত এই প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জীটি প্রস্তুত করা হয়েছে, কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত এই বিষয়ের বইগুলিকে অবলম্বন করে। জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আকাদেমী অব ফোকলোর, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, আমেরিকান লাইব্রেরী, ব্রিটিশ কাউন্সিল, দেশবন্ধু কলেজ-প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এ-ব্যাপারে প্রচুর সহায়তা করেছেন। এ-ছাড়াও কয়েকটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগারও সাহায্য করেছেন উদারভাবে।

মূলত ইংরাজী বর্ণমালার ক্রম-অনুসারে লেখকের পদবী-অনুযায়ী এই তালিকা বিন্যস্ত হয়েছে। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা গেছে। শুধুমাত্র সেখানে লেখকের পুরো নামটি উল্লেখিত। একই লেখকের একাধিক বই থাকলে, কালানুক্রম মেনে সাজানো হয়েছে। উৎসাহী পাঠকের পক্ষে যাতে বই খুঁজে নেওয়া সহজসাধ্য হয় সেজন্যে লেখক-নামকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল, প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজালে বাঞ্ছিত বই খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগে যেহেতু। বইয়ের নামের শেষে বন্ধনীর মধ্যে যে সংখ্যা দেওয়া হল, সেটি বিংশ শতকে প্রকাশিত ধরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বছর বলে বুঝতে হবে। যেমন (২৫) মানে আসলে (১৯২৫)। স্থান পরিমিতির জন্য এটি করা হয়েছে ; পুরো তালিকাটিও বাংলা হরফে ঐ একই কারণে। বিংশ শতাব্দীর আগে প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রে পুরো বছর নির্দেশই করা হয়েছে, যেমন (১৮৯০) ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে সর্বশেষ সংস্করণটির তারিখই উল্লেখিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই তালিকাটি তৈরী করতে আমার সতীর্থা সর্বশ্রীমতী গোপা সরকার, রীতা বসু এবং নিবেদিতা গুপ্ত অনেকখানি সাহায্য করেছেন। তাঁদের সঙ্গে অবশ্য আমার ধন্যবাদ জানানোর সম্বন্ধ নয়॥

অ্যালেগ্রো, জে. এম.ঃ লস্ট গডস্ (৭৭); **অধিকারী, আর. সি.ঃ** মিথোলজি, মেটাফিজিক্স্ অ্যাণ্ড মিস্টিসিজম্ (৫৬) ; **আগরওয়ালা, ভি. এস. ঃ** সোলার সিম্বলিজম্ অব্ দ্য বোর (৬৩) ; **অ্যাম্বারলী, ভি. ঃ** অ্যানালিসিস্ অব্ রিলিজিয়নস্, বিলিফ্স্ (১৮৭৬) ; **অ্যাল্‌টিজার, টি.ভি.ভি. ঃ** ট্রুথ, মিথ অ্যাণ্ড সিম্বল (৬২) ; **বারিং-গুল্ড, এস. ঃ** কিউরিয়াস মিথস অব দি মিডল এজেস (১৮৭৭) ; **ব্র্যাটন, এফ. জি. ঃ** মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস্ অব দ এনসেন্ট নিয়ার-ইস্ট (৭০ ; **বুলফ্লিন্চ, টি. ঃ** এ বুক অব মিথস (৫৮ ; **বারল্যাণ্ড, সি. এ. ঃ** নর্থ-আমেরিকান ইণ্ডিয়ান মিথোলজি (৭০) মিথস অব লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ (৭৪) ; **বার্চ, সি. ঃ** চাইনীজ মিথস এ্যাণ্ড ফ্যানটাসি (৬২, ; **ব্যাকোফেন, জে. জে. ঃ** মিথ, রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড মাদার রাইট ৬৭) ; **ভট্টাচার্য, টি. কে. ঃ** দি মিথস অব দি শিমংস অব দি আপার সিয়াং (৬৫, ; **বেকউইথ, এম. ডব্ল্যু. ঃ** হাওয়াইয়ান মিথোলজি (৭১) ; **ব্যানার্জি, জে. এন ঃ** সূর্য ; **বেলিস, জে. ঃ** লির্তুভিউ মিথোলজিসকস স্যাকমেস (৫৬, ; **ব্রান্সটন, বি. ঃ** গডস অব দি নর্থ (৫৫) ; **বুশ, ডি. ঃ** মিথোলজি অ্যাণ্ড দি রোমান্টিক ট্র্যাডিশন ইন ইংলিশ পোয়েট্রি (৫৭, **বোল, কে. ডব্ল্যু. ঃ** দি ফ্রীডম অব ম্যান ইন মিথ (৬৮, ; **বেরিয়ার, এ. ঃ** মিথোলজি অ্যাণ্ড ফেবল্স্ অব দি এনসেন্ট একসপ্লেনড ফ্রম হিস্ট্রি (১৭৩৯) ; **ভট্টাচার্য, এস. ঃ** দি ইণ্ডিয়ান থিওগনি (৭৮) ; **বকসী, ডি. এন. ঃ** হিন্দু ডিভাইনিটিজ ইন জাপানীজ বুদ্ধিস্ট প্যানথিয়ন (৭৯) ; **বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার.** পৌরাণিকী (১, ২ ; ৭৯, ; **ব্রাউন, আর. ঃ** দি গ্রেট দায়োনিস্যাস মিথ (৭৭-৭৮) ; **ব্রিনটন, ডি. ঃ** দি মিথস অব দি নিউ ওয়ার্ল্ড (১৮৯৬) ; **বিয়েরহর্স্ট, জে. ঃ** দি রেড সোয়ান (৭৬ ; **ক্যাম্বেল, জে. ঃ** মিথস টু লিভ বাই (৩৩) ; দি হিরো উইথ এ থাউজেণ্ড ফেসেস (৫৩, ; দি মাস্ক্স্ অব গড ঃ প্রিমিটিভ মিথোলজি (৬৮) ; ওরিয়েন্টাল মিথোলজি (৭০) দি মিথিক ইমেজ (৭৪) ; **ক্যাসিরার, ই** ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড মিথ (৪৬) ; **চ্যাপলিন, ডি. ঃ** ম্যাটার, মিথ অ্যাণ্ড স্পিরিট (৩৫) মিথোলজিকাল বণ্ডস বিটুইন ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট (৩৮), **কোলাম, পি.ঃ** মিথস অব দি ওয়ার্ল্ড (৩০) ; **চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ঃ** বৈদেশিকী-(৬২) ; রামায়ণ (৭৮) ; **ক্রুজ, এ. ঃ** দি বুকস অব মিথ (৭৪) **ক্রিস্টী, এ. ঃ** চাইনীজ মিথোলজি (৭৩) ; **ক্লার্ক, আর. টি. আর. ঃ** মিথ অ্যাণ্ড সিমবল ইন এনসেন্ট ইজিপ্ট (৫৯) **ক্রুক, ডব্ল্যু. ঃ** দি পপুলার রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফোকলোর অব নর্দার্ন ইণ্ডিয়া (১,২

৬৮) ; **চিয়েরা, ই.** ঃ সুমেরিয়ান এপিকস অ্যাণ্ড মিথস (৩৪) ; **ক্যারিংটন, আর.** ঃ মার্মেড্স অ্যাণ্ড মাস্টোডনস (৬১) ; **কুমারস্বামী, এ. কে.** অ্যাণ্ড **সিস্টার নিবেদিতা.** ঃ মিথস অব দি হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস (৬৭) ; **কুন, সি. এস.** ঃ দি হান্টিং পিপল্স্ (৬২) ; **কক্স, জি. ডব্ল্যু.** ঃ অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি সায়েন্স অব কমপারেটিভ মিথোলজি (১৮৮১) ; দি মিথোলজি অব দি এরিয়ান নেশনস (৬৩) **চেজ, আর.** ঃ কোয়েস্ট ফর মিথ (৪৯) **চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ** ঃ বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার ৮০ ; **ডিয়েল, কে. এস.** ঃ রিলিজিয়নস ; মিথোলজি, ফোকলোরস (৬৮) ; **দেবস্থালি, জি. ভি.** ঃ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড মিথোলজি অব দি ব্রাহ্মিনস্. **ডাওসন, জে.** ঃ এ ক্ল্যাসিকাল ডিকসনারী অব হিন্দু মিথোলজি অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন, জিওগ্রাফী, হিস্ট্রি অ্যাণ্ড লিটারেচার (১৮); **ডুমেজিল, জি.** ঃ গডস অব দি এনসেণ্ট নর্থ-মেন (৭৩) ; **ডেভিস. এফ. এইচ.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব জাপান (১৯১৫) ; **গু গুবারনেতিস, এ.** ঃ জুলজিক্যাল মিথোলজি (১,২ ; ১৮৭২), লা মিথোলজি দে প্লাঁতেস (১৮৭৮) ; **এলিয়েড, এম.** ঃ মিথস, ড্রিমস অ্যাণ্ড মিস্ট্রিজ (৬০) ; মিথ অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (৬৪) ; **এলুয়িন, ভি.** ঃ মিথস অব ইণ্ডিয়া (৪৯), ট্রাইব্যাল মিথস অব ওড়িশা (৫৪) **এলিস, এইচ. আর.** ঃ দি রোড টু হেল (৪৩) ; **এলিয়ট, এ.** ঃ মিথ (৭৬). **ইভান্স-প্রিচার্ড, ই. ই.** ঃ থিওরি অব প্রিমিটিভ রিলিজিয়ন (৬৫) ; **এডওয়ার্ড, এম.** অ্যাণ্ড **স্পেন্স, এল.** ঃ এ ডিক্সনারী অব নন্-ক্লাসিকাল মিথোলজি ; **ইস্টম্যান, এম. এইচ.** ঃ ইনডেক্স টু ফোক-টেল্স্, মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস (২৬) ; এভরিম্যান'স ডিকসনারী অব নন-ক্লাসিকাল মিথোলজি (৫২) ; **এলিস-ডেভিডসন, এইচ. আর.** ঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মিথোলজি (৬৯), গডস অ্যাণ্ড মিথস অব নর্দার্ন ইউরোপ (৭৬) **এভরী, জি.** ঃ ক্রিশ্চান মিথোলজি, (৭০) ; **ফিস্কে, জে.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড মিথমেকারস্ (১৮৮৮) ; **ফ্রেজার, জে. জি.** ঃ ওয়ারশিপ অব নেচার (২৮) মিথস অব দি অরিজিন অব দি ফায়ার (৩০) ; দি গোল্ডেন বাও (অ্যাব্রি. ৭০), **ফেবার, জি. এস.** ঃ অরিজিন অব প্যাগান আইডলট্রি (১৮৭৮) ; **ফেল্ডম্যান, বি.** অ্যাণ্ড **রিচার্ডসন, আর. ডি,** ঃ দি রাইজ অব মডার্ন মিথোলজি (৭২) ; **ফেডার, এল.** ঃ এনসেণ্ট মিথ ইন মডার্ন পোয়েট্রি (৭১) **ফ্লাড, জে. এম.** ঃ আয়ারল্যাণ্ড—ইটস মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস (১৬) ; **ফনটেনরোজ, জে.** ঃ

পাইথন, এ স্টাডি অব ডেল্‌ফিক মিথ (৫৯) ; দি রিচুয়াল থিওরী অব মিথ (৭১) ; **গ্যাস্টার, টি. এইচ,** ঃ মিথ, লিজেণ্ড অ্যাণ্ড কাস্টম ইন দি ওল্ড টেস্টামেণ্ট (৬৯) ; **গুয়্যেরের, এইচ.এ.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব দি মিডল এজ (২২) ; মিথস অব দি নর্সমেন (২২) ; **জর্জেস, আর. এ.** ঃ স্টাডি ইন মিথোলজি (৬৮) **গ্রে, জে.** ঃ নিয়ার ইস্টার্ন মিথোলজি (৬৯) ; **গ্রেভস, আর** অ্যাণ্ড **পাতাই, আর.** ঃ হিব্রু মিথ (৬৪) ; **গ্রেভস,. আর** দি গ্রীক মিথস (১-২) ; (৬০) **গ্রাণ্ট, এম.** ঃ মিথস অব দি গ্রীকস অ্যাণ্ড রোমানস (৭২) ; **গুপ্ত, এস. এম.** ঃ ফ্রম দৈত্য ট দেবতা ইন হিন্দ মিথোলজি (৭৩) ; **গিল, ডব্ল্যু. ডব্ল্যু.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড সংস ফ্রম দি সাউথ প্যাসিফিক (১৮৭৬) ; **গুহ, অরুণচন্দ্র** ঃ রূপকথা (৫০) ; **হাফিজ আবদুল** ঃ বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (৭৫) **হিউইট, জে. এফ** ঃ প্রিমিটিভ ট্রাডিশনাল হিস্ট্রি (০৭) ; **হোকার্ট, এ. এম.** ঃ দি লাইফ-গিভিং মিথ অ্যাণ্ড আদার এসেজ (৫২) ; **হুক, এস. এইচ.**ঃ মিথ, রিচুয়াল অ্যাণ্ড কিংশিপ (৫৮) ; মিডল-ইস্টার্ন মিথোলজি (৬৩), **হপকিন্স, ই ডব্ল্যু.** ঃ এপিক মিথোলজি (৬৮) **হিয়াট, এল. আর.** ঃ অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনাল মিথোলজি (৭৫) ; **হালদার, জে.** ঃ লিঙ্কস বিটুইন আরলি অ্যাণ্ড লেটার বুদ্ধিস্টস' মিথোলজি (৭২) ; **হারবার্ট, জে.** ঃ দি হিন্দু মিথ (৫২) ; **হ্যামিণ্টন, ই.** ঃ মিথোলজি (৫৪) ; **হিনেল্‌স, জে. আর.** ঃ পার্সিয়ান মিথোলজি (৭৩) ; **হ্যাটফিল্ড, এইচ. সি.** ঃ ক্ল্যাশিং মিথ ইন জার্মান লিটারেচার (৭৪) ; **হোপ-মংক্রীফ, এ. আর.** ঃ ক্লাসিক মিথ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড (১৭) **হাওয়েই, এম. ও.** ঃ দি হর্স ইন ম্যাজিক অ্যাণ্ড মিথ (২৩) ; **হ্যারিস, জে. আর.** ঃ কাল্ট অব দি হেভেনলি টুইন্‌স (০৬), অরিজিন অব দি কাল্ট অব অ্যাফ্রোদিতি (১৬) **হার্টল্যান, এস.** ঃ মিথোলজি অ্যাণ্ড ফোকটেলস (১৪) ; **হেস্টীংস, জে.** ঃ এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্‌স্ (১-১৩ ; ৫৯-৬১) **আইয়নস, ভি.** ঃ ইণ্ডিয়ান মিথোলজি (৬৭) **আইভারসন, ই.** ঃ মিথ অব ইজিপ্ট (৬১) ; **জেমস, ই. ও.** ঃ মিথ অ্যাণ্ড রিচুয়াল ইন দি এনসেণ্ট নিয়ার-ইস্ট (৫৮), দি ওয়রশিপ অব স্কাই গড (৬৩) ; **জোবস, জি.** অ্যাণ্ড **জোবস, জে.** ঃ আউটার স্পেস (৬৪) **জোবস, জি.** ঃ ডিক্‌সনারী অব মিথ (৬১) ; **ইয়ুং,সি. জি.** অ্যাণ্ড **কেরেনি, কে.** ঃ এসেজ অন এ স্যায়েন্স অব মিথোলজি (৪৯) ; **কার্ক জি. এস.** ঃ মিথ (৭০) ; দি নেচার অব

গ্রীক মিথস (৭৪), **কিতাগাওয়া, জে.এম. :** মিথস অ্যাণ্ড সিমবলস (৬৯) ; **কফম্যান, এফ. :** নর্দার্ন মিথোলজি (০৩) ; **কিং, এল. ডব্ল্যু. :** ব্যাবিলনিয়ান রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড মিথোলজি (১৮৯৯) ; **কোসাম্বী, ডি. ডি. :** মিথ অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (৬২) ; **ক্রেমার, এস, এন. :** সুমেরিয়ান মিথোলজি (৬১) ; **করনেইকার, এ. জে. :** বেদিক অ্যাস্ট্রনমি অ্যাণ্ড মিথোলজি (৭৮) ; **ক্র্যাপ, এ. এইচ. :** দি সায়েন্স অব ফোকলোর (২৮) ; **লারাউস :** এনসাইক্লোপীডিয়া অব মিথোলজি (৫৯) **লারাউস :** ওয়ার্ল্ড মিথোলজি (৭১) ; **লেভি-স্ট্রোস, সি. :** মিথোলজিসকস (১-৪, ৬৪-৭১), দি স্যাভেজ মাইণ্ড (৬৬), ইনট্রোডাকশন টু এ সায়েন্স অব মিথোলজি (৭০), স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপলজি (১,২ ; ৭৭, ৭৮), মিথ অ্যাণ্ডমীনিং (৭৮), **লারসন, জি. জে. :** মিথ ইন ইণ্ডো-ইওরোপীয়ান অ্যান্টিকুইটি (৭৪) ; **লনস, ভি. :** ইজিপ্সিয়ান মিথোলজি (৬৮), । **লীচ, এম :** স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকসনারী অব ফোকলোর, মিথোলজি অ্যাণ্ড লিজেণ্ড (৭২) , **ল্যাং, এ. :** মিথ রিচুয়াল আণ্ড রিলিজিয়ন (১৮৮৭) ; কাস্টম অ্যাণ্ড মিথ (১৮৯৩), **ম্যালিনো-ওস্কি, বি. :** মিথ ইন প্রিমিটিভ সাইকোলজি (২৬) ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড আদার এসেজ (৫৪), সেক্স, কালচার অ্যাণ্ড মিথ (৬৩) ; **ম্যাসে, জি. :** দি ন্যাচারাল জেনেসিস (১৮৮৩) ; **মিত্র, এস. সি. :** অন এ বিবহর ইটিওলজিক্যাল মিথ অ্যাবাউট দি পাইনেট লীভস্ অব দি ওয়াইল্ড ডেট পাম (২৭), অন এ ফার-ট্র্যাভেল্ড স্টার-মিথ (২৮), অন এ বিবহর ইটিওলজিকাল মিথ অ্যাবাউট দি পাইনেট লীভস্ অব দি ট্যামারিণ্ড ট্রি (২৭), দি চম্পারণ বিরহরিজ বিলিফ অ্যাবাউট এ স্নেক (২৮) ; **মূলার, এফ. এম. :** চিপস ফ্রম এ জার্মান ওয়ার্কশপ (১৮৫৭) কনট্রিবিউশন টু দি সায়েন্স অব মিথোলজি (১৮৯৭) ; কম্পারেটিভ মিথেলজি (০৯), সিলেক্টেড এসেজ অন ল্যাংগুয়েজ মিথোলজি অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (১৮৮১) ; **মানচ, পি. :** হোয়েন দি গোম্মেন বাপ ব্রেক্স (৭৩) ; **ম্যাক্কানা, পি. :** কেল্টিক মিথোলজি (৭০) **মারে এ. এস. :** ম্যানুয়্যাল অব মিথোলজি (৩৫) ; **ম্যান, টী. :** মিথোলজি অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম্ (৭৬) ; **ম্যাকানা, পি. :** কেলটিক মিথোলজি (৭২) ; **মারে, এইচ. এ. :** মিথ অ্যাণ্ড মিথমেকিং (৬০) ; **ম্যকবেনা, এ. :** কেলটিক মিথোলজি অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (১৭) ; **ম্যাকফারসন, জে. :** ফোর এজেস অব ম্যান (৬৩) ; **ম্যাক্ডুয়েল জে. এ. :** বেদিক মিথোলজি ; **ম্যাকডোনেল, এ. এ. :** বেদিক মিথোলজি (১৮৯৭) ;**ম্যাকেনজি, ডি. এ. :**

ইণ্ডিয়ান মিথ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড (১৩), টিউটনিক মিথ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড মিথ অব চায়না অ্যাণ্ড জাপান, ইজিপ্সিয়ান মিথ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড, মিথস অব প্রি-কলাম্বান আমেরিকা, মিথস অ্যাণ্ড ট্র্যাডিশনস অব দি সাউথ সী আইল্যাণ্ডস ; মিথস ফ্রম মেলানেশিয়া অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া ; মিথস অব ব্যাবিলনিয়া অ্যাণ্ড অ্যাসিরিয়া, মিথস অব ক্রীট অ্যাণ্ড প্রি-হেল্লিনিক ইওরোপ, মিথস অব মালয়েশিয়া অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া (১৪-২০) ; **ম্যাকক্বি, জে. এম.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া (২৪) ; **মার্টিন, ই, ও.** ঃ দি গডস অব ইণ্ডিয়া (১৪) ; **মানচ, পি. এ.** ঃ নর্স মিথোলজি (২৬) ; **ম্যাথেজ, জে.** ঃ স্লাভিক মিথোলজি ; **মোডে, এইচ.** ঃ ফেবুলাস বীস্টস অ্যাণ্ড ডেমন্‌স্ (৭৫) ; **নিকলসন, আই.** ঃ মেক্সিকান অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল আমেরিকান মিথোলজি (৭৩) **নর্টন ডি. এস.** অ্যাণ্ড **রুশটন, পি.** ঃ ক্লাসিকাল মিথস ইন ইংলিশ লিটারেচার (৬৪) ; **নিয়েলসন, এম. পি.** ঃ দি মাইসিনীয়ান অরিজিন অব গ্রীক মিথোলজি (৭২) ; **নোয়েল, আর. এস.** ঃ দি মিথোলজি অয মিড্‌ল্ আর্থ (৭৭) ; **ওনিল, জে.** ঃ দি নাইট অব দি গডস (১৮৯৩-৯৭) ; **অসগুড, সি. জি.** ঃ দি ক্ল্যাসিকাল মিথোলজি অব মিল্টন্'স্ ইংলিশ পোএম্‌স্ (১৯০০) ; **অটো, ডব্ল্যু, এফ.** ঃ দায়োনিসুস (৬৫) ; **ওল্ডহ্যাম, সি. এফ.** ঃ সান অ্যাণ্ড দি সারপেণ্ট (০৫) ; অসবোর্ন. এইচ. ঃ সাউথ আমেরিকান মিথোলজি (৬৮) ; **প্রেসকট, এফ. সি.** ঃ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড মিথ (২৭) ; **পনফস্কি, ডি.** অ্যাণ্ড **পনফস্কি, ই.** ঃ প্যানডোরা'জ বক্স (৫৬) ; **পিগট, জে.** ঃ জাপানীজ মিথোলজি (৬৯) ; **পয়গনন্যাণ্ট, আর.** ঃ ওশেনিক মিথোলজি (৬৭) ; **পার্টো, এস.** ঃ প্রেশিনা (৭০); অ্যাবাউট দি সিক্রেট অব নেমস (৬০) ; **ফিলপট, জে. এইচ.** ঃ সেকরেড ট্রি অর দি ট্রি ইন রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড মিথ (১৮৯৭) ; **পেরোওয়াইন, এস.** ঃ রোমান মিথোলজি (৬৯) ; **পিনটস, জে.** ঃ গ্রীক মিথোলজি (৬৯) ; **পিলাই, জে. এস.** ঃ ট্রি ওয়রশিপ অ্যাণ্ড ওফিয়লট্রি (৪৮) **র‍্যাঙ্ক, ও** ঃ দি মিথ অব দি বার্থ অব দি হিরো (১৪) ; **রাপুপোর্ট, এ. এস.** ঃ মিথস অব দি নর্সমেন (২২) ; **রোলস্টোন, টি. ডব্লু.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব দি কেল্টিক রেস (২২) **রবিনসন, এস. এইচ. অ্যাণ্ড উইলসন, কে.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব অল নেশনস (৬০) ; **রীড, এ. ডব্লু.** ঃ মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব অস্ট্রেলিয়া (৭৬) ; **রাস্কিন, জে.** ঃ দি কুইন অব দি এয়ার (১৮৬৯) ; **র‍্যাগোজিন, জেড. এ.** ঃ বেদিক ইণ্ডিয়া (১৮৯৫) ; **রেলি, ভি. জি.** ঃ দি বেদিক

গডস অ্যাজ ফিগারস অব বায়োলজি (৩১) ; **রুথভেন, কে. কে. :** মিথ (৭৬) **রাইটার, ডব্ল্যু :** মিথ অ্যাণ্ড লিটেরেচার (৭৫) ; **রবিনসন, এম. ডব্ল্যু. :** ফিকটিশাস বীস্টস, এ বিবলিওগ্রাফী (৬১) ; **রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র :** পৌরাণিক উপাখ্যান (৫৪), বেদের দেবতা ও ও কৃষ্টিকাল (৭৪), **রায়, মনোরঞ্জন :** আদিম সমাজের ইতিহাস (৬২) ; **স্পেন্স, এল. :** এ ডিকসনারী অব নন-ক্লাসিকাল মিথোলজি (১৫), মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস তব এনসেন্ট ইজিপ্ট (১৫), মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব ব্যাবিলনিয়া অ্যাণ্ড অ্যাসীরিয়া (২০) অ্যান ইনট্রোডাকশন টু মিথোলজি (২১) ; এ ডিকসনারী অব মিথোলজি (৩০) ; মিথ অ্যাণ্ড রিচুয়াল ইন ড্যান্স, গেম অ্যাণ্ড রাইম (৪৭), মিথোলজিস অব এনসেন্ট মেক্সিকো অ্যাণ্ড পেরু (৭০) ; **সেবিয়ক টি. এস. :** মিথ (৫৮) ; **শেপিরো, এম. এস. :** মিথোলজিস অব দি ওয়ার্ল্ড (৭৯) ; **স্মিথ, জি. :** দি ক্যালডিয়ান অ্যাকাউন্ট অব জেনেসিস (১৮৭৬) ; **স্মিথ, ডব্ল্যু. :** এ স্কলার ক্লাসিকাল ডিকসনারী (১০) ; **স্মিথ, জি. ই. :** ইভোলিউশন অব দি ড্রাগন (১৯) ; **স্কোয়্যার, সি. :** কেলটিক মিথ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড, পোয়েট্রি অ্যাণ্ড রোমান্স ; **সাংকালিয়া, এইচ. ডি. :** রামায়ণ—মিথ অর রিয়ালিটি (৭৫) ; **সেজনেক, জে. :** দি সারভাইভ্যাল অব দি প্যাগান গডস (৭৩) ; **স্টডিং, এইচ. :** গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান মিথোলজি অ্যাণ্ড হিরোয়িক লিজেণ্ড (০৮) ; **শোভনা দেবী :** ইণ্ডিয়ান নেচার মিথ (১৯) ; **সত্তার, আবদুস :** আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য (৭৮), ; **স্মিথ, ডব্লু. ডব্লু. :** মিথ অব মনসা (৭৬) ; **স্নেথাওয়ার, এইচ. :** মিথোপোয়েসিস (৭০) ; **শ্রীবাস্তব ভি. সি. :** সান-ওয়ারশিপ ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া (৭২) ; **শুলম্যান, ডি. ডি. :** তামিল টেম্পল মিথস (৮০) ; **সরকার, সুধীরচন্দ্র :** পৌরাণিক অভিধান (৮১) ; **সেন, সুকুমার :** রামকথার প্রাক্-ইতিহাস (৭৭), ভারত কথার গ্রন্থিমোচন (৮০) ; **টাইলর, ই. বি. :** দি অরিজিনস অব কালচার (৫৮), প্রিমিটিভ কালচার (২০) ; **টমাস, টি. :** এপিকস, মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া ; **তুরভাইল-পিটার, ই. ও. জি. :** মিথ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন অব এনসেন্ট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (৬৪) ; **টিলিয়ার্ড, ই. এম. ডব্ল্যু. :** সাম মিথিকাল এলিমেন্টস ইন ইংলিশ লিটেরেচার (৫৯) ; **থর্প, বি. :** নর্দার্ণ মিথোলজি (১৮৫১-৫২) ; **টমসন, এস. :** মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার (১-৬ ; ১৯৫৫-৫৮) ; **ভিনোলি, টি. :** মিথ অ্যাণ্ড সায়েন্স (১৮৮২) ; **ভোগেল, জে. পি. :** ইণ্ডিয়ান-সারপেন্ট

লোর ; অর দি নাগস ইন হিন্দু লিজেণ্ড অ্যাণ্ড আর্ট (২৬) ; **ওয়েক, এস, এস. :** সারপেণ্ট ওয়রশিপ অ্যাণ্ড আদার এসেজ (১৮৮৮), **হোয়াইট, এ. টি. :** দি গোল্ডেন ট্রেজারি অব মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস (৬৪) ; **ওয়ারনার, ই. টি. সি. :** মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব চায়না (২২) ; **ওয়েগনার, আর :** লেদাল স্পীচ : ডারিবি মিথ (৭৮) ; **হোয়াইটহেড, এইচ. :** দি ভিলেজ গডস অব সাউথ ইণ্ডিয়া (১৬) ; **ওয়েস্টারভেল্ট, ডব্ল্যু, ডি. :** হাওয়াইযান লিজেণ্ডস অব গোস্টস অ্যাণ্ড গোস্ট গডস (৬৪ ; **ওয়ার্ড ডব্ল্যু. :** এ ভিউ অব দি হিস্ট্রি, লিটেরেচার, অ্যাণ্ড মিথোলজি অব দি হিন্দুজ (১৮১১) ; **উইলকিন্‌স, ডব্ল্যু. জে. :** হিন্দু মিথোলজি (১৮৮৭) ; **ওয়ালিস, এইচ. ডব্ল্যু. :** দি কসমোলজি অব দি ঋগেদ (১৮৮৭) ; **ওয়েস্টারগার্ড, এন এল. :** দি সেকরেড স্ক্রিপচাস অব দি জাপানীজ (৫২) ; **হোয়াইট, জে. জে. :** মিথোলজি ইন দি মডার্ণ নভেল (৭১) **ওয়ের্নার, এ :** আফ্রিকান মিথোলজি ; মিথোলজি অব অল রেসেজ, ৭; ২৫) **ওয়েসিংগার, এইচ. :** দি অ্যাগনি অ্যাণ্ড দি ট্রায়াম্ফ (৬৫) ; **ইয়েটস, ডব্ল্যু. বি. :** মিথোলজিস (৩১) ; **ৎজিগেনবালগ, বি. :** জিনিওলজি অব দি সাউথ-ইণ্ডিয়ান গডস, (১৮৬৯) ; **ৎজিমার, এইচ. আর. :** মিথস অ্যাণ্ড সিমবলস ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন (৬২) ॥